কবিতাসংগ্রহ

৩

কবিতাসংগ্রহ

৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা

সৌরীন ভট্টাচার্য



নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৪০০, ১৪ এপ্রিল ১৯৯৩

প্রকাশক : শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার,
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৮ কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : শ্রীবরুণচন্দ্র মজুমদার, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি.
৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

'পাবলো নেরুদা-র কবিতাগুচ্ছ' (বৈশাখ ১৩৮০) থেকে 'চইচই-চইচই' (ফাল্গুন ১৩৮৯) এই দশ বছরের সাতটি কবিতার বই নিয়ে প্রকাশিত হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কবিতাসংগ্রহ'-র তৃতীয় খণ্ড। দশকের হিসেবে কথা বলার যে-অভ্যাস আমাদের তৈরি হয়ে গেছে সে-অভ্যাসের অনুবর্তী হয়ে বলতে গেলে, এই কালপর্বের মধ্যেই পড়ছে সেই সত্তরের দশক। নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি পেরিয়ে সময় গড়িয়ে চলেছে, বদলে যাচ্ছে রাজনীতির ধরন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র, দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে শহরের চেহারা, মানুষজন, তাদের চলাফেরা ও জীবনযাপনের ধাঁচধোঁচ। এদিকে কবিরও বয়স বাড়ছে, এই দশকেই তিনি ষাট বছর বয়স পেরিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে কথায় কথায় যাবার কথা উঠছে। কিন্তু ওরকম বেমালুম চলে গেলেই তো চলবে না। কত কিছুতেই রাগ হয়, ফুঁসে উঠতে ইচ্ছে করে। বয়স হলেও তাই প্রতিবাদ সংকল্প এসব থেকেই যায়। আমাদের এই হরবোলা শহরের কথা বলতে গিয়ে তাই তাঁর সত্তর পেরোনো বয়সেও তাঁকে বলতে হয়—

> "দেশের বাড়ি খোয়ালেও আমি সে জায়গায় পেয়েছি বিশাল এক দেশ। যার ভূতভবিষ্যৎ সবটাই আমার। অসমুদ্রহিমাচল আমার কাছে অবারিতদ্বার। জাতে বাঙালি হয়েও আমি জাতিতে ভারতীয়। আমরা নিজের ভাষায় ঘরসংসার করি, হিন্দির ফেরিনৌকোয় হাটে যাই, তীর্থ করে ফিরি। আমাদের এই হরবোলা শহরের দর্পণে আমি দেখি সারা ভারতের মুখ। বংশপরম্পরায় এখানকার শানবাঁধানো পাথরে মাথা কুটে যারা কলকাতাকে বড় করেছে, বস্তা বস্তা টাকা তাদের মাথা-গোঁজার জায়গা, পার্ক, ময়দান, জলাভূমি সর্বস্ব হাতিয়ে নিচ্ছে। এই হরবোলা শহরে, আসুন আমরা সব ভাষাভাষী একবাক্যে হাতে হাত বেঁধে এর গতি রোধ করি।"

['দেশ', ৭ নভেম্বর ১৯৯২]

যাবার সময় হলে যেতে তো হবেই। কিন্তু পিছুটান তো থাকেই।

এত আদর, এত অভ্যর্থনা—
এসব ছেড়ে যেতে
কারই বা মন চায়?

আবার টানাপোড়েনও কাটে না। এক জায়গায় থাকলেই কি চলবে? তা ছাড়া স্বভাবটাই যার বাউণ্ডুলে গোছের?

সাত ঘাটে জল খেয়ে বেড়ানো যার কাজ—
এক জায়গায়
বাঁধা পড়লে কি তার চলে?
আর সেটা দেখায়ই বা কেমন?

রিখিয়ায় বিষ্ণু দে-কে একদিন এমনি কথাই বলেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পায়ে যে তাঁর চাকা লাগানো।

তাঁর চলা এখনো থামে নি।

+ +

এই ভূমিকা তো আমার লেখার কথা ছিল না। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাসংগ্রহ' তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিও সুবীর রায়চৌধুরী প্রেসে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাকি কাজ করবার আর তাঁর সময় হয়নি। সেই অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব আমার অযোগ্য হাতে এসে পড়ে। আমার দ্বিধা সংকোচকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে যাঁরা আমাকে এ কাজের ভার দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে একটা স্বীকারোক্তি আমাকে করতেই হবে। এসব কবিতার এবং সেই সুবাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্য কবিতাও নতুন করে আস্বাদ নেবার দুর্লভ সুযোগ তাঁরাই আমাকে দিয়েছেন। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদকীয় নিবেদনে বলা হয়েছিল প্রিয় কবির গ্রন্থসম্পাদনা আনন্দের কাজ। আমার বেলায় কথাটা এত অমোঘ হয়ে আসবে বুঝতে পারিনি।

আমাদের সব কাজে যে-বন্ধুদের সাহায্য চাইতে হয় না, এমনিই পাওয়া যায়, এবারেও তা তেমনি পেয়েছি। আমার কী কী বই লাগতে পারে আন্দাজ করে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সে সব পাঠিয়েছে, দিব্য মুখোপাধ্যায় তার ব্যাগ ভর্তি করে বই, ছবি ও কাগজের কাটিং দিয়ে গেছে। কথা বলার জন্য সব সময়েই পেয়েছি স্বপন মজুমদারকে। অমিয় দেবের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য হলেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়বার আনন্দ-অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পেরেছি। কথা বলতে পেরেছি প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের সঙ্গেও। আর শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে তো শুধু কথা বলা নয়, সব সমস্যায় শেষ ভরসা হিসেবে তাঁকে পাওয়া যায়। এ কাজেও তাই। গ্রন্থপরিচয় অংশটি তিনি শুধু দেখে দিয়েছেন তাই না, ওটাকে দাঁড় করাবার জন্য

যা করার তাই করেছেন। আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সস্নেহ প্রশ্রয়, সে তো ছিলই। এঁদের কাছে আমার ঋণের কথা কীই বা বলব।

বইয়ের মধ্যে বানান সাম্য চেষ্টা করেও সবটুকু রক্ষা করতে পারিনি। স্তবক ইনৃডেণ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে সম্পাদকীয় নীতি দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত যা ছিল তাই আছে, কোনো সচেতন বদল করিনি। একটা বানান বিষয়ে এখানে একটু উল্লেখ করা দরকার। বইয়ের শিরোনামে বা অন্যত্র 'আরো' বানান আছে, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত ভূমিকা অংশে 'আরও' বানান আছে। মনে হয়েছে কবির নিজের ঝোঁক 'আরও' বানানের প্রতি। তাই সাম্যের যুক্তিতেও ঐ বানান যেখানে সম্ভব ছিল সেখানেও বদলাইনি।

বাকি যা দোষত্রুটি রইল সে দায় আমার।

সৌরীন ভট্টাচার্য

সূচি

পাবলো নেরুদা-র কবিতাগুচ্ছ (১৯৭৩)

রোগা ঈগল (১৯৭৪)

নাজিম হিকমতের আরো কবিতা (১৯৭৯)

একটু পা চালিয়ে, ভাই (১৯৭৯)

পাবলো নেরুদার আরো কবিতা (১৯৮০)

জল সইতে (১৯৮১)

চইচই-চইচই (১৯৮৩)

কবিতাসংগ্রহ

৩



পাবলো নেরুদা

পাবলো নেরুদা-র
কবিতাগুচ্ছ

ভুলতে পারছি না

যদি আমাকে জিগ্যেস করো কোথায় ছিলাম
বলতে হবে 'এই রকমই হয়',
বলব পাথরে পাথরে ঢেকে-যাওয়া জমির কথা
থেকেও যে নিজেকে খুইয়ে ফেলে, সেই নদীর কথা বলব।
আমি শুধু জানি পাখিদের হারানো জিনিস,
পেছনে ফেলে-আসা সমুদ্র কিংবা আমার বোনের কান্না।
কেন আলাদা আলাদা এত অঞ্চল, কেন দিনের
পায়ে পায়ে দিন আসে ? কেন কালো রাত
মুখের মধ্যে ঘনায় ? মৃতের দল কেন ?

কোথা থেকে এসেছি যদি জিগ্যেস করো তাহলে ভাঙা জিনিসগুলোর
কথা আমাকে তুলতে হবে,
ভয়ানক তেতো তেতো সব হাঁড়িকুড়ি,
প্রায়শ পচা বিশাল বিশাল সব জানোয়ার,
বলতে হবে আমার ব্যথায় কাতর হৃদয়ের কথা।

পরস্পরকে কাটাকুটি করা স্মৃতি নয় সেসব
বিস্মৃতির রাজ্যে ঘুমিয়ে পড়া ছাইরঙা পায়রাও তারা নয়
চোখের জলে ভাসা সেসব মুখ,
গলায় তাদের আঙুল দেওয়া,
পাতার সঙ্গে টুপ টাপ খসে-পড়া,
একটি অতিক্রান্ত দিনের অন্ধকার,
যে দিনটিকে গিলিয়েছি আমরা আমাদের দুঃখী রক্ত।

দেখ ল্যাজঝোলা পাখি, দেখ বেগ্‌নে ফুল
যা কিছু আমাদের অসম্ভব ভাল লাগে
লম্বা ঝুলওয়ালা কার্ডের ছাপা ছবিতে যাদের দেখতে পাও
যার ভেতর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায় সময় আর মাধুর্য।

কিন্তু এই দাঁতগুলো পেরিয়ে আর যেন আমরা ভেতরে না যাই
নৈঃশব্দ্যের জমানো খোলাগুলোর গায়ে যেন দাঁত না বসাই,
কেননা আমি কী উত্তর দেব আমি জানি না—

কত যে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই,
লাল রোদ্দুরে ছিন্নভিন্ন হয়েছে কত যে বাঁধ,
জাহাজের গায়ে ঠুকে গেছে কত যে মাথা,
চুম্বনের সময় গণ্ডি দিয়ে ঘিরেছে কত যে হাত,
এমনি আরও কত কিছু আমি ভুলতে চাই ॥

মিতালি

মাটিতে পড়ে-যাওয়া ধুলোমাখা চাহনিগুলো থেকে
কিংবা নিঃসাড়ে নিজেদেব কবর দেওয়া পাতাগুলো থেকে।
আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত দিনের অভাব নিয়ে, শূন্যতা নিয়ে
নিরালোক ধাতুগুলো থেকে।
হাতগুলোব শীর্ষে প্রজাপতিদের ঝিকমিক,
অপার দ্যুতিময় প্রজাপতিদের শূন্যে ঝাঁপ।

পরিত্যক্ত সূর্য যাদের গোধূলিতে গির্জাগুলোতে ছুঁড়ে দেয়
সেই ভাঙাচোরা প্রাণীদের পদচিহ্নের, আলোব পথরেখার
তুমি ছিলে প্রহরী
চাহনিগুলোর ঈষৎ আভা নিয়ে, মৌমাছিদের সারবস্তু নিয়ে
তোমার অপ্রত্যাশিত প্রস্থানের ঝলক জাগানো উপাদান
সোনার সংসার সমেত দিনটির আগে যায় আর পরে আসে।

চোখ এড়িয়ে দিনগুলো থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে
তবে তোমার আলোর কণ্ঠস্বরে এসে যায়

হে প্রেমের নাগরী, তোমার প্রাণ-জুড়ানো কোলে
আমি স্থাপন করেছিলাম আমার স্বপ্ন, আমার কিছুতে কিছু
না বলার স্বভাব।

স্থানাভাবগ্রস্ত দিনগুলোর কোঁদলের পর
আর মন্থর মৃত্যু আর ফুরানো উদ্দীপনায় ঠাণ্ডা-হওয়া
তোমার ক্ষীণাঙ্ক শরীর যখন
মাটির সীমানির্ধারক রাশির দিকে হঠাৎ নিজেকে ছড়াল,
আমি অনুভব করতে পারছি
তোমার বুকের দহন আর তোমার চুম্বনের সঞ্চরণ :
আমার স্বপ্নে কেবলি নতুন করে গিলছে।

কখনও কখনও তোমার অশ্রুর ভাগ্য উঁচুতে চড়ে
যেমন বয়স চড়াও হয় আমার কপালে, যেখানে
ঢেউগুলো আছড়াচ্ছে, মৃত্যুর অভিমুখে নিজেদের ভাঙছে ;
তাদের আন্দোলন আর্দ্র, হতাশায় ম্রিয়মাণ, চূড়ান্তভাবে শেষ ॥

স্বপ্নের পক্ষিরাজ

নিরর্থক, আর্শিতে নিজেকে নিজে দেখা,
সপ্তাহের আর ছবির আর কাগজের আহ্লাদ নিয়ে,
আমি আমার হৃৎপিণ্ড থেকে নরকের পালের গোদাকে
টান মেরে ফেলে দিই,
বাক্যের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে বিষণ্ণ বাক্যগুলোকে আমি সাজাই।

এখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়াই, মোহগুলো নিজের করি,
কথা বলি বাবুইদের সঙ্গে তাদের বাসায় গিয়ে :
তারা, প্রায়ই, নিরুত্তাপ আর সর্বনাশের গলায়
গান গায় আর মোহগুলো চটিয়ে দেয়।

আকাশে ছড়িয়ে আছে এক বিস্তৃত দেশ
রামধনুর তন্ত্রমন্ত্রের কাঁথা
আর রাত নিশুতির গাছপালা নিয়ে :
সেখানে আমি যাই, ক্লান্তি একটু থাকে না তা নয়,
এক রকম সদ্য কবর-দেওয়া ওল্টানো মাটিতে পা ফেলে ফেলে
গিয়ে আমি সেই আচাভুয়ো উদ্ভিদ্‌কুলের গাছপালার মধ্যে স্বপ্ন দেখি।

যেন আমি মৌলিক জিনিস এবং নিরানন্দ সত্তা
এমনিভাবে সেজে ব্যবহৃত দলিলপত্রের মধ্যে, উৎপত্তির মধ্যে হাঁটি ;
আমি ভালবাসি ভক্তিশ্রদ্ধার নিঃশেষিত মধু ;
সেই সুমিষ্ট কথামৃত যার পাতায় পাতায়
ঘুম যায় বুড়ো-হয়ে-যাওয়া রং-ওঠা বেগ্‌নে ফুল.
আর ঝাঁটাগুলো, সাহায্যের সঞ্চালক,
তাদেব চেহারায়, সন্দেহ নেই, আছে দুঃখ আর নিশ্চয়তা,
আমি তছনছ করি শিটি-মারা গোলাপ আর ভাবে বিভোর ব্যাকুলতা ;
আমি ছিন্নভিন্ন করি দুদিকেরই আদর-পাওয়া চরম : আর তার ওপর
আমি আছি ব্যতিক্রমহীন, অপরিমেয় সময়ের অপেক্ষায় :
আমার আমি-র মধ্যেকার এই আহ্লাদ আমাকে ম্রিয়মাণ করে।

এসে হাজির হয়েছে কী একটা দিন ! কী নিবিড় দুগ্ধধবল আলো,
ঠাস-বোনা, অখণ্ড, কার মুখ দেখে উঠেছি আজ !
আমি শুনেছি তার রাঙা ঘোড়ার হ্রেষা,
নিরাবরণ, নালবিহীন আর ভাস্বর।

তাকে নিয়ে আমি গির্জার মাথার ওপর উড়ে যাই
সৈন্যদের পরিত্যক্ত ব্যারাকের পাশ দিয়ে টগবগিয়ে চলে যাই,
আর এক অশুচি পল্টন আবার পিছু নেয়।
তার ইউক্যালিপ্টাস চোখ লুট ক'রে নেয় ছায়া,
তার ঘণ্টাতুল্য দেহ টগবগিয়ে চলে যায় আর সপাং সপাং ক'রে মারে।
আমার চাই অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বলতার একটা বিদ্যুতের ডোরা,
আমার দায়ভাগ নেবার জন্যে ইষ্টিকুটুম্বের একটি উৎসব ॥

একত্ব

কাছাকাছি ঘেঁষে, ঐক্যভাবে, স্থিতধী হয়ে অন্তর্দেশে কিছু নিহিত আছে,
যে কেবলি তার সংখ্যার, তার পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নের
পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছে।
তাকে পাথরেরা দেখায় সময়ের হাতের স্পর্শ,
তাদের সূক্ষ্ম শরীরে বয়সের কেমন একটা গন্ধ,
লবণাক্ত আর স্বপ্নময় সমুদ্রবাহিত জলে।

আমাকে ঘিরে এক এবং অভিন্ন বস্তু, মাত্র একটিই গতি,
খনিজের ভার, গাত্রচর্মের চেকনাই,
রাত্রি কথাটির ধ্বনিটিকে ধ'রে রয়েছে :
মসি গোধুমের ; হাতির দাঁতের, চোখের জলের
জিনিস চামড়ার, কাঠের, পশমের
বয়স হয়ে যাওয়া, অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া, সব এক রকম,
দেয়ালের মত আমার চার পাশে একাকার হয়ে যায়।

আমি সেই আমারই টুঁটি টিপে ধ'রে কাজ করি,
আমি সেই আমারই চারদিকে পাক খাই,
মৃত্যুকে বেড় দেয় যেন একটা দাঁড়কাক, বিয়োগবিধুর এক দাঁড়কাক।
আমি নিগূঢ় হয়ে ভাবতে থাকি, ঋতুচক্রের বিস্তারের মধ্যে আমি বিচ্ছিন্ন,
নিঃশব্দ ভূগোলে পরিবৃত আমি রয়েছি নাভিতে :
আকাশ থেকে খসে পড়ে তাপমাত্রার একটি খণ্ড,
বিহ্বল একত্বগুলোর এক চূড়ান্ত রকমের সাম্রাজ্য
গড়ে উঠছে সর্বতোভাবে আমাকে ঘিরে ॥

রুচি

ভুয়ো জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্যে কতকটা মড়াকান্না-জোড়া লোকাচারের জন্যে
যার গায়ে থাকে অবিনশ্বরতার পোশাক, এবং যার অনুষ্ঠান
রাস্তার ধারে না হয়ে যায় না,
আমি মনে মনে একটা টান পড়িয়ে রেখেছি, তাতেই আমার
একমাত্র রুচি।

ফেলে-দেওয়া আসবাবের মতন জীর্ণ বাক্যালাপের ওপর আমার টান,
যে আছে চেয়ারের নতজানু ভাব নিয়ে, যার মুখের কথাগুলো
গৌণ ইচ্ছার গোলাম হয়ে খিদ্‌মত করতে ব্যস্ত,
যার ভেতর রয়েছে দুধের, অতিক্রান্ত সপ্তাহের,
নগরশীর্ষে শৃঙ্খলিত বায়ুমণ্ডলের বশ্যতা।

কে পারে আর এর চেয়ে শরীরী তিতিক্ষার বড়াই করতে?
বিচক্ষণতা আমাকে জড়িয়ে রাখে
সাপের মত রং-ফেরানো একটা আঁটসাঁট চামড়ায়:
হায়, মাত্র এক চুমুক মদেই আমি এই-দিনটিকে বিদায় ক'রে দিতে পারি
এক রকমের এই পৃথিবীর অনেক দিন থেকে যে দিনটিকে
আমি বরণ করে নিয়েছিলাম।

সামান্য রঙের সারাৎসারে ভরপুর হয়ে আমি বেঁচে থাকি, চুপচাপ
বুড়ি মা-র মত, এক দৃঢ়বদ্ধ তিতিক্ষা
গির্জার ছায়ার মত কিংবা হাড়গুলোর জুড়িয়ে যাওয়ার মত।
এই জলরাশির সুগভীর দাক্ষিণ্যে আমি ভ'রে উঠি।
এইভাবে আপাদমস্তক সজ্জিত হয়ে, বিষণ্ণ নিবিষ্টতার মধ্যে আমি
ঘুমিয়ে পড়ছি।

আম.র গীটারসদৃশ অন্তর্দেশে একটা প্রাচীন সুর আছে,
যা নীরস আর ভরাট যা নিত্য, যা নিশ্চল,

যেন এক বিশ্বস্ত প্রাণরস, ধোঁয়ার মত ;
এক নিবৃত্ত মৌল, এক জিয়ন্ত তেল :
এক আচারনিষ্ঠ পাখি আমার চুলের যত্ন নেয় :
এক অপরিবর্তনীয় দেবদূত বাস করে আমার তরবারির মধ্যে ॥

কাব্যকৃতি

এদিকে ছায়া ওদিকে বিস্তার, এদিকে গড়রক্ষী ফৌজ
ওদিকে কুমারী মেয়ের দল,
মাঝখানে সৃষ্টিছাড়া হৃদয় আর সর্বনাশা স্বপ্ন বুকে নিয়ে,
গেল-গেল রবে পাংশু, বিনষ্ট কপাল,
আর জীবনের প্রত্যেকটি দিনের জন্যে একজন কুপিত
মৃতদার পুরুষের হা-হুতাশ নিয়ে,
হায় আমার ঘুমচোখে পান-করা চক্ষুর অগোচর প্রতি ফোঁটা জলে,
আর কানে-আসা সমস্ত শব্দে, কাঁপতে কাঁপতে,
আমার সেই একই বিমনা তৃষ্ণা আর সেই একই ঠাণ্ডা জ্বর,
সদ্যোজাত এক শ্রুতি, এক কুটিল যন্ত্রণা,
যেন এখুনি এসে পড়বে হয় চোরের দল নয় ভূতের পাল,
এবং মোক্ষম আর গভীর পরিসরের একটা খোলার মধ্যে,
এক অবমানিত পরিচারকের মত, একটু ফ্যাঁসফেঁসে ঘণ্টাধ্বনির মত,
যেন এক লক্কড় আয়না, যেন একটা পরিত্যক্ত বাড়ির গন্ধ
যে বাড়িতে ভাড়াটেরা রাতের বেলায় ঢোকে একেবারে বেহেড হয়ে,
আর মেঝের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাসি কাপড়ের গন্ধ, আর
ফুলের কোনো পাট না থাকা।
নাকি অন্যভাবে, এর চেয়ে কম বিমর্ষভাবে, হয়ত বলা যায়—
কিন্তু, আদতে দাঁড়াল, অকস্মাৎ, আমার পাঁজরে ঘা-মারা হাওয়া,
আমার শোবার ঘরে একে একে এসে পড়া অশেষ মোটা রকমের রাত্রি,
বলিদান নিয়ে জ্বলন্ত যে দিন তার হৈ চৈ,

আমার মধ্যে যতটুকু ঋষিদৃষ্টি আছে তারা চাইছে, ম্লান মুখে,
আর নানা বস্তুর একটা ঠোকাঠুকি চলেছে কিন্তু তাদের ডাকে
কোনো সাড়া মিলছে না,
এক ক্ষান্তিহীন আন্দোলন, আর নাম নিয়ে এক বিভ্রাট ॥

আবার শরৎ

ঘণ্টাগুলো থেকে লুটিয়ে পড়ে একটা শোকগ্রস্ত দিন,
যেন কোনো অস্পষ্ট বিধবার বেপথু পোশাক,
একটা রং, মাটিতে মুখ গোঁজা
চেরীর স্বপ্ন,
জল আর চুম্বনের রং পাল্‌টে দিতে
বিরামহীনভাবে ফিরে আসা ধোঁয়ার রেখা।

আমি ঠিক বোঝাতে পারছি কিনা জানি না : মাথার ওপর থেকে
রাত্রি যখন ঘনায়, যখন একা কবি
জানলায় শুনতে পায় শরতের ধাবমান অশ্বদলের খুরধ্বনি
আর পদদলিত ভয়ের পাতার মর্মর তাদের ধমনীতে,
আকাশে কী যেন কী, ষাঁড়ের আকাঠ জিভের মত,
কী যেন কী আকাশ আর আবহের সংশয়ে।

যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরে যায়,
যে না হলে চলে না সেই উকিল, কাজ করার হাতগুলো,
গাড়ির তেল, মদের বোতল.
বেঁচে থাকার সমস্ত চিহ্ন, সর্বোপরি বিছানাগুলো
রক্তাক্ত তরলে ভরে আছে, নোংরা কানগুলোতে লোকে
ঢেলে দিচ্ছে তাদের গোপন কথা,
আততায়ীরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

তবু ঠিক এ নয়, পুরনো সেই টগবগিয়ে চলা
কম্পমান তবু চিরায়ত সেই থুথ্‌ুরে শরতের ঘোড়া।

পুরনো শরতের আছে লাল দাড়ি
আর তার দুগাল ঢেকে আছে বিভীষিকার ফেনায়
আর তার পিছু নেওয়া হাওয়ার গড়নটা সমুদ্রের
আর তার গায়ে গোর দেওয়া পচনের খোশবু।
আকাশ থেকে রোজ নেমে আসে এক পাঁশুটে রং,
পায়রাদের ছড়াতে হয় তা জমির এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো :
চোখের জলে আর ভুলে যাওয়ায় পাকানো হয় যে দড়ি,
ঘণ্টাগর্ভে বছরের পর বছর সুপ্ত ছিল যে সময়,
সব কিছু,
পোকায়-খাওয়া জীর্ণ কাপড়, তুষার আসতে দেখা রমণীর দল,
না ম'রে যা কেউ ধারণায় আনতে পারে না সেই কালো আফিমের
ফুল, —
সব কিছু আমার উদ্যত হাতে এসে পড়ে
বর্ষণের মধ্যে ॥

কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি

তোমরা জানতে চাইবে : তো কোথায় সেই নীলগাছের ফুল ?
আর আফিম ফুলে আবৃত নিগূঢ় তত্ত্ব ?
আর অনেক সময় কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করা সেই বৃষ্টি
যে তার কথাগুলো কোটরে কোটরে আর পাখিতে পাখিতে
ভরিয়ে রাখত ?

আমার যে কী হয়, দাঁড়াও, আমি তোমাদের বলছি।
আমি থাকতাম

মাদ্রিদের এক উপকণ্ঠে, যেখানে ঘণ্টা ছিল,
ঘড়ি ছিল, গাছ ছিল !

সেখান থেকে দেখা যেত
কাস্তিলার শুক্‌নো মুখ
চামড়ার সমুদ্রের মত।

আমার বাড়িটাকে বলা হত
ফুলবাড়ি, সব জায়গায় বকফুল
ফুটে থাকত ব'লে : বাড়িটা
বড় সুন্দর,
বাড়িময় কুকুর আর বাচ্চাকাচ্চা।

বাউল, তোর মনে পড়ে ?
তোর মনে পড়ে, রাফায়েল ?
ফেদেরিকো, তোর মনে পড়ে
মাটির তলা থেকে,
মনে পড়ে আমার বাড়িময় সেইসব অলিন্দ
যেখানে জুন মাসের আলোয় তোর হামুখের ফুলগুলো ডুবে যেত ?

ভাই, ও ভাই !

সব
দরাজ গলা, বেচাকেনার রসকষ,
বুকের মধ্যে হাঁচড়-পাঁচড়-করা রুটির তালগোল,
আমার আরগুয়েলের সেই শহরতলির হাটে
মাছপট্টির মাঝখানে দোয়াতের মত পাথরের মূর্তি
তেল পোঁছুত পলায়,
হাত আর পায়ের
বিস্তর হট্টগোলে ভ'রে উঠত রাস্তা,
এইটুকু মাপে, এইটুকু ওজনে অসম্ভব তাৎপর্য পেত

জীবন,

গাদা করা মাছ,

নিস্তাপ সূর্য নিয়ে, ছাদগুলোর যে বুনট, তার মধ্যে
বাণমুখ ধরায়।
আলুর আত্মহারা চিকন গজদন্ত আভা,
আসমুদ্র টমেটোর পুনরাবৃত্তি।

একদিন সকালে কী হল, হঠাৎ সব কিছু লী লী ক'রে জ্বলে উঠল :
একদিন সকালে
টপাটপ জীবন গিলতে গিলতে
মাটি থেকে বেরিয়ে এল দাবানল,
আর তখন থেকে আগুন,
গুলিবারুদ সেই তখন থেকে,
আর তখন থেকে রক্ত।

উড়োজাহাজ আর মূরদের নিয়ে ডাকাতের দল,
আংটি আর বেগমসাহেবাদের নিয়ে ডাকাতের দল,
আশীর্বাদকের ভূমিকায় কালো কাপড়ের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে
ডাকাতের দল
আকাশ থেকে পড়ল শিশুদের খুন করার জন্যে
আর রাস্তায় রাস্তায় শিশুদের রক্ত
বয়ে গেল সরলভাবে, অবিকল শিশুদের রক্তের মত।

শেয়ালগুলো, যাদের দেখে একটা শেয়ালও ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নেবে,
নিরেটগুলো, যাদের শুঁটকো কণ্টিকারিও মুখ থেকে থু ক'রে ফেলে দেবে,
কেউটেগুলো, যাদের দেখে কেউটেরাও নাক সিঁটকোবে !

•

তোমাদের সামনাসামনি আমি উঠে আসতে দেখেছি
স্পেনের রক্ত
গর্বের আর ছুরির একটি একক ঢেউয়ে

তোমাদের তলিয়ে দিতে।
জেনারেলের দল
বেইমানের দল :
দেখ আমার মৃত বাড়ি,
দেখ স্পেন ভেঙে মিস্‌মার :
তবু প্রত্যেকটা মৃত বাড়ি থেকে ধেয়ে আসছে জ্বলন্ত ধাতু
ফুলের বদলে,

স্পেনের প্রত্যেকটি ফোকর থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্পেন,
প্রত্যেকটি নিহত শিশুর কাছ থেকে এসে যাচ্ছে চোখ-ফোটানো
একটি ক'রে বন্দুক
প্রত্যেকটি পাপ থেকে জন্মাচ্ছে বুলেট
যা একদিন ঠাঁই খুঁজে নেবে
হৃৎপিণ্ডে।

তুমি কি জানতে কেন তার কোনো কবিতায়
ঘুণাক্ষরেও থাকে না
যেখানে সে দেখেছে সেই দেশের মৃত্তিকা আর পাতার কথা,
বিরাট বিরাট আগ্নেয়গিরির কথা ?

এসো দেখ রক্ত রাস্তাময়,
এসো দেখ
রক্ত রাস্তাময়।
এসো দেখ রক্ত
রাস্তাময় ॥

মাদ্রিদে পদার্পণ করল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড

সকালটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডা,
শীতের সেই মাসটা ছিল ভারি কষ্টের, কাদায় আর ধোঁয়ায় মলিন,
হাঁটু না থাকা একটি মাস, অবরোধ আর দুর্ভাগ্যে বিষণ্ণ একটি মাস,
যখন আমার বাড়ির ভিজে শার্সিগুলো পেরিয়ে ভেসে আসছিল
শুনছিলাম
রাইফেলের মুখে আফ্রিকায় শেয়ালদের হাঁকডাক আর রক্তে
চপচপ করা তাদের দাঁত,
তখন,
যখন আশা বলতে আমাদের শুধু বারুদের স্বপ্ন, যখন আমরা মনে
করছিলাম
শুধু গিলে-খাওয়া রাক্ষসে আর মার-উচাটনে পৃথিবীটা ভর্তি।
তখন, মাদ্রিদ্রের শীতের মাসের বরফ ভেদ করে, ভোরবেলার
কুয়াশায়
আমি দেখলাম আমার এই চোখদুটো দিয়ে, আমার এই চক্ষুষ্মান
হৃদয়টা দিয়ে,
আমি দেখলাম এসে পৌঁছুল নিষ্ঠাবানের দল, স্বল্পসংখ্যক আর দৃঢ়বদ্ধ
পরিণত আর মহাউৎসাহী প্রস্তরকঠিন বাহিনীর বিরাট পুরুষ
সৈনিকেরা।

সে ছিল এক শোচনীয় সময় যখন মেয়েদের
এক ভয়ঙ্কর গনগনে কয়লার মত বহন করতে হত অদর্শন
আর হিস্পানী মৃত্যু, অন্যান্য মৃত্যুর চেয়ে ঢের বেশি কটু আর তীক্ষ্ণধার,
সেইসব জমির ওপর ঝুলে থাকত—
এই সেদিনও যে সব জমিকে গৌরবান্বিত করেছে গোধুম।

রাস্তা দিয়ে মানুষের চূর্ণিত রক্ত গিয়ে মিশেছিল
ঘরবাড়ির ভেঙে-পড়া হৃদয় ফেটে বেরিয়ে আসা দরবিগলিত জলধারায়;
ছিন্নভিন্ন শিশুদের হাড়, জননীদের শোকবিলাপের মর্মন্তুদ নৈঃশব্দ্য,

অরক্ষিতদের চোখ চিরদিনের মত বন্ধ
এ সমস্তই যেন মন ভার হওয়া আর হারানো, যেন থুথু-ফেলা বাগান,
এ সমস্তই চিরদিনের মত নিহত বিশ্বাস আর নিহত ফুল।

কমরেডরা আমার,
তখন,
তোমাদের আমি দেখেছিলাম।
আর আমার চোখ জুড়ে এখনও গর্ব
কেননা কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল পেরিয়ে কাস্তিলার শুচিশুভ্র ললাটের দিকে
আমি তোমাদের আসতে দেখেছিলাম,
নীরব আর কঠিন,
ভোরের আগে ঘণ্টাধ্বনির মত,
অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না আব নীল নীল চোখ নিয়ে সেই কোন্
দূর দূর থেকে আসা,
তোমাদের প্রান্তগুলো থেকে, তোমাদের হারানো হৃত দেশগুলো থেকে
তোমাদের স্বপ্নগুচ্ছ থেকে,
পোড়া মধুরতা আর বন্দুকে কানায় কানায় হয়ে
হিস্পানের শহর রক্ষা করতে
যেখানে জানোয়ারদের দংশনে
কোণঠাসা স্বাধীনতার পতন আর মৃত্যু হতে পারে।

ভাইরা আমার, এখন থেকে
তোমাদের শুদ্ধতা আর শক্তি, তোমাদের বিধিসম্মত ইতিহাস,
শিশু আর পুরুষ, স্ত্রীলোক আর বুড়োমানুষের কাছে জ্ঞাত হোক,
যারা আশাহারা তাদের সকলের কাছে পৌঁছোক, গন্ধকের বায়ুতে
ক্ষয়ে-যাওয়া খনিগর্ভে নামুক,
ক্রীতদাসের অমানুষিক সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাক,
যেন সমস্ত নক্ষত্র, যেন কাস্তিলার আর দুনিয়ার সমস্ত ধানের শীষ
লিপিবদ্ধ করে

তোমাদের নাম আর তোমাদের দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়া সংগ্রাম
আর লাল দেবদারুর মত শক্তিমান আর মৃন্ময় তোমাদের বিজয়।

যেহেতু তোমাদের আত্মোৎসর্গ দিয়ে তোমরা সম্ভব করেছ
উজ্জীবিত করতে
হৃত বিশ্বাস, চলে যাওয়া আপনজন, পৃথিবীতে আশা ভরসা
আর তোমাদের অপর্যাপ্ততার ভেতর দিয়ে, তোমাদের মহনীয়তার
ভেতর দিয়ে
তোমাদের মৃতদেহের ভেতর দিয়ে
যেন রক্তের প্রস্তরকঠিন কোনো উপত্যকার মাঝখান দিয়ে
ইস্পাতের আব আশার বনকপোত নিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক মহাকায় নদী॥

ব্রুসেল্‌স্‌

আমার করে ফেলা সব কাজ, আমার হারিয়ে ফেলা সব জিনিস,
থেকে থেকে আমার জয় করা সব কিছু,
তিক্ত লোহায়. বিদায়কালে হাত বাড়িয়ে তা থেকে আমি সামান্যই
নিয়ে যেতে পারি।
হঠাৎ আঁতকে ওঠার একটা স্বাদ,
জলন্ত সব চিলের পালকে ঢেকে যাওয়া একটা নদী,
পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে গন্ধকে উজানো একটা পিছুটান।

আমাকে এখনও মার্জনা করে নি অখণ্ড লবণ
করে নি অবিচ্ছিন্ন রুটি, করে নি সমুদ্রের বৃষ্টিতে গেলা
ছোট্ট গির্জা, আমাকে এখনও মার্জনা করে নি
গুপ্ত ফেনায় দষ্ট কয়লা।
আমি তল্লাস ক'রে তারপর পেয়েছি, অপর্যাপ্ত.
মাটির তলদেশে, ভয়ঙ্কর দেহগুলোর মাঝখানে,

কঠিন অস্ত্রের নিচে আসা-যাওয়া করা
পাঙাশ কাঠের একটা দাঁতের মত,
যন্ত্রণার মালমশলার কাছে,
এদিকে চাঁদ আর ওদিকে ছুরিছোরা
এই দুইয়ের মধ্যে নিশিকালে মরে যাওয়া।

এখন এ
হিসেব-না-করা বেগের মাঝখানে, তারবিহীন
দেয়ালের পাশে,
সীমাসরহদ্দ দিয়ে ঘেরা রসাতলে
যে নক্ষত্রপুঞ্জ খোয়ায় তার সঙ্গে
এই যে আমি এইখানে, উদ্ভিদ্‌ভাবে,
একা ॥

স্তোত্র আর প্রত্যাবর্তন

হে পিতৃভূমি, হে স্বদেশ! তোমার দিকে উজিয়ে দিই আমার রক্ত।
আমি তোমার জন্যে হুতুশে, দুচোখ জলে ভ'রে
ছেলে যেমন মার জন্যে হয়।
তুমি গ্রহণ করো এই দৃষ্টিহীন বীণা
আর এই নিরুদ্দেশ ললাট।

আমি বেরিয়েছিলাম বাহিবদুনিয়ায় তোমার কোল-আলো-করা
মাণিক আনতে,
আমি বেরিয়েছিলাম তোমার নামের তুষার বুলিয়ে
মাটিতে-প'ড়ে-যাওয়াদের শুশ্রূষা করতে,
আমি বেরিয়েছিলাম তোমার চেরাই-করা শুদ্ধ কাঠে
একটা ইমারত তুলতে,

আমি বেরিয়েছিলাম আহত সৈনিকদের বুকে তোমার বীরচক্র
পরাতে।

এখন আমি তোমার সারাৎসারে ঘুমিয়ে পড়তে চাই।
আমাকে দাও তোমার সেই মর্মভেদী দড়িদড়ার টলটলে রাত্রি,
তোমার জলজাহাজের রাত্রি, তোমার নক্ষত্রখচিত আকাশছোঁয়া মহিমা।

হে আমার পিতৃভূমি, আমি বদল করতে চাই আমার ছায়া।
হে স্বদেশ, আমি বদলাতে চাই আমার গোলাপ।
আমি তোমার চিকন কটিতট আমার বাহু দিয়ে ঘিরতে চাই,
আমি বসতে চাই তোমার সমুদ্রচূর্ণিত পাহাড়ে ;
যাতে আমি গোধূম করতলে রেখে তার অন্তর নিরীক্ষণ করতে পারি।
আমি তুলে-বেছে আনতে চলেছি সোরাগর্ভ কৃশতনু গাছগাছালি,
আমি কাটতে চলেছি ঘণ্টাধ্বনির হিমানী আঁশের সুতো,
আর তোমার স্বনামধন্য আর নিরিবিলি ফেনপুঞ্জ দেখতে দেখতে
তোমার রূপলাবণ্যের জন্যে আমি গড়ে দেব বেলাভূমির এক পুষ্পহার।

হে পিতৃভূমি, হে স্বদেশ
তোমাকে সম্পূর্ণ ঘিরে প্রতিরোধী জল
আর প্রতিরোধী তুষার,
তোমাতে মিলেছে চিল আর গন্ধক
আর তোমার নকুল আর নীলকান্তমণির কুমেরুবদ্ধ করতলে
এক ফোঁটা বিশুদ্ধ মানবিক আলো
শত্রুদের আকাশ টাটিয়ে দিয়ে ভাস্বর।

এই জন্মান্ধ, ভয়ঙ্কর আবহে
তোমার আশার কঠিন ধানছড়াগুলো উঁচুতে তুলে ধরো,
হে স্বদেশ, পাহারায় থাকো তোমার আলোর।
তোমার দূর বিস্তারে পড়েছে এইসব দুষ্কর আলো,

মানুষের এই ভবিতব্য,
যে পথে তুমি রক্ষা ক'রে চলেছ একটিমাত্র রহস্যময় ফুল,
নিদ্রিত আমেরিকার বিশালতায় ॥

যারা আবিষ্কার করেছিল

উত্তর থেকে আলমাগ্রো এনেছিল কোঁচকানো বিদ্যুৎ,
সারা ভূখণ্ড যেন বিছানো কোনো নক্সা
বিস্ফোরণে আর গোধূলিতে এমনি ক'বে দিনরাত হুমড়ি খেয়ে
সে পড়ে থাকত
মাটির চোট-খাওয়া রণকৌশল দেখতে দেখতে
সেই হিস্পানী তাব শুষ্ক মূর্তিকে মিলিয়ে দিত
কাঁটাবনের ছায়া, শিরিস আর কণ্টিকারিব ছায়া।
রাত্রি, তুষার আর বালুকা দিয়ে মূর্ত
আমার তন্বী স্বদেশ,
এর দীর্ঘ রেখায় শুধু নৈঃশব্দ্য,
এর সামুদ্রিক কিনারা থেকে উঠে-আসা শুধু ফেনা,
রহস্যময় চুম্বনে একে ভ'বে দেয় শুধু কয়লা।
জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরোর মত এর আঙুলে ফোস্কা পড়ায় সোনা
আর রুপো এব ভারী গৃহসদৃশ কঠিনীকৃত ছায়াকে করে
সবুজ চাঁদেব মত আলোকিত।
তেলের কাছে, মদিরার কাছে, পুরনো আকাশের কাছে একদিন
গোলাপের কাছে ব'সে সেই হিস্পানী
সামুদ্রিক চিলের পুরীষ থেকে জাগা ক্রুদ্ধ পাথরের এই স্থলটি
ধারণায় আনতে পারে নি ॥

অকর্ষিত অঞ্চল

পরিত্যক্ত শেষ প্রান্ত। যেখানে এলোমেলো রেখায়
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আর প্রচণ্ড কাঁটাগাছে
থরে বিথরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নীলিমা।

তাম্র শলাকায় বিদ্ধ

পাথর, বাস্তব নৈঃশব্দ্যেব
সডক, শিলাগর্ভের লবণে নিমজ্জিত
তরুশাখা।

এই যে. এইখানে আমি,

পানপাত্র বা কটিতটের মত ধ'রে রাখা কোনো সময়ের
পাণ্ডুর পদক্ষেপে অর্পিত এক মানুষেব মুখ,
ভ্রূমধ্যের নিষ্ক্রমণহীন প্রায়শ্চিত্তের জল,
ঝ'রে-পড়া শরীরী ফুলের গাছ,
অসামান্যভাবে রুদ্ধবাক আর ধৃষ্ট ধমনী।

হে আমাব দেশ, বালুকাজাত ডাঁশমশাব মত

তুমি পৃথিবীবাসী এবং অন্ধ, সব তোমাকে নিবেদিত
আমাব অন্তরাত্মার ভিত্তিমূল, তোমার জন্যে নিত্যকাল
আমাব রক্তের চোখেব পলক, ফিরে গিয়ে তোমাকে দেব
আমাব এক-সাজি পপিফুল।

তোমার খটখটে পাথবের শব্দ.

পর্বতমালার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাঁটা বার্ধক্য, তোমাব কাঁটার
নিঃশব্দ বিপুলতা।

রাত্রি হলে আমাকে দিও,

ভূলোকের বৃক্ষলতার মাঝখানে

তোমার পতাকা আন্দোলিত করা শিশিরের সলজ্জ গোলাপ ;
আমাকে দাও তোমার চাঁদ অথবা তোমার ঘোর অন্ধকারময় রক্ত
ছিটানো মৃন্ময় রুটি :

তোমার বালুতটের আলোর নিচে

কেউ মৃত নেই, শুধু আছে লবণের লম্বা লম্বা কালচক্র,
রহস্যময় জীয়ন্ত ধাতুর নীল নীল শাখা॥

মাপোচো নদীকে শীতের বন্দনা

ও হ্যাঁ, অসংক্ষিপ্ত তুষার
ও হ্যাঁ, তুষারের সম্পূর্ণ ফোটা ফুলে কম্পমান,
ছোট ছোট সুমেরুর চক্ষুপল্লব, হিমজমাট অশনি,
কে, কে তোমাকে ডেকেছে ছাইরঙা উপত্যকায়,
কে, কে তোমাকে চিলের চঞ্চু থেকে ছাড়িয়ে টানতে টানতে এনেছে
নিচে যেখানে তোমার স্বচ্ছ জল
আমার জন্মভূমির জঘন্য চীরবাস স্পর্শ করছে ?
নদী, তুমি কেন বয়ে নিয়ে চলেছ
শীতল আর গূঢ় জল,
কঠিন পাথুরে প্রত্যুষ
নিচে আমার স্থানীয় শহরের থেঁতলানো পায়ের তলায়
বড় গির্জার মধ্যে যে জলকে অনায়ত্ত ক'রে রাখে ?
ফিরে যাও, ফিরে যাও তোমার তুষারের মোহানায়,
দগ্ধে দগ্ধে মরা, হে নদী
ফিরে যাও, ফিরে যাও তোমার বিস্তীর্ণ হিমানীর পেয়ালায়,
তোমার নিগূঢ় উৎসে নিমজ্জিত করো তোমার রুপোলী শিকড়
অথবা অশ্রুবিরহিত অন্য কোনো সাগরে তুমি নিজেকে ভাঙো।
মাপোচো নদী, যখন রাত আসে
মাটিতে পড়ে যাওয়া কোনো কালো পাষাণমূর্তির মত সেই রাত
যেন দুই বিশাল চিলের মত শীত আর ক্ষুধা এ দুইয়ে কাতর
গুচ্ছের কালো কালো মাথা নিয়ে যখন ব্রিজের নিচে ঘুমোয়, ও নদী
তুষারসমুথ কঠিনহৃদয়, ও নদী
কেন তুমি আবির্ভূত হও না বিশাল ব্রহ্মদৈত্যের মত
অথবা বিস্মৃতদের জন্যে তারকাসজ্জিত নতুন ক্রুশচিহ্নের মত ?
কিন্তু না, তোমার রূঢ় ছাইগুলো বয়ে যায়
লোহার পত্রাবলীর নিচে কঠিন হাওয়ায় কেঁপে ওঠা ছেঁড়া আস্তিনের
পাশ দিয়ে,
মাপোচো নদী, তুমি কোথায় বয়ে নিয়ে যাও

নিত্য জখম-হওয়া তুষারের ডানা
উকুনদষ্ট হয়ে বরাবর তোমার বিবর্ণ উপকূলে জন্মাবে বন্য ফুল
আর তোমার শীতের জিভ চেঁছে দিচ্ছে আমার লুণ্ঠিত দেশের গাল"?
ব্যগ্রতা করছি, দেখো
দেখো যেন, দেখো যেন তোমার কালো ফেনার একটি বিন্দু
পলি মেখে উঠে আগুনের ফুলের দিকে যায়
আর মানুষের বীজ যেন ত্বরান্বিত করে ॥

আমি দক্ষিণে ফিরতে চাই

ভেরাক্রুজে আমি অসুস্থ, স্মরণ করছি
দক্ষিণে আমার জন্মস্থানের একটি দিন।
আকাশের জলে খলবল করা মাছের মত রুপোলী একটি দিন।
ঊর্ধ্বলোক থেকে পাঠানো লঁকোশ, লঁকিমাই, কারাহুয়ে
নৈঃশব্দ্যে আর শিকড়ে পরিবৃত,
চামড়া আর কাঠের তৈরি তাদের সিংহাসনে আসীন।
দক্ষিণ হল মন্দগতি গাছ আর শিশিরকণার
বরমাল্য-পরা ডুবন্ত ঘোড়া।
তার হরিৎ গ্রীবা উঁচু করলে ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ে,
তার পুচ্ছের ছায়া সিক্ত করে এই বিরাট দ্বীপপুঞ্জ
আর তার অন্ত্রের মধ্যে বেড়ে ওঠে পূজ্যপাদ কয়লা।
আর কখনও করবে না বলো আমাকে, ছায়া ; আর কখনও করবে না
বলো আমাকে, হাত ;
করবে না আমাকে, পায়ের পাতা, দরজা, পা, সংঘাত,
আর কখনও বিচলিত করবে না, বলো
জঙ্গল, রাস্তা, ধানের ছড়া, যা নীলাকার হয়ে
তোমার প্রত্যেকটি নিরন্তর ব্যবহৃত পদক্ষেপ পরিচালিত করেছে।
আকাশ, আমাকে তুমি একবার এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে যেতে দাও

আলো আর বারুদ মাড়িয়ে শিকারী বৃষ্টির নীড়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত
আমার রক্তকে ধূলিসাৎ করতে করতে যাব।

আমি যেতে চাই

সুগন্ধ তল্‌তেন নদীর কিনার-ঘেঁষা বনের অন্তরালে,
আমি চাই করাতকলগুলো থেকে বেরিয়ে ভিজে জবজবে পায়ে
সরাইখানায় ঢুকতে,
চাই কাঠবাদাম গাছের বৈদ্যুতিক আলোয় পথ চিনে যেতে,
চাই গোবরগাদার পাশে লম্বা হয়ে শুতে
চাই গোধূমের গায়ে দাঁত বসাতে বসাতে মরতে এবং পুনর্জীবন পেতে।

সমুদ্র, আমাকে এনে দাও

দক্ষিণের একটি দিন, তোমার ঢেউয়ের কণ্ঠলগ্ন একটি দিন।
দাও ভিজে গাছের একটি দিন, লাগাও নীল
মেরুবাতাস আমার চুপসে-যাওয়া পালে॥

মাগেলানের হৃদয়

দূর দক্ষিণের কথা মনে প'ড়ে
রাত্রে হঠাৎ আমি জেগে উঠি।

আমার কোথায় ঘর, আমি নিজেকে জিগ্যেস করি, ঘোড়ার ডিম,
কোথায়
আমার ঘর, আজ কী বার, কী খবর,
ধরা গলায়, স্বপ্নের মধ্যিখানে, সেই গাছ, সেই রাত্রি,
এ কে, আমি শুধোই, আমি যাই আমি বেরোই একেবারে একা.
আর চোখের পাতার মত ওঠে একটা ঢেউ, একটা দিন
তা থেকে জন্মায়, বাঘের নাক নিয়ে বিদ্যুতের কশা।

আসে দিন, এসে আমাকে বলে : 'তুমি কি শুনতে পাচ্ছ ?
ধীরে-বহা জল, নদী,

জল

তুই পাতাগোনিয়ায় ?’

জবাবে আমি বলি : আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনতে পাই।

আসে দিন, এসে আমাকে বলে : ‘একদল বন্য ভেড়া

ঐ দূরে, দেহাতী অঞ্চলে, পাথরের গা থেকে

হিমজমাট রং চাটছে। শুনতে পাচ্ছ না তাদের ব্যা-ব্যা আওয়াজ,

চিনতে পারছ না।

সেই নীল দমকা হাওয়া যার হাতে পানপাত্র হয়ে

চাঁদ, চোখে পড়ছে না হুড়মুড় ক’রে ছোটা ঘোড়ার পাল,

হাওয়ার সেই ক্ষিপ্ত আঙুল যার খালি আংটি

ছুঁয়ে আছে তরঙ্গ আর জীবন।

মনে পড়ে সেই প্রণালীস্থিত

নির্জনতা

দীর্ঘ রাত্রি, যেখানেই যাই থাকে পাইন গাছ।

এই গুমরানো বিরাগ, এই অবসাদে উল্টে দেয়

ভরা ঘট, উজাড় করে আমার জীবনের যা কিছু সব।

এক-ফোঁটা তুষার কাঁদে, আমার সন্ধানে ফেরা তার ছোট্ট ধূমকেতুর

জ্যালজেলে জীর্ণ সাজ দেখিয়ে আমার দুয়োরে ব’সে কাঁদে,

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

দমকা হাওয়া, বিপুল বিস্তার, গোচারণের মাঠে বাতাসের হা হা রব

কেউ কোথাও নেই এসব দেখার।

আমি এগিয়ে যাই, গিয়ে বলি, চলো আমরা যাই। দক্ষিণকে ছুঁই,

চলো বালির মধ্যে

নিজেকে ঢালি, দেখি নীরস কালো উদ্ভিদ, সমস্তই শুধু শিকড় আর

শিলা,

জলে আর আকাশে আঁচড়ানো দ্বীপমালা,

ক্ষুধা নামের নদী, অঙ্গারের অন্তঃস্থল,

শোকসাগরের অঙ্গন, আর যেখানে

'হিস্ হিস্ করে একক সাপ, আর সর্বশেষ
আহত খেঁকশিয়াল গর্ত খুঁড়ে লুকোয় তার রক্তাক্ত সম্পদ।
ঝড়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়, গলায় তার বিদীর্ণ হওয়ার আওয়াজ,
প্রাচীন পুঁথির কণ্ঠস্বর, তার শত ওষ্ঠের হা-মুখ
আমাকে কী যেন বলে, কী যেন যা প্রতিদিন বায়ুমণ্ডল গিলে নেয়।

আবিষ্কারকেরা আসে,
তারপর মুছে যায়

জলের সমস্তই মনে আছে কী দশা হয়েছিল সেই অর্ণবযানের।
তাদের করোটিগুলোকে আশ্রয় দেয় কঠিন পরদেশী মাটি,
দক্ষিণী আতঙ্কে তারা শব্দ করে কর্ণেটের মত,
মানুষের আর ষাঁড়ের চোখ দিনকে অর্পণ করে শূন্য কোটর,
দেয় তাদের আঙুলের আংটি, তাদের অদম্য জাগরণের শব্দ।
বুড়ো আকাশ পালবাদামের খোঁজ করে,
তাদের একজনও
আজ বেঁচে নেই : ভগ্নহৃদয় নাবিকের ভস্মের সঙ্গে থাকে
ডোবা অর্ণবযান, আর সোনালী খুঁটিগুলো থেকে,
মারীবীজাত্মক গমের চর্মথলি থেকে,
সফরের হিম অগ্নিশিখা থেকে,
(তলদেশে নিশুতি রাতে ডুবো পাহাড়ের আর অর্ণবযানে
সে কী ঠোকাঠুকি !)
পড়ে রইল শুধু মৃতদেহ বিরহিত দগ্ধ বিস্তার,
মৃত আগুনের
এক কালো টুকরো দিয়ে
নামমাত্র ভাঙা নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা।

কেবল খাঁ খাঁ করা শূন্যতা
ভারী হয়ে বসে।

রাত্রি, জল, বরফ আস্তে আস্তে চূর্ণ করে গোলক,
চতুঃসীমার সঙ্গে যোঝে সময় আর সমাপ্তি,

বেগনী চিহ্নাঙ্কিত, বুনো ইন্দ্রধনুর
অস্ত্রের নীল নিয়ে
আমার দেশের পদযুগ তোমার ছায়ায় নিমজ্জিত
আর দলিত গোলাপ চিৎকার করছে ব্যথায়।

আমার স্মৃতিতে
সেই প্রাচীন আবিষ্কারক

খাল বেয়ে নতুন করে যায়
হিমায়িত রসদ, লড়াইয়ের গোঁফদাড়ি,
বরফে-ঢাকা শরৎ, অস্থায়ী আহত কেউ !
যায় তাঁর সঙ্গে, সেই-প্রাচীনের সঙ্গে, মৃতের সঙ্গে,
ক্ষিপ্ত জল যাঁকে উচ্ছন্নে দিয়েছে
তাঁর সঙ্গে যায় তাঁর যন্ত্রণায়, তাঁর ললাটের সহযোগে।

এখনও তাঁকে অনুসরণ ক'রে ফিরছে সেই বিশাল সমুদ্রবিহঙ্গ
আর খেয়ে-ফেলা চামড়ার দড়ি, দৃষ্টির বাইরে তাঁর দুই চোখ আর
ভাঙা মাস্তুলের আড়ালে উদরস্থ ইঁদুর
দৃষ্টিহীনভাবে অবলোকন করছে ক্ষুব্ধ সমারোহ,
সেই সময় তিমিনীর গায়ের ওপর দিয়ে শূন্যতার মধ্যে
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আংটি আর হাড়।

মাগেলান।

যিনি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন তিনি কোন্ দেবতা ? দেখ তাঁর
দাড়িভর্তি পোকা
আর তাঁর পাতলুন আঁকড়ে রয়েছে
আর ডোবা নৌকোয় কুকুরের মত দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে
ভারাক্রান্ত হাওয়া :
তাঁর দেহযষ্টি এরই মধ্যে অভিশপ্ত গুরুভার নোঙরের মত নুয়ে পড়েছে,

বারদরিয়া শিস্ দেয় আর উত্তুরে বাতাস
তাঁর ভিজে পায়ের দিকে ধেয়ে আসে।
সময়ের অন্ধকার ছায়া থেকে
সমুদ্রশামুক,
পোকায় কাটা নাল,
শোকার্ত উপকূলের প্রবীণ দাঠাকুর, অজ্ঞাতকুলশীল
ঈগলের নীড়, নষ্ট কুয়োর জল, প্রণালীর জমির সার
আপনাকে আদেশ করছে আর আপনার বক্ষে লগ্ন রয়েছে
শুধু সমুদ্রের একটি চিৎকারধ্বনির ক্রুশচিহ্ন, একটি সাদা আর্তরব,
সামুদ্রিক আলোর
আর তীক্ষ্ণাগ্র নখরের, ডিগবাজির পর ডিগবাজি খাওয়া ;
ধূলিসাৎ অঙ্কুশের।

তিনি পৌঁছোন প্রশান্ত সাগরে

যেহেতু সর্বনেশে সমুদ্রের দিন সাঙ্গ হয় একদিন,
আর নৈশ হাত তার আঙুলগুলো একটা একটা করে কাটে
যতক্ষণ না সে শেষ হয়ে যায়, যতক্ষণ না মানুষের জন্ম হয় :
আর ক্যাপ্টেন নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেন ইস্পাত,
আর আমেরিকা তুলে ধরে তার বুদ্বুদ
আর বেলাভূমি তুলে ধরে জন্মের দরুন ঘোলাময়লা ঊষায় মাখামাখি
তার বিবর্ণ খাঁড়ি,
তারপব অর্ণবযান থেকে একটা চিৎকার ওঠে আর ডোবে
এবং তারপর আরও একটা চিৎকার আর তখন ফেনা থেকে জন্ম নেয়
প্রত্যূষের সকাল।

সবাই মারা গেছে।

জল আর উকুনের ভাই সকল, মাংসভুক গ্রহলোকের ভাই সকল,
পরিশেষে ঝড়ের ধাক্কায় মাস্তুলগাছি যে নতশির হয়েছিল
তোমরা কি দেখেছিলে ?

ঝঞ্ঝার প্রমত্ত অকর্ষিত তুষারের নিচে চূর্ণ হয়েছিল পাথর
তোমরা কি দেখেছিলে ?
যাক, এতদিনে তোমরা এখন পেলে তোমাদের হারানো ইন্দ্রলোক।
এতদিনে পেলে তোমাদের শাপান্তকারী ফৌজ,
এতদিনে তোমাদের ত্রিশঙ্কু বেতালেরা
বালির ওপর সীলমাছের পদচিহ্নে চুম্বন করছে।
এতদিনে তোমাদের আংটিবিহীন আঙুলগুলোতে এল
উঁচু মালভূমির একরত্তি সূর্য, মৃত দিন
কম্পমান, ঢেউ আর পাথরের আরোগ্যশালায় ॥

মহাসমুদ্র

যদি হয় প্রতিভাত আর শ্যামল তোমার নগ্নতা,
তোমার আপেল হয় অপরিমেয়, যদি হয়
অন্ধকারে তোমার মাজুবকা, তবে কোথায়
তোমার উৎস ?
রাত্রির চেয়ে মধুরতর
রাত্রি,
লবণ,
মা গো, রক্তাক্ত লবণ, উৎকীর্ণ জলজননী,
ফেনায় আর মজ্জায় মার্জনা-করা গৃহ ;
নাক্ষত্র দ্রাঘিমার মহাকায় মধুরতা :
একটিমাত্র তরঙ্গ হাতে রাত্রি :
সমুদ্রঈগলের প্রতিপক্ষে বিষম ঝড়
অতলান্ত গন্ধকজাত লবণের হাতের নিচে অন্ধ :
এত বেশি রাত্রিতে ভূগর্ভের গুমঘর,
শীতল দলমণ্ডল কেবল আস্ফালন আর পরদেশে হানা,
নক্ষত্রে সবলে প্রোথিত ক্যাথিড্রাল।

রয়েছে তোমার উপকূলভাগের বয়ঃসীমায় দৌড় করা সেই জখমী ঘোড়া,
হিমরেখার আগুনে প্রতিস্থাপিত,
রয়েছে পাখির পালকসমূহে রূপান্তরিত লাল দেবদারু,
আর তোমার হাতের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া উৎকট কাঁচের বাসন
আর দ্বীপপুঞ্জে আক্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন গোলাপ
আর তোমার প্রতিষ্ঠিত জল আর চাঁদের টোপর।

হে স্বদেশ, তোমার মাটির জন্যে
এই সমস্ত কালো আকাশ!
এই সমস্ত সর্বজনীন ফলমূল, এই সমস্ত
প্রলাপমুখর মুকুট!
তোমার জন্যে এই ফেনার পানপাত্র
বজ্র যেখানে অন্ধ অ্যালবাট্রসের মত নিজেকে খোয়ায়,
আর যেখানে তোমার পূতপবিত্র হালচাল দেখে
উঠে আসে দক্ষিণের সূর্য ॥

নতুন পতাকার নিচে পুনর্মিলন

কে মিছে কথা বলেছে? পদ্মের পা
ভাঙা, কিছুরই তল পাওয়া যাচ্ছে না, সমস্তই কানা করে দেওয়া,
সকলেরই গা-ভর্তি ক্ষত আর অন্ধকারের বাহার জাঁকজমক!
সব কিছুই, ঢেউয়ের নিয়মে ঢেউ-থেকে-ঢেউ,
সূর্যকান্তমণির অসাব্যস্ত সমাধি
আর ধানছড়ার রুক্ষ স্খলন!
এর মধ্যে আমার পেতেছিলাম বুক, সমস্ত অদৃষ্টচালিত
লবণের দিকে পেতেছিলাম কান, আমার শিকড়
আমি গাড়তে গিয়েছিলাম রাত্রে:
আমি তদন্ত করেছি মাটির তিক্ততার বিষয়ে,

আমার কাছে সমস্তই ছিল হয় যামিনী নয় দামিনী :
আমার মাথার ভেতর লাগানো ছিল গোপন মোম
আর পদচিহ্নে ছড়ানো ছিল ছাই।

আর মৃত্যুর জন্যে যদি না হবে
তবে কার জন্যে আমি চুঁড়েছি এই ঠাণ্ডা নাড়ীর স্পন্দন ?
যেখানে কেউ আমাকে শুনতে পায় না,
সেই পরিত্যক্ত অন্ধকারে কোন্ যন্ত্র আমি হারিয়েছি ?
না,

এবার সময় হয়েছে, পালাও,

রক্তের ছায়ারা
নক্ষত্রের হিমানী, মানুষেব পায়ের শব্দ শুনলেই হটে এসো
আর আমার পায়ের তলা থেকে কালো ছায়াটা সরিয়ে নাও !

মানুষের দলে আমার হাতও তেমনি জখম
আমি ধ'রে আছি একই লাল পানপাত্র
আর সমান ক্রুদ্ধ বিস্ময় :

একদিন

মানবিক স্বপ্নে
টগবগ করতে করতে
এক বুনো ঘোড়া এল
আমার সর্বগ্রাসী রাত্রে
যাতে আমি আমার নেকড়ে বিক্রমে
মানুষের পায়ে পায়ে যেতে পারি।

আর এইভাবে, পুনর্মিলিত,

একনিষ্ঠভাবে কেন্দ্রগত, আমি আশ্রয় খুঁজি না
কান্নার কোটরে : আমি দেখাই
মৌমাছির ভাণ্ডার : মানুষের সূর্যের জন্যে
ঝলমল করা রুটি : রক্তের দূর ব্যবধানে

একটি গোধুম দেখার জন্যে

রহস্যের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নীলিমা।

কোথায় আসন পাতা তোমার গোলাপের ?
কোন্‌খানে তোমার নক্ষত্রের চোখের পাতা ?
তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে
তোমার ঘর্মাক্ত সেই আঙুলগুলো মরীয়া হয়েছিল
বালির নাগাল পেতে ?
ওঁ শান্তি, বিষাদব্যথিত হে সূর্য,
ওঁ শান্তি, অন্ধচক্ষু হে ললাট,
জ্বলন্ত জায়গা আছে তোমার জন্যে সড়কে,
প্রহেলিকাবর্জিত পাথর তোমাকে চোখে চোখে রাখে,
আছে পলাতক, দিগম্বর, অনুধ্যায়ী নরক,
এক ক্ষিপ্ত নক্ষত্র নিয়ে কারার নৈঃশব্দ্যমালা।

ফোঁপানির মুখে একসঙ্গে হওয়া !
যথেষ্ট সময় হয়েছে
মাটির আর সুরভির, ভয়ঙ্কর লবণ থেকে সদ্যউত্থিত
এই মুখের দিকে তাকাও,
চেয়ে দেখ স্মিতহাস্যের এই তিক্ত হামুখের দিকে,
চেয়ে দেখ এই নতুন হৃদয়
সঙ্কল্পবদ্ধ আর সোনালী রঙের উপ্‌চানো ফুল নিয়ে তোমাকে সম্ভাষণ
করছে॥

মাচু পিক্‌চুর শিখর থেকে

১

শূন্য জালের মতন হাওয়া থেকে হাওয়ায়
আমি গেলাম রাস্তা আর বায়ুমণ্ডল
এই দুইয়ের মাঝখান দিয়ে,
নতুন পাতার বোধন আর বিসর্জনের পর্ব নিয়ে আসা
শরতের আবির্ভাবের ভেতর দিয়ে,
বসন্ত আব গুচ্ছাকারে গোধুম
এ দুইয়ের মাঝখান দিয়ে
যেন একটা পড়ন্ত দস্তানার ভেতব,
যেখানে মহত্তর প্রেম
চাঁদের দীর্ঘ বিলম্বিত উদয়ের মত কিছু আমাদেব দেয়।

(রৌদ্র ঝলকিত দিনগুলো আমি কাটাই দলবদ্ধ দেহেব
অগ্নের শব্দহীনতায় রূপান্তরিত ইস্পাত :
শেষ ধূলিকণা পর্যন্ত রহস্য-অনাবৃত রাত্রি
স্বয়ম্বৃত পিতৃভূমির ব্যূহসজ্জিত বেলাতট।)

বেহালার ভিড়ে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিল একজন
মাটি-চাপা-পড়া মিনারের মত সে এক পৃথিবীকে উদ্ঘাটিত করেছিল
সমস্ত ভগ্নস্বর গন্ধকবর্ণ পাতার নিচে
লীন হয়ে আছে যে মিনারের সর্পিল।
এবং আরও নীচে, খনিজ সোনার মধ্যে
উল্কার পটি জড়ানো তরবারির মত
আমি আমার সুকুমার দামালো হাত
নিমজ্জিত করেছিলাম মাটির মনোমুগ্ধকর জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে।
আমি আমার কপাল রেখেছিলাম
নিচে তরঙ্গমালায়,
জলের একটি ফোঁটার মত আমি গড়িয়ে গিয়েছিলাম গন্ধকময় শান্তিতে

আর যেন একজন অন্ধের মত, আমি ফিরে এলাম
ক্ষয়িত মানবিক বসন্তকালের জুঁইফুলের কাছে।

২

ফুল যদি ফুলকে অর্পণ করে তার অন্তিম বীজ
আর পাহাড় যদি রক্ষা করে তার বিক্ষিপ্ত মুকুল
হীরক আর বালুকার দলিতমথিত সাজে,
গর্জমান সমুদ্রের ভয়ঙ্কর স্রোত থেকে কুড়িয়ে এনে
আলোর পাঁপড়িগুলোকে মানুষ কুঁকড়ে মুকড়ে ফেলে
আর তার হাতের ভেতর নড়ে-চড়ে-ওঠা ধাতুকে সে গড়ন দেয়।
আর অচিরে, মুষড়ে-পড়া টেবিলের ওপর, জামাকাপড় আর ধোঁয়ার
মধ্যিখানে, তাস-ভাঁজা একটি রাশির মত,
হাতে থাকে আত্মা :
জাগরূক স্ফটিক, সমুদ্রে মর্মযাতনা
শীতের ডোবার মত : তবু
সেটাকে কষ্ট দাও আর মেরে ফেল কাগজ আর ঘৃণা দিয়ে.
দিনগুলোর গালচের ভেতর শ্বাস রোধ ক'রে মারো,
তারের বৈরী আবরণের মধ্যে ফালা ফালা ক'রে চেরো।

না : ছুট্‌দোর, আসমান, দরিয়া বা সড়ক বরাবর
কে পাহারা দিচ্ছে তার রক্ত (টকটকে লাল আফিমফুলের মত)
ছুরিছাড়া ?
মানুষ কেনাবেচার সওদাগরদের
বিষণ্ণ পণ্যগুলোকে দলা পাকিয়ে দিয়ে গেছে করাল ক্রোধ,
যখন একটা হাজার বছরের ভেতর দিয়ে শিশির
গ্রাম গাছের মাথার ওপর ফেলে গেছে তার স্বচ্ছ অক্ষর,
সেই একই অপেক্ষমাণ শাখায়, হা হৃদয়,
শরতের গুহাকন্দরে পিষ্ট হা কপাল !
কত বার যে কোনো শহরের শীতকালীন রাস্তায়, অথবা
অটোবাসে বা জাহাজে গোধূলিতে, অথবা রাত্রে, সেই নিবিড়িতম

নির্জনতায় : কোনো বন্ধুসম্মেলন, ঘণ্টাধ্বনি আর সশব্দ ছায়ার নিচে,
মানবিক ভোগসুখের ঠিক সেই নকল গুম্ফাতেই, আমি চেয়েছিলাম
তখনকার মত থামতে
এবং সেই দুজ্ঞেয় চিরন্তন ধমনীর সন্ধান করতে
যা আমি ইতিপূর্বে ছুঁয়েছিলাম পাথরে
অথবা চুম্বনের স্খলিত বজ্রে।
(শস্যের দানায় থাকে অন্তহীন অঙ্কুরের স্তরে স্তরে বড় স্নেহে
'আমার কথাটি ফুরোয় না'-বলা খৈ-ফোটানো বুকের বীজকুঁড়ির
চিরকেলে গল্প,
আর চিরদিন সেই একভাবে একটানা চলে গজদন্তের ভেতর দিয়ে,
আর জলের দর্পণে স্পষ্ট দেখা যায়
পিতৃভূমি, বেজে ওঠার একটা ঘণ্টা, ওদিকে দূরের তুষার থেকে
এদিকে রক্ত-আঁধার করা তরঙ্গ পর্যন্ত।)

খুব বেশি হলে আমি ধরতে পেরেছিলাম একগুচ্ছ মুখ,
হঠকারী মুখোশ, যেন সোনার শূন্য আংটি
যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জামাকাপড়, এক দুর্দান্ত শরতের বালখিল্যের দল
যারা ভয়ার্ত জাতিগুলোর শোচনীয় গাছটা ধ'রে নাড়াচ্ছে।

আমার হাত রাখার এমন কোনো জায়গা পাই নি
যা নদীর মত সাবলীল অথবা যা
পাথুরে কয়লা বা স্ফটিকখণ্ডের মত সুদৃঢ়,
যাতে আমার পৌঁছুনো হাতে ফিরে আসে উষ্ণতা অথবা শীতলতা।
মানুষ বলতে কী ছিল? বাঁশী আর মালগুদামের মাঝখানে
তার প্রকাশ্যে কথার কোন্ অংশে, তার ধাতব গতিগুলোর
কোন্‌টাতে অজর, অক্ষর জীবন বাস করত?

মানুষকে মাড়াই করা হয়েছে ভুট্টার মত
হৃত কৃতকাজের, দুঃখাবহ ঘটনাবলীর অন্তহীন খামারে,

প্রথম থেকে সাত পর্যন্ত, আট পর্যন্ত,
আর প্রত্যেকটিতে এসেছে একটি মৃত্যু নয়, বহু মৃত্যু :
প্রতিদিন এইটুকু এইটুকু মৃত্যু, ধুলো, কৃমিকীট, শহরতলির কাদার মধ্যে
নির্বাপিত ল্যাম্পো, একটা ছোট ধুম্‌সো-ডানার মৃত্যু
একটা বাঁটকুল বল্লমের মত প্রত্যেকটি মানুষকে ফুঁড়েছে :
রুটি বা ছুরি
যেদিক দিয়েই ঘা মারা হোক,
হাটে যে গরু খেদিয়ে নিয়ে যায়, যে জাহাজঘাটের অন্নদাস,
যে লাঙল-ঠেলা গোলা লোক,
অথবা হট্টগোলে রাস্তায় যে থরথরিয়ে যায় :
তারা সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায়, তাদের সংক্ষিপ্ত দৈনিক
মৃত্যু :
আর তাদের দিনগুলোব বিষণ্ণ ভেঙে-পড়া হয়েছে সেই বিরস পানপাত্র
যাতে তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চুমুক দিচ্ছে।

৪

পরাক্রান্ত মৃত্যু আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বহুবার :

এটা ছিল যেন তরঙ্গমালার অদৃশ্য লবণ,
আর এর অদৃশ্য স্বাদুগন্ধ থেকে যা বেরিয়ে এল
সেটা দেখাল অর্ধেক গিরিশৃঙ্গ আর অর্ধেক হিমানী সম্প্রপাতের মত
অথবা বাতাস আর হিমবাহের বিপুল গাঁথুনির মত।
আমি এলাম যেখানে লৌহের কিনারা, বাযুব প্রণালী,
কৃষি আর পাহাড়ের কাফন,
শেষ ধাপের নাক্ষত্র শূন্যতা
আর মাথা-ঝিমঝিম-করা ঘোরালো রাজপথ :
কিন্তু বিস্তীর্ণ সাগর, ওহে মৃত্যু ! তুমি তো আসো না ঢেউয়ের পর
ঢেউ হয়ে,
তুমি আসো রাত্রির মোট যোগফলের মত
নৈশ স্পষ্টতায় টগবগিয়ে।

তুমি কখনও আসো নি পকেট হাঁটকাতে হাঁটকাতে, ভাবাই যায় না।
তুমি আসছ শালদোশালা না চড়িয়ে :
পরিবৃত নৈঃশব্দ্যের ঊষারাগের কার্পেট ছাড়া :
দুঃখের অত্যুচ্চ অথবা সমাহিত উত্তরাধিকার ছাড়া।

আমি ভাল বাসতে পারি নি প্রত্যেক সত্তার ভেতরের সেই গাছকে
যে ঘাড়ে নিয়ে আছে ক্ষুদ্রকায় তার শরৎ
(একটি হাজার পাতার মৃত্যু),
যাবতীয় ভুয়ো দেহত্যাগ আর পুনরুজ্জীবন
মর্ত্যবিহীন, পাতালবিহীন :
আমি সাঁতরে যেতে চেয়েছিলাম ব্যাপকতম জীবনের ভেতর দিয়ে,
মুক্ততম নদীর মোহনায়,
আর যখন একটু একটু ক'রে মানুষ আমাকে ফিরিয়ে দিল
আর এমনভাবে তার জায়গা আর দরজা এঁটে দিতে আরম্ভ করল যাতে
আমার প্রবহমান হাত তার আহত অনস্তিত্বে না ঠেকে,
তখন আমি চলে গেলাম রাস্তা থেকে রাস্তায় আর নদী থেকে নদীতে,
আর শহর থেকে শহরে আর বিছানা থেকে বিছানায়,
আর আমার নোনা মুখোশ মরুভূমি পেরিয়ে গেল,
আর সেই শেষ হতমান বালিগুলোতে আলো, আগুন,
রুটি, পাথর কিছু না, নৈঃশব্দ্য না, একা,
আমি গড়াগড়ি খেতে লাগলাম, নিজের মৃত্যুতে মরে যেতে যেতে।

৫

রুক্ষ পালকের পাখি, হে গম্ভীর মৃত্যু,
এইসব বাসাবাড়ির অভাগা ওয়ারিশ নাকেমুখে গুঁজে দুবেলা খাওয়ার
মাঝখানে, শূন্য চামড়ার নিচে
যেটাকে বয়ে নিয়ে চলেছিল, সেটা তুমি ছিলে না :
ছিল আর কিছু, উৎসন্ন তন্ত্রীর এক ক্ষীণপ্রাণ পাঁপড়ি,
বুকের এক পরমাণু যা লড়াইয়ের ভেতরে যায় নি
অথবা হাকুচ তেতো শিশির যা ললাট স্পর্শ করে নি।

এটি ছিল যার পুনর্জন্ম হতে পারে নি,
শাস্তিহীন বা রাজ্যহীন সেই ছোট মৃত্যুর ভাঙা একটি অংশ :
একটি হাড়, বাজাবার একটি ঘণ্টা যা লোকটির মধ্যে মারা গিয়েছিল।
আমি আয়োডিনের ব্যাণ্ডেজটা ওঠালাম, হাত ডুবিয়ে দিলাম
মৃত্যুকে হনন করা দুর্ভাগা দুঃখগুলোর মধ্যে
আর সেখানে আত্মার দুর্লক্ষ্য ফাঁকফোকরের ভেতর দিয়ে বয়ে-যাওয়া
ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝিরঝির ছাড়া আর কিছুই আমি খুঁজে পেলাম না।

৬

তখন আমি মাটির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম
হারানো অরণ্যের ভয়ঙ্কর গোলক-ধাঁধার ভেতর দিয়ে

তোমার কাছে, মাচু-পিক্‌চু।

ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া পাথরের ঢ্যাঙা শহর,
সবশেষে, মাটি তার রাতের জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখে নি
তার মোকাম।
তোমাতে দুটি সমান্তরাল রেখার মতন
বিদ্যুৎ আর মানুষের দোলনায়
দোল দিয়ে গিয়েছিল এক কণ্টকিত হাওয়া।

পাথর মা, কনডর[১]দের মুখের ফেনা।

মানবিক প্রত্যুষের উত্তুঙ্গ শৈলশিরা।
আদিমকালে বালুগর্ভে হারানো কুড়াল।

এই হল সেই আস্তানা, এই সেই স্থান :
এখানে উঠে এসেছিল ধাপে ধাপে ফসলের গোটা দানা
লাল শিলাবৃষ্টির মত নতুন ক'রে নেমে যাবার জন্যে।

---

১ দক্ষিণ আমেরিকার এই বিশাল শকুনের পাখার বিস্তার বারো ফুট।

এখানে ভিকুনা[১] মোচন করেছিল তার পশম
কবর, ভালবাসা, জননী,
রাজা, পূজাপ্রার্থনা, যোদ্ধা সবাইকে সজ্জিত করতে।

এখানে নিশাকালে মানুষের পা-সকল
ঈগলদের পা-সকলের পাশে বিশ্রাম করেছিল, তাদের তুঙ্গ
মাংসাশী বিবরে, আর রাত্রি প্রভাত হলে
পায়ের নিচে মাড়িয়েছিল ফিনফিনে কুয়াশা যার পাশে বজ্রের পায়ের
প্রান্তর আর প্রস্তর ছুঁয়ে
যতক্ষণ না তাদের জেনেছিল এসেছে রাত্রি অথবা মৃত্যু।
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি জোব্বাগুলো, আর হাতগুলো,
গমগমে গুম্ফায় জলের চিহ্ন,
দেয়াল মসৃণ হয়ে আছে একটি মুখের ছোঁয়ায়
যে মুখ আমার চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল পার্থিব বাতিগুলোর দিকে,
আমার হাত দিয়ে যে তেল সেচন করেছিল বিলীন হওয়া কাঠে :
হায় সব কিছু, পোশাক, ছাল, জালা,
কথা, মদ, রুটি
সব গত, সব ভূলুণ্ঠিত।
আর হাওয়া নারঙ্গি ফুলের আঙুল নিয়ে
বয়ে গিয়েছিল নিদ্রিতদের ওপর দিয়ে : একেকটা হাজার বছরের
হাওয়া, মাস-জোড়া, সপ্তাহ-জোড়া হাওয়া,
নীল প্রবল বাতাস, লৌহ পর্বতমালার,
পদক্ষেপের মৃদু ঝঙ্কার মত তা বয়ে গিয়েছিল
পাথরের নির্জন বাসস্থল ঘসে মেজে চকচকে ক'রে।

৭

একটি একক পাতালের প্রাচীন মৃত, একটি গিরিদরির ছায়াসমূহ,
এই গহীন টান তোমার মহত্বের পরিমাপ ;

১ উট পরিবারের মেষসদৃশ আলপাকা ধরনের বন্য প্রাণী।

যখন মৃত্যু এল, অখণ্ড, সর্বগ্রাসী,
তুমি কি নিচে ঝাঁপ দিয়েছিলে মর্মাহত পাথরগুলো থেকে.
লাল টকটকে রাজধানীগুলো থেকে,
আরোহী জলপ্রণালীগুলো থেকে
যেন কোনো এক শরতে,
এক একক মৃত্যুতে ?
আজ সেই কোল-খালি-করা বাতাস আর কাঁদে না,
তোমার মৃন্ময় পা দুটো আর চেনে না,
যখন বিদ্যুতের ছুরিতে বিদীর্ণ হত আকাশ
আর ঝড়ের দাপটে পড়া বিশাল গাছ
কুয়াশা এসে খেয়ে নিত,
তখন সেই আকাশকে ছেঁকে নিত তোমার যেসব কলস
বাতাস আজ তাদের ভুলে গেছে।

উঁচুতে তোলা হাত ঝপ্ ক'রে পড়ে গেছে
শিখর থেকে সময়ের অন্তিমে।
তোমার আব অস্তিত্ব নেই, উর্ণনাভ বাহু, ভঙ্গুর
তন্তু, জড়ানো-মড়ানো কাপড়, তুমি বলতে যা কিছু ছিল
সবই ধূলিসাৎ : আচারবিচার, জীর্ণ স্বরব্যঞ্জন,
আলোর ঝাঁক থেকে বাঁচার মুখোশ।

শুধু খাড়া আছে প্রস্তর আর শব্দের এই স্থায়িত্ব :
যারা জীবিত, যারা মৃত, যারা স্তব্ধ, তাদেব সকলের হাতে হাতে
উঁচু-করা
পানপাত্রের মত, এত এত মৃত্যু দিয়ে, প্রাচীর দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা
এই নগরী : এত এত জীবন থেকে উঠে আসা পাথরের পাঁপড়ি :
সুচিরকালের গোলাপ, বসবাসের জায়গা.
বরফ-জমাট উপনিবেশের এই আন্দেয়াসের প্রবাল দ্বীপ।

যখন মেটে রঙের হাত
মাটি হল, আর ছোট্ট ছোট্ট চোখের পাতা বুঁজে গেল,

ভর্তি হল কর্কশ প্রাকারে, ছেয়ে গেল প্রাসাদে,
আর যখন মানুষের সবটাই মুড়ে রাখা হল তার গর্তে,
হাতের সূক্ষ্ম কাজ থেকে গেল, আকাশে, পত পত ক'রে উড়তে লাগল :
মানুষের উদয়কালের সুমহৎ পীঠস্থান :
নৈঃশব্দ্য ধারণ করার সবচেয়ে উন্নতকায় আধার :
কত কত জীবনের পর একটি প্রস্তর জীবন।

৮

আমেরিকার ভালবাসা, আমার সঙ্গে ওঠো ওপরে।

আমার সঙ্গে এই গূঢ় প্রস্তরগুলো চুম্বন করো।

উরুবাম্বার ঝমঝম করা রুপো
তার পীত পেয়ালায় উড়ো পরাগকে টানে।
দ্রাক্ষার, শিলীভূত গুল্মের,
কঠিন মাল্যের শূন্যতা
পর্বতমালার চড-খেয়ে-চুপ-করা স্তব্ধতাব মাথার ওপর উঠে যায়।
এসো যৎসামান্য প্রাণ, মাটির দুই পাখার মাঝখানে.
আর, ওহে বুনো জল, স্বচ্ছ আর কনকনে,
আচ্ছামত-প্রহার-খাওয়া বাতাস, দুহাতে যোদ্ধবেশে পান্না ছড়াতে
ছড়াতে
তুষার থেকে নেমে এসো
ভালবাসা রে ভালবাসা, যে পর্যন্ত না ঝুপ্ ক'রে রাত্রি নামে,
আন্দেয়াসের অনুরণিত শৈলশিরা থেকে,
ঊষার রাঙানো জানুর অভিমুখে,
তুষারের অন্ধ তনয়কে ধ্যান করো।

ঝংকৃত তন্ত্রীর হে উইল্‌কামায়ু,
যখন তুমি তোমার রেখায়িত বজ্রকে ভেঙে ফেলো
আহত তুষারের মতন সাদা ফেনায়,

যখন তোমার কুটিল বায়ুঝড় গান গাইতে গাইতে
আর ধুনে দিতে দিতে আকাশকে চাগিয়ে তোলে
তখন তোমার আন্দোয়াসের ফেনা থেকে সদ্য উৎক্ষিপ্ত কানে
কোন্ ভাষা তুমি পৌঁছে দাও ?

কে হিমের বিজলিকে পাকড়াও করেছিল
আর শিখরগুলোর ওপর শিকলে বেঁধে তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল ?
তার বরফজমাট অশ্রু খণ্ড খণ্ড হয়ে,
তার দ্রুতবেগ বল্লমগুলো কাঁপতে কাঁপতে,
তার মারমুখো তন্তুগুলো আছড়াতে আছডাতে
চলে গেল যেখানে যোদ্ধার সমাধি.
ভয়ে চমকে উঠে যেখানে তার পাথুরে সমাপ্তি।

চারদিক থেকে ঘেরাও হওয়া তোমার প্রতিবিম্বগুলো কী বলে ?
গুপ্ত বিদ্রোহী তোমার বিদ্যুৎ রশ্মিগুলো আগে কখনও কি
কথার ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে ভ্রমণ করেছে ?
কে ভেঙে চুরমার করে হিমজমাট স্বরব্যঞ্জন.
প্রহেলিকার ভাষা, সোনার-বরণ কেতন।
গভীর মুখগহ্বর, চাপা চিৎকার,
তোমার ক্ষীণ নাড়ীর জলের মধ্যে ?

মাটি বেয়ে দেখতে আসা
ফুলের চোখের পাতায় কেটে কেটে চাবুকের ঘা বসায় কে ?
কে গড়িয়ে দেয় মৃত স্তবকগুলো
তোমার ঝর্নার মতন আছড়ে-পড়া হাত বেয়ে
যাতে তাদের রাতেব ফসলগুলো পেটাই হয়ে
তোমার ভূগর্ভের কয়লায় পরিণত হতে পারে ?

কে ছুঁড়ে দেয় শৃঙ্খলিত শাখা পাহাড়ের খাড়াইতে
কে আবার বিদায়গুলোকে কবরস্থ করে ?

ভালবাসা, রে ভালবাসা, সীমান্তরেখা যেন ছুঁয়ো না,
যেন পুজো ক'রো না নিমজ্জিত মাথা :
সময়কে পরিপূর্ণ করতে দাও তার উচ্চতা
তার শ্বাসরুদ্ধ বসন্তের মঞ্জিলে,
এদিকে বাঁধ আর ওদিকে খরস্রোত
মধ্যিখানে নিশ্বাসের বাতাস জুটিয়ে নাও স্রেফ পাহাড়ী পথ থেকে,
হাওয়ার সমান্তরাল পাতলা পর্দার ঘেরাটোপ থেকে,
গিরিশ্রেণীবিন্যাসের অন্ধ গলিপথ থেকে,
শিশিরের কটু গন্ধের কুর্নিশ থেকে,
আর চড়াই ভেঙে ওঠো, ফুল থেকে ফুলে নিবিড়তার ভেতর দিয়ে।
বিক্ষেপিত সাপ মাড়িয়ে।

গিরিশৃঙ্গ, শিলা আর অটবী,
রেণু রেণু সবুজ নক্ষত্র, ভাস্বর জঙ্গল —
এই মণ্ডলের মধ্যে যেন একটি জীবন্ত হ্রদ
অথবা আরও একটি নৈঃশব্দ্যের স্তরের মত
বিস্ফোরিত হয় মাস্তর।

এসো আমার ঐকান্তিক সত্তায়, আমার নিজস্ব প্রত্যূষে,
অভিষিক্ত নির্জনতা বরাবর।
মৃত রাজ্যপাট এখনও জীবন্ত।
এবং সূর্যঘড়ির আড়াআড়ি বিশাল শকুনের নির্দয় ছায়া
কালো জাহাজের মত টহল দিচ্ছে।

৯

দক্ষিণী ঈগল, কুহেলির দ্রাক্ষাক্ষেত।
হারানো বুরুজ, অন্ধচক্ষু শমশের।
তারকা মেখলা, নৈবেদ্যের রুটি।
মুষলধারা মই, অমেয় চোখের পাতা।
ত্রিকোণাকার আংরাখা, পাথরের পরাগ।

গ্রানাইটের প্রদীপ, পাথরের রুটি।
খনিজ সরীসৃপ, পাথরের গোলাপ।
জলমগ্ন জাহাজ, পাথরের ঢল।
চাঁদ-ঘোড়া, পাথরের আলো।
বিষুবীয় বর্গক্ষেত্র, পাথরের বাষ্প।
প্রান্তিক জ্যামিতি, পাথরের বই।
বাতাসে কুপিয়ে কাটা হিমশৈল।
নিমগ্ন সময়ের প্রবাল-প্রাচীর।
আঙুল দিয়ে মসৃণ দেয়াল।
পালকের ঝড়ে আক্রান্ত মাথার চাল।
প্রতিবিম্বিত গাছের ডাল, ঝড়ের ভিত্তিমূল।
পাতায় পাতায় জড়িয়ে ওল্টানো সিংহাসন।
নির্দয় নখরের রাজত্ব।
ঢালুতে নোঙর ফেলা বায়ুঝড়।
স্তব্ধগতি আশমানী রঙের জলপ্রপাত।
ঘুমকাতুরেদের পিতৃশাসিত ঘণ্টা।
পরাভূত তুষাব সমূহের শৃঙ্খল।
প্রস্তর মূর্তিতে হেলান-দেওয়া লৌহ।
অগম্য, অবরুদ্ধ ঝঞ্ঝা।
পুমা বেড়ালের হাত, বক্তপিপাসু শিলা।
ছায়াময় মিনার, তুষারময় আলাপ।
আঙুলে আর শিকড়ে উদ্ধৃত রাত্রি।
কুহেলির বাতায়ন, শিলীভূত বনকপোত।
নৈশ লতাগুল্ম. বজ্রের প্রস্তর মূর্তি।
অপরিহার্য গিরিশ্রেণীবিন্যাস, সামুদ্রিক ছাদ।
হৃত ঈগলদের স্থাপত্যশিল্প।
আকাশ-দড়ি, পাহাড়ী মধুমক্ষিকা।
রক্তমাখানো বিমান, বিনির্মিত নক্ষত্র।
খনিজ বুদ্বুদ, ফটিক চাঁদ।

আন্দেয়াসের সরীসৃপ. পারিজাত ভুরু।
নৈঃশব্দ্যের গম্বুজ, বিশুদ্ধ পিতৃভূমি।
সাগরের নববধূ, ক্যাথিড্রাল বৃক্ষ।
লবণ-শাখা, কৃষ্ণ-পক্ষ চেরী গাছ।
তুষারাবৃত দাঁত, হিম বজ্র।
নখরাহত চাঁদ, মারমুখী পাথর।
ঠাণ্ডা চুলের গুচ্ছ, বাতাসের ক্রিয়াকলাপ।
রজত ঢেউ, সময়ের নিশানা।

১০

পাথরের ওপর পাথর : মানুষ, কোথায় সে ছিল ?
বায়ুর ওপর বায়ু : মানুষ, কোথায় সে ছিল ?
সময়ের ওপর সময় : মানুষ, কোথায় সে ছিল ?
তুমিও কি তখন ছিলে, নিষ্পত্তিহীন মানুষের,
ফাঁপা ঈগলের ছোট্ট ভগ্নাংশ,
যা আজকের রাস্তা দিয়ে পায়ের চিহ্ন ফেলে,
মৃত শরতের পত্রাবলী নিয়ে
কবর অবধি আত্মাকে মাড়িয়ে চলে যায় ?
হায় রে হস্ত, পদ, হায় জীবন···
যার জট খোলা হয় নি সেই আলোর দিনগুলো
তোমার ওপর পড়েছে বৃষ্টির মতন
উৎসবের বান্দেরিলা[১]র ওপর, তারা কি
তাদের দুর্জ্ঞেয় খাবার একটির পর একটি পাঁপ্‌ড়ি ধ'রে ধ'রে
তোমার শূন্য হামুখের মধ্যে ফেলে দিয়েছে ?
ক্ষুধা, মানুষের প্রবাল,
ক্ষুধা, নিহিত গাছ, কাঠুরিয়ার বৃক্ষমূল,
হে ক্ষুধা, তোমার খাঁজকাটা শৈলশিরা কি
উঁচু উঁচু এইসব পড়ন্ত মিনার অবধি উঠেছিল ?

---

১ পতাকা লাগানো এই লৌহশলাকা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় ব্যবহার করা হয়।

সড়ক পরিবহণের লবণ, আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি,
আমাকে দেখাও চামচ, স্থাপত্যবিদ্যা, আমাকে একটা লাঠি দিয়ে
তোমার পাথরের পুংকেশরগুলো খাবলে নিতে দাও,
বায়ুমণ্ডলের সমস্ত ধাপ পেরিয়ে শূন্যতায় উঠে যেতে দাও,
তোমার অস্ত্র চাঁছতে চাঁছতে শেষ পর্যন্ত মানুষে পৌঁছুতে দাও।

মাচু পিকচু, তুমি কি পেতেছিলে
পাথরের ওপর পাথর, আর একেবারে গোড়ায়, একটা ছেঁড়া কাপড় ?
কয়লার ওপর কয়লা, আর সবার নিচে, এককোঁটা চোখের জল ?
সোনার ওপর আগুন, আর তার ভেতরে কম্পমান,
রক্তের লাল বৃষ্টিবিন্দু ?
যে ক্রীতদাসকে কবর দিয়েছিলে আমায় তাকে ফিরিয়ে দাও।
মাটির গলায় পা দিয়ে বার ক'রে আনো দুর্ভাগাদের
কষ্টার্জিত রুটি, আমাকে দেখাও
ভূমিদাসের পরনের কাপড় আর তার জানলা।
বেঁচে থাকতে সে কেমন ক'রে ঘুমোত আমাকে বলো।
আমাকে বলো তার তন্দ্রার মধ্যে ফ্যাঁসফেঁসে শব্দ হত কিনা,
অর্ধেক হাঁ ক'রে, যেন ক্লান্তিতে দেয়ালের গায়ে
একটা কালো ফুটো।
দেয়াল, সেই দেয়াল ! আমাকে বলো মেঝের প্রত্যেকটা পাথর
তার ঘুমের ওপর ভার চাপাত কিনা, আর তার নিচে সে পড়ে
থাকত কিনা,
যেন কোনো চাঁদের নিচে থাকার মতন, মৃত্যুতুল্য ঘুমে।
হে প্রাচীন আমেরিকা, হে নিমগ্ন নববধূ,
তোমার আঙুল ও অরণ্য থেকে উত্থিত হয়ে
দেবতাদের খাড়া শূন্যতার অভিমুখে,
আলো আর মহিমার মাঙ্গলিক ধ্বজার নিচে,
দামামা আর বর্শার বজ্রনিনাদে মিশে,
তোমার আঙুলও কি, যে আঙুল
তুলে এনে লাগিয়েছে নির্বস্তুক গোলাপ, রূপরেখান্বিত শীতলতা,

নতুন শস্যদানার রসের ছোপ লাগা বুক, যে পর্যন্ত
বিচ্ছুরিত পদার্থের উর্ণা, চিড়-ধরা পাথর,
তুমিও, নিমগ্ন আমেরিকা, তুমিও কি
অন্ত্রের অন্ততরতম তিক্ততায়, ঈগলের মত,
ধারণ করো ক্ষুধা ?

১১

ধোঁয়াটে জাঁকজমকের ভেতর দিয়ে,
পাথুরে রাত্রির ভেতর দিয়ে, আমাকে ঢোকাতে দাও আমার হাত
আর হাজার বছর ধ'রে বন্দী একটি পাখির মত
যে বিস্তৃত, তার প্রাচীন হৃৎপিণ্ড
আমার মধ্যে স্পন্দমান হোক।
আমি যেন ভুলে যাই আজ সাগরের চেয়েও উদার এই আনন্দ
কেননা, মানুষের বিস্তার সাগর আর তার দ্বীপপুঞ্জের চেয়েও বেশি,
আর মাটি খুঁড়ে নলকূপের মত তাকে বসাতে হয়,
ভূগর্ভ থেকে তবে উঠে আসে নিহিত জলের,
মগ্ন সত্যের একটি শাখা।
প্রশস্ত প্রস্তর, আমাকে ভুলে যেতে দাও তোমার শক্তিশালী অনুপাত,
তোমার সীমা-ছাড়ানো পরিমাপ, তোমার বহুছিদ্র পাথর,
আর আজ আমার হাত পিছ্‌লে গিয়ে পড়ুক জ্যামিতির বর্গক্ষেত্রে,
তার মর্মযাতনাকর রক্ত আর যমদণ্ডের অতিভুজে।
যখন, লাল গুব্‌রের পাখায় তৈরি ঘোড়ার নালের মত, প্রচণ্ড
রামশকুন[১] তার ওড়ার ছন্দে আমার বুকে ঘা দেয়
আর সেই গৃধ্নু পাখার ঝড়
ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায় কোনাকুনি সিঁড়ির থমথমে ধুলো,
আমি তখন দ্রুতগতি হিংস্র পাখিকে দেখি না,
দেখি না তার বক্রনখরের অন্ধ আবর্তন,
আমি দেখি পুরাকালের লোক, ভৃত্য, মাঠে

১ কনডর

ঘুমন্ত, আমি দেখি একটি শরীর, হাজারটা শরীর,
একজন মানুষ, হাজারটা নারী,
জলে আর রাত্রিতে বর্ণ কালি হওয়া, কালো হাওয়ার নিচে,
গুরুভার প্রস্তরমূর্তির পাশে :
হুয়ান শিল কাটা, উইরাকোচার বেটা,
হুয়ান পান্তা-খোর, শ্যাম তারার বেটা,
হুয়ান খালি-পা, নীলকান্তমণির নাতি,
ওঠো, আমার সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হও, ভাই !

১২
ওঠো, আমার সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হও, ভাই।

তোমার দূরবিক্ষিপ্ত দুঃখের গভীর অঞ্চল থেকে
আমাকে তোমার হাত দাও !
শিলাপুঞ্জের নিচে থেকে তুমি আর ফিরবে না।
মৃদ্‌গত সময় থেকে তুমি আব ফিরবে না।

তোমার প্রস্তরকঠিন কণ্ঠস্বর আর ফিরে আসবে না।
তোমার ভাসা ভাসা চোখ আর ফিরে আসবে না।

মাটির অন্তর্দেশ থেকে আমার দিকে তাকাও,
হেলে, তাঁতী, নির্বাক রাখাল :
সাথী গুয়ানাকোদের পোষ-মানানো বিষাদ :
বেপরোয়া ভারা বাঁধার রাজমজুর :
আন্দেয়াসের জল-চোখে ভিস্তিওয়ালা :
আঙুল ছেঁচে যাওয়া জহুরী :
বীজের মধ্যে বুক-দুরু-দুরু চাষী
ছড়ানো কাদামাটির মধ্যে তুমি কুমোর :
নতুন জীবনের এই পেয়ালায়
তোমাদের মাটি-দেওয়া পুরনো দুঃখশোকগুলো নিয়ে এসো।

আমাকে দেখাও তোমাদের রক্ত আর জরাচিহ্ন,
আমাকে বলো : এইখানে আমাকে সাজা দেওয়া হয়েছিল,
কেননা জহরতের চেতনাই ফোটে নি অথবা জমি থেকে
ঠিক সময়ে জহরত অথবা জমির ফসল মেলে নি,
আমাকে দেখিয়ে দাও ঠিক কোন্ পাথরটার ওপর তুমি পড়ে
গিয়েছিলে :
আর কোন্ বনে তোমাকে ক্রুশকাঠে গেঁথে মারা হয়েছিল,
আমাকে তুমি আবার জেলে দাও সেকেলে চকমকি,
পুরনো হাতবাতি, হাঁ-হওয়া ক্ষতমুখে
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এঁটে বসা চাবুকগুলো,
আর জেল্লাদার রক্তাক্ত কুঠারগুলো।
আমি এসেছি তোমাদের মৃত মুখের ভেতর দিয়ে কথা বলতে।
মাটির এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো
সমস্ত বিক্ষিপ্ত নির্বাক ওষ্ঠাধর জোড়া দাও
আর আমাকে নিচে থেকে বলো, সারাটা রাত ধ'রে,
যেন আমি তোমাদের মধ্যে নোঙরে বাঁধা রয়েছি,
আমাকে সব কিছু বলো, একটার পর একটা শেকল ধ'রে ধ'রে,
শেকলের গাঁটগুলো ধ'রে ধ'রে, ধাপের পর ধাপ,
তোমাদের রাখা ছুরিগুলোতে ধার দাও,
আমার বুকে, আমার হাতে স্থাপন করো,
যেন হলুদ আলোর অনেক ছটার একটি নদী,
যেন মাটি চাপা পড়া বহু বাঘের একটি নদী
আর আমাকে কেঁদে ভাসাতে দাও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন,
বছরের পর বছর,
অন্ধ যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

দাও আমাকে নৈঃশব্দ্য, জল, আশা।

দাও আমাকে সংগ্রাম, লৌহ, আগ্নেয়গিরি।

দেহগুলো, আমাকে আঁকড়ে থাকো, চুম্বকের মত।

আশ্রয় নাও আমার ধমনীতে আর আমার মুখগহ্বরে।

কথা বলো আমার শব্দাবলী আর আমার রক্তের ভেতর দিয়ে॥

রমণীদেহ

রমণীর দেহকায়, ধবল পাহাড়, শ্বেত উরু,
পৃথিবীসদৃশ তুমি, শুয়ে আত্মদানের ভঙ্গিতে।
তোমাতে কর্ষণ করছে বন্য চাষী আমার শরীর
মাটির গভীর থেকে যাতে লাফ দিয়ে ওঠে শিশু।

কোটরের মত একা ফেলে রেখে পালাত পাখিরা।
আমাকে ভাসাত রাত্রি, আক্রমণে মাড়াত দুপায়ে,
বাঁচাতে নিজেকে শেষে অস্ত্র ক'রে তুলেছি তোমাকে
আমার ধনুকে তুমি বাণ আর কোদণ্ডে বর্তুল।

ঘনাল প্রহর, নেব শোধবোধ, প্রেয়সী আমার।
দামের, চর্মের দেহ, ব্যগ্র দৃঢ় দুগ্ধের শরীর
ও বুকের পানপাত্র! ও অবর্তমানতার চোখ!
ও গোলাপ জঘনের! কণ্ঠস্বর মৃদু ও ব্যথিত।

হে আমার নারীদেহ, আছি লগ্ন অনুগ্রহ পেলে
অসীম পিপাসা, ইচ্ছা; দ্বিধাদীর্ণ আমার এ পথ।
অন্ধকার নদীখাতে চিরন্তন তৃষা যায় বয়ে
অতঃপর নামে ক্লান্তি, সঙ্গে আনে অন্তহীন ব্যথা॥

মাটির স্বর্গে

শুচিশুভ্র একটি মেয়ের পাশে আজকে শুয়ে ছিলাম
যেন ধবল পারাবারের সংলগ্ন বেলাভূমিতে,
জলন্ত এক নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলে
মন্থর ঠাঁই।

দীর্ঘায়িত সবুজ তার চাহনি থেকে
ঝরে পড়েছে আলো শুক্‌নো জলের মতন,
তরুণ তাজা প্রাণশক্তির স্বচ্ছ এবং
গভীর বৃন্তে।

তার বক্ষ হুবহু দুই শিখার আগুন
উত্তোলিত দুই এলাকায় প্রজ্বলিত,
বুকে দ্বিগুণ নদীর নাগাল উদার অবাধ
পায়ের পাতায়।

জলে হাওয়ায় ধরাচ্ছে রং, পাকাচ্ছে রস
সারা অঙ্গে তার আহ্নিক দ্রাঘিমারেখা
ভরিয়ে দেয় দূরপ্রসারী ফল এবং
জাদুর আগুন॥

ওলঝাস স্লেমেনভ-এর

রোগা ঈগল

অনুবাদকের কথা

ওলঝাস সুলেমেনভের সঙ্গে আমার গত বছর প্রথম আলাপ। মস্কোয়। সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের একজন কর্মকর্তা মারিয়াম সালগানিকের কাছে আগেই ওলঝাসের লেখার প্রশংসা শুনেছিলাম। কিন্তু ওর লেখার ইংরেজি অনুবাদ পেয়েছি অনেক পরে। কবিতারও আগে আমার দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল মানুষটাকে। গলা ফাটিয়ে হাসে, ধারালো বুদ্ধি, সূক্ষ্ম রসবোধ, সেইসঙ্গে অসম্ভব ফুর্তিবাজ।

এরপর আলমাআতায় সম্মেলনের সময় দেখলাম ওলঝাসের অন্য চেহারা। রাতের পর রাত ঘুমোয় নি। এক ফোঁটা মদ ছোঁয় নি। অক্লান্তভাবে খেটে গেছে।

অল্প কিছুদিন আগে মারিয়াম আমাকে ওলঝাসের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-গুলো পাঠিয়ে দেন। প'ড়ে আমার এত ভাল লাগে যে, তখনই তর্জমা করতে ব'সে যাই। অনুবাদগুলো যদি পাঠকদের ভাল লাগে তাহলে বুঝব আমার ভাল লাগা সার্থক হয়েছে।

অনুবাদকের একটা দুটো অসুবিধার কথা শুধু জানিয়ে রাখি। ইংরেজি প'ড়ে মনে হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় বোধহয় ভাবের ঠিক সুষ্ঠু প্রকাশ হয় নি। স্থান কিংবা ব্যক্তির নামেও অনুবাদকের অজ্ঞতাজনিত কিছু কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। এরপর সুযোগ পেলেই এইসব ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করব।

ব্রজকিশোর মণ্ডলের উৎসাহ না পেলে এ বাজারে এ বই বার হত কিনা সন্দেহ! সুতরাং তাঁকে ধন্যবাদ না দিলে অকৃতজ্ঞতা হবে।

৩।৯।৭৪ সু. মু.

কবির নিজের কথা

আমার নাম ওলঝাস ওমর-উলি স্থলেমেনভ।

কাজাখ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী আলমা-আতায় ১৯৩৬ সালে আমার জন্ম।

পিতা : ওমর। অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার ছিলেন। আমার জন্মের মাত্র কয়েকদিন আগে বাবা মারা যান।

মা : ফতিমা। কয়েক বছর পরে তিনি নাম-করা কাজাখ সাংবাদিক আবুদ আলিকে বিবাহ করেন। আমি তাঁর কাছেই মানুষ।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ ক'রে বেরিয়ে আমি কাজাখ রাষ্ট্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হই। পড়া শেষ করে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি তেল আর গ্যাস সংক্রান্ত অনুসন্ধানের কাজে ঢুকি। ভূতাত্ত্বিক হিসেবে আমি বেশ কয়েক বছর কাজ করি। ছাত্রাবস্থায় স্থানীয় পত্রপত্রিকায় মাঝেমধ্যে লিখেছি। পরে মস্কোতে গিয়ে সাহিত্যে তালিম নেওয়ার একটা স্থযোগ জুটে গেল। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস তো আমার আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল, মস্কোতে গিয়ে পড়াশুনো করবার সময় আমি চেষ্টা করলাম মানুষজাতির কী ইতিহাস তা জানতে।

আমি প্রথম যে কবিতাগুলো লিখি তার ভেতর দিয়ে আমি বুঝতে চেষ্টা করি কাজাখ জাতির অতীত ইতিহাস। কাজাখরা হল তুর্কীদের থেকে উদ্ভূত শেষ যাযাবরের জাত। তারা বরাবর থেকেছে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মাঝখানে। আমাদের সাবেকী আর আধুনিক সংস্কৃতিতে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ত্রিশঙ্কু অবস্থার ছাপ মিলবে। প্রাচীন তুর্কীদের গোঁড়ামি, বৌদ্ধদের ধ্যানশীলতা, মুসলমানদের নৈর্ব্যক্তিকতা আর ইউরোপীয়দের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা—এ সমস্তই আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত।

আমি ইতিহাসপ্রেমিক। প্রাচীনদের ইতিহাসের মধ্যে আমি সেই অস্তি-বাচক উৎস খুঁজছি যা মহাফেজখানায় নথীপত্রের মধ্যে ধ'রে রাখা হয় নি, কিন্তু যে উৎস ছাড়া একই মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের সমসাময়িক আর ভাবী-কালের সম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

অলিখিত ইতিবৃত্ত, লুপ্ত ইতিকথা আর কাব্য, মুখের অনুক্ত কথাবার্তা আমাকে বিচলিত করে। ভাষা দেবার জন্যে আমি অতীতের মধ্যে আজ সেইসব হারানো জিনিস খুঁজি; তাই নিয়ে আমি লিখি।

কাজাখ কবিকে আজ একজন গবেষণাকর্মীও হতে হবে। কেননা সবশেষের উটকে সবচেয়ে বেশি ভার বহন করতে হয়; যে যাত্রীদল এগিয়ে গেছে, তাদের ফেলে-যাওয়া সামগ্রী চেপে বসেছে তার পিঠে।

আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেককে তার নিজের যুগে এমন অসম্ভব সক্রিয়ভাবে এমন প্রচণ্ড গতিশীল হয়ে বাঁচতে হয়, যেন তার কাছে সেটাই হল অন্তিম যুগ। আমাদের নির্বিকার পূর্বপুরুষেরা সময়াভাবে অথবা ক্ষমতার অভাবে যেসব সত্য উপলব্ধি করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি, আমরা সচেতনভাবে তার দায় নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিই। কাজেই আমরা এমন সব জিনিস নিয়ে আমাদের সময় কাটাই যা একেবারেই অনাবশ্যক বলে মনে হতে পারে—আমরা স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ার রুনের অর্থোদ্ধার করি ইট্রারিয়ার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করি, সুমেরের পুরাতত্ত্বের গভীরে ডুব দিই, মহেঞ্জোদারোর দুর্বোধ্য লিপি পড়বার চেষ্টা করি। কে কত লাইন লিখল তার সংখ্যা দিয়ে কোনো কবির কাজ যাচাই করা যায় না —বরং তার কাজ তাকে কতটা তৃপ্তি দিয়েছে তাই দিয়ে তার কাজের বিচার হবে। যে কাজই তার করতে ইচ্ছে হবে, সেই কাজেই তার উচিত নিজেকে লাগানো।

কারণ, সংস্কৃতি হল সেই সমস্ত কিছু যা আগ্রহ জাগায়। আর পরিণামে কী হল সেটাই আমরা দেখব। যেমন কাব্য, তেমনি অন্য যে কোনো শিল্পরূপ সম্পর্কে এ কথা সত্য। একটি বিষয়, একটি বুনট, একটি ভাব—কোনো কিছুর মধ্যেই কবিকে ঠেসে দেওয়া যায় না। ছোট ছোট সহস্র সহস্র বিষয়, বুনট, সহস্র ভাবের ভেতর দিয়ে কবি তার নিজের রাস্তা ক'রে নেবে।

দশ বছরেরও বেশি আমি ইতিহাস আর ভাষাতত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন করছি। ইগোর সম্পর্কিত প্রাচীন রুশ মহাকাব্য আর প্রাচীন তুর্কী অক্ষরের উৎস—এই নিয়ে আমার অনেক রচনা আছে। স্লাভ ভাষাসমূহে ব্যবহৃত তুর্কী শব্দের ব্যুৎপত্তি সংবলিত একটি অভিধানের জন্যে এখন আমি মালমশলা সংগ্রহ করছি।

১৯৬১ সালে আমার প্রথম দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয় 'আরঘামাকৃস আর পৃথিবী', 'মানুষকে প্রণাম'।

যুক্তরাষ্ট্র আর পারী থেকে ঘুরে এসে 'রাতের নিবাস পারী' বইটি লিখি।

তারপর ক্রমে ক্রমে বার হয় 'সূর্যোদয়ের শুভক্ষণ', 'বাঁদুরে বছর', 'মাটির কেতাব' ইত্যাদি।

মাঝে ফিল্ম নিয়ে খুব মেতে উঠেছিলাম। কাজাখ ফিল্ম স্টুডিওতে মুখ্য সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছি এবং বেশ কয়েকটা ছবিও তৈরি করেছি—কিছু কাহিনীচিত্র আর কিছু আবেগময় তথ্যচিত্র।

এখন আমি কাজাখস্থান লেখক সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির সম্পাদক এবং আফ্রো-এশীয়দের সঙ্গে সংযোগকারী কাজাখ সংস্থার সভাপতি। বেশ কিছু সাহিত্যিক পুরস্কার পেয়েছি—তার মধ্যে কাজাখস্থান কমসোমল, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার।

মারিয়াম সালগানিক-কে

মা

যদি মানুষ হোস, দুনিয়ায় নাম রেখে যাস
আর হয়ত সেই নামে
লোকে তোর স্বজাতিকে চিনবে—
কালের খরস্রোতে চিরদিন মাথা নোয়ানো
বেতসের মতন
চিরকনিষ্ঠ চিরদুঃখী সে।
সফর মানেই দূরদেশে পাড়ি দেওয়া,
খাটুনি মানেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা,
তোর ব্যাকুল মুখে আমি গুঁজে দিচ্ছি
আমার ভরে-ওঠা স্তন,
তোর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি আমার দুধ—
তুই বড় হ।
দুনিয়ায় তুই নিজের নাম রাখ্‌।
কেমন করে, সে আমি জানি না,
আমি বলে দেব না কোনো উপায়।
তোর জন্যে
কোনো ঘুমপাড়ানী গান আমি গাইব না।
লড়াইতে
তোর লাগবে আমার শক্তি,
মৃত্যু যখন উটের মত দাঁত বার ক'রে
তোর চোখে থুথু ছিটোবে
যখন এক ফোঁটা অশ্রুর মত
ঘাসের ওপর ঢলে পড়বে তোর বন্ধু,
যখন সমস্ত রাস্তা তোকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে,
তখন আমার বলতে ইচ্ছে হবে :
'বাছা আমার, মাথা উঁচু করো,
এখন তুমি কত বড়।

গুলির সামনে দাঁড়াও—
লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখুক।'

একবার তোকে একবার আমাকে দেখিয়ে
কত অনায়াসে বলতে পারবে :
'এই সাদাসিধে ছোকরাটি দেখছ—
ও সত্যিকার একজন মানুষ,
এই সাদাসিধে মহিলাটি দেখছ—
উনি ওর মা।'
সব রাস্তাই বন্ধ—কোথায় পরিত্রাণ ?
বিপদের দিনে বাঁচার উপায় হল
তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় হওয়া।
কিন্তু যখন উপত্যকার ওপর দিয়ে
সাঁই সাঁই করছে না বুলেট,
সময় যখন হামাগুড়ি দিয়ে চলছে
আর বয়স যখন তীরবেগে ছুটছে না,
লোকে যখন নাচছে গাইছে, যখন কাঁদছে না,
হাসিতে যখন অশ্রু থাকছে না,
কুমারীর দল যখন র'য়ে ব'সে
চুল বাঁধতে পারছে,
যখন ভয়কাতুরে ছোকরার দল
মুখে খুব রাজাউজীর মারছে,
তখন, বাছা আমার, তুই মুখ লুকিয়ে
চোখের আড়ালে চলে যাস ॥

কুরগালজিনো হ্রদে

অগস্টের তুমুল হৈ চৈ
কুরগালজিনো হ্রদে—
আফ্রিকার সূর্য কী এক রহস্যে
জ্বলে উঠেছে
পাখিদের মনে।
ওরা যাবে, কিছুতেই ধ'রে রাখা যাবে না,
আপন নীড়গুলোর মাথায় চক্কর দিয়ে
রাজহংসেরা ঝাঁকের পর ঝাঁক বেঁধে
দূর দূর দেশে উড়ে যাবে।
ও সাদা হাঁস.
ওরে ও অভাগা হাঁস,
আমরা তোমাদের যেতে দেব না,
তোমাদের গতিরোধ করবে
প্রিয় প্রান্তর আর ঝোপঝাড়,
বিষণ্ণতার ফাঁদ-পাতা লূতাতন্তু।
তোমাদের জন্মভূমি তোমাদের ধরে রাখবে,
ছোট ছোট কয়েকটা ছর্‌রায়
তোমাদের ফিরিয়ে আনবে।
শরতের ভারে
বাগানের ডালগুলো ভেঙে পড়ছে।
গুলিবিদ্ধ একটি হাঁস
একটা ডোবার মধ্যে ছটফট করছে।
মন কোনো চাঞ্চল্যকর খবর নয়—
ফ্লেমিঙ্গো নয়, পেলিকান নয়,
লোকসান সামান্য
—তিন কিলো ওজনের
এক মামুলী রাজহাঁস।
'গুলি ক'রে মারা হয়েছে—তো হয়েছে কী ?

এ নিয়ে তোমার কবিতা লেখার
কী হল ?
একটি তো ভারি রাজহাঁস, একশো নয় দুশো নয়
আর দেখ, কবিতাও কিছু থানার ডায়রি নয়।
তুমি সুন্দর ক'রে ওর জড়ুলগুলোর কথা
ছোট ছোট ছর্‌রা-বেঁধা
দাগগুলোর কথা বলতে পারো,
বলতে পারো এই হ্রদ—তার এই জন্মভূমির কথা'
যে খুন করে,
ধিক্ সেই জন্মভূমিকে।
এখন শরৎকাল।
ঝ'রে পড়ছে প্রথম তুষার
—ওর ধবধবে, ভয়ঙ্কর পালক।

ও আমাদের এনে দিত বসন্ত,
চলো ওকে পায়ে ধ'রে বলি
যেতে। কিন্তু সব নিষ্ফল।
শরৎ ওকে ধ'রে রাখবে॥

রাতের বিমানে

আমি মিলিয়ে যাচ্ছি আকাশে,
পাখার নিচে রাতের অন্ধকারে কত যে শহরের পর শহর।
আগুনের মধ্যে প'ড়ে জল হয়ে যাওয়া তুষারকণার মত
মাটির গায়ে আলোগুলো গলে যাচ্ছে
মিলিয়ে যাওয়া বছরগুলোর মত
রাত্রে প্যারীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি—
আগুন, সেই একই গেরুয়া রঙের আগুন !...

জানলায় মুখ লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছি
সমস্তই আমার কত চেনা
ঘোড়ার ঘুঁটে-জ্বালানো স্তেপের আগুনের মত
বিদেশী বন্দরে বহ্নিমান সব শহর।
পৃথিবীকে আবৃত করা এই রাত্রি দেখছি খুব খারাপ নয়।
আলোগুলো পিট পিট করছে,
রাডারগুলো যেন ক্ষেপে উঠেছে,
এরা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে
রাস্তা পরিষ্কার।
রাতের চোখে সুর্মার রং।
নিচের ঘাস অন্ধকারে ভাসছে।
জ্বলন্ত আগুন। আর চাঁদ। আর ঘোড়ার দল টান টান হয়ে আছে·
কখন উঠবে গগনভেদী চিৎকার—আলি! আলি। আলি!

আমি সব কিছুর ওপর দিয়ে চলেছি।
যেন ব'সে আছি এক তারাঘরে।
আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে, তাদের আর কিছুই লুকোবার নেই।
মেয়েরা তাদের পা ঢেকে
বাতির আলোয় আমার গল্প পড়ছে।
জীবনের সব কিছুই যেন গুরুত্ব না পায়।
আলোগুলো। সারা রাস্তাই আলোগুলো চুপচাপ থাকছে।
প্লেনের জানলা কুয়াশায় ভেজা।
আলোর ঝাড়গুলো একে একে
ভেসে উঠে তারপর সব একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে॥

পাঞ্জা

আফ্রিকার আর এশিয়ার সমস্ত গোরস্থানেই তুমি দেখবে
কবরে কবরে মানুষের হাতের পাঁচ আঙুলের ছাপ।

তোমরা, যারা বেঁচে আছো,
অবমানিতদের দয়ার্দ্র হৃদয়ের কথা
প্রমাণ ক'রে দেখাও।
ধুলিকীর্ণ সমাধিস্থলে খাড়া করা
যেমন তেমন ক'রে কাটা রুক্ষ পাথর।
পাঞ্জা।
পাঁচটি ছড়ানো আঙুলের অবয়বে
সেই কোন্ কবেকার এক ইশারা—
তোমরা ভুলে গেছ, তোমাদের মনে করতে হবে।
শিশুদের হাতের আঙুল আমি দেখতে পাই
পাথরের গায়ে
ক্রুশবিদ্ধ।
তোমরা, যারা বেঁচে আছ,
ভুলে যেও না
যারা আজ নেই—
পাগানিনির বিদ্যুতের কশা,
উড়োজাহাজের পাঁচটা আঙুল।
আমি আমার গলায়
কবচের মত
ঝোলাব
নিঃশব্দে ডুবে যাওয়া রমণীদের
আঁকড়ে-ধরা আঙুল।
যারা মিথ্যে, নাটুকে বক্তৃতা দিতে চায় তারা দিক।
আমি কাটিয়ে দেব আমার জীবন—
সব সময়, ছোট্ট সংক্ষিপ্ত—

হাতের আঙুলগুলো মুঠো ক'রে।
আমার মৃত্যুর পর
আমার বুড়ি মা পাথরের ওপর খোদাই ক'রে দেখে
একটা খোলা মুঠো
আমার ডান হাতের ॥

বৃষ্টি—এরোপ্লেন থেকে

হয়ত সমুদ্রের ওপর এখন বৃষ্টি,
কিন্তু নিচে শুধুই দুর্ভাগা হলুদে মাটি
কাশ্যপের এক আধভর্তি তিক্ত কলস
বসুমতীর তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে
জং-ধরা ঊষর মেঘ,
যেন অপার্থিব তৃষ্ণার বিস্ফোট,
ছোরাবিদ্ধ সূর্যাস্তের ঢেউ,
মজা ক'রে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, আমাকে অনুসরণ করছে।
কানা বৃষ্টি হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে
মৃত্তিকার সমুদ্রের সামনে—
অপরাধী, দুর্বল আর বুড়ো বর
তরুণী অনাদৃত পৃথিবীর ॥

এক অন্ধ দর্শক

একবার এক অন্ধকে আমি দেখেছিলাম
লুভ্‌র-এর চিত্রশালায়।
একা, কেউ তার সঙ্গে নেই,
  নিঃশব্দে
সে তার চক্ষুহীন কোটরে একদৃষ্টে চেয়েছিল
ভেনাসের ছবির দিকে।
নিগ্রোরা এমনি ক'রে
          অন্ধকারের দিকে তাকায়।
ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ! হলের ঝকঝকে মেঝেতে জুতোর মশমশানি।
অন্ধ লোকটি একটি বিরাট বাঁধানো
      ফ্রেমের সামনে দাঁড়াল।
যে ক'রেই হোক, সে ঠিক দেখতে পাচ্ছিল।
      চোখের খোদলের ভেতর দিয়ে?
নাকি তার মুখমণ্ডল দিয়ে?
অনেকখানিই অনুমান—
সে দেখছিল তার চোখ দিয়ে।
এক ছবি থেকে অন্য ছবি, এমনি ক'রে দেখতে দেখতে সে হেঁটে যাচ্ছিল।
যেন কোনো বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে,
ক্রমশ আস্তে,
আরো আস্তে···

তারপর থেমে গেল।
এবার সে মুগ্ধচোখে দাঁড়িয়ে প'ড়ে
      আর যেন কিছুতেই নড়তে চাইছে না—

তার সামনে ফাঁকা দেয়ালে
এখন শুধু একটা ছবির শূন্য নীড়॥

বলো দেখি···

বলো দেখি···
আকাশে মানুষ কেন হাত বাড়ায় ?
বাজপাখিরা মাথা চুলকে ভাবে,
পাখিদের বাহবা দেবার জন্যে নয়ত ?
মানুষ তার সৃষ্টি-করা
সৌন্দর্যকে
কেন বলে 'মহান', 'মহিমান্বিত' ?
নদী যায় গড়িয়ে গড়িয়ে
আর সমতলকে স্তন্যপান করায়,
নদীর উপত্যকায়
শহরগুলো মাথা তোলে।
নদীর নীল নীল ধমনীতে মোড়া
এক বিশাল হৃদ্‌যন্ত্র
এই পৃথিবী উড়ে চলে।
গতকালের কুহেলিতে ঢাকা নক্ষত্রের দিকে এঁকে বেঁকে যাবে
এমন পথ তৈরি করা শক্ত
কিন্তু তার চেয়েও কঠিন
এই ভূমণ্ডলে এমন কোনো রাস্তা বার করা
যা চিরকাল ধ'রে ঘটাবে শহবের সঙ্গে শহরের মেলবন্ধন,
নদীব মতন পেরিয়ে যাবে দেশ,
সূর্যের রশ্মির মতন এফোঁড়-ওফোঁড় করবে অন্ধকার,
বিগত বছরগুলোকে পাইয়ে দেবে মুঠোর মধ্যে।
হৃদয়ের রাস্তা
তোমাকে পৌঁছে দিয়েছিল নক্ষত্রে।
কঠিন খুব,
তবু তোমাকে পেতেই হবে সেই রাস্তা,
কেননা মাটির এই রাস্তা
আজকের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর কাছে তোমাকে পৌঁছে দেবে·

প্রচণ্ড গরমে

আপেল গাছ। ধুলো জমেছে পাতায়।
তলায় তার দেখ, দুধারে ছড়িয়ে দুই বাহু
কী অপরূপ রমণী এক অঘোরে ঘুম যায়
কাছেই নদী। শোনা যাচ্ছে জলের কুলু কুলু!
লুটানো ফুলে গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে মৌমাছি।
বুকের ওপর দোল খাচ্ছে রোদ।

চলেছিলাম ঘোড়ায় চড়ে নদীর ধার দিয়ে।
কী অপরূপ রমণী এক! মাটিতে লোটে বেণী!
লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে তাকায় বুড়ো ঘোড়া।
আঙুল দিয়ে দেখায় রোদ
ছড়ানো তার দুপাশে দুই বাহু॥

তিন সেলাম

হে অতীতের কবিসকল,
আমার মনে পড়ছে না তোমাদের,
কিন্তু এক প্রাচীন তববারির গায়ে
কিংবা কালের কলঙ্ক-পড়া এক সুরাইয়ের
নিপুণ গ্রীবায়
এক ব্রহ্মস্বাদসহোদর মিল এনে দেবার জন্যে
শহর আর গ্রাম আমি তোলপাড় করব।
আমি পাঠোদ্ধার করব অপরিচিত লিপির।
জ্বলজ্বল করো দোহাই,
হে চাঁদ,

আর মাথার ওপর আলোকিত করো কাব্য—
নিকষ কালো পটে,
ছায়াপথের ছত্রে ছত্রে এক আগ্নেয় ভস্ম।
মানবজাতির উষাকাল না গোধূলি ?
আমার বয়ঃক্রম দিন আর প্রহরে
দীর্ণবিদীর্ণ।
কিন্তু একটি মুহূর্ত হতে পারে
একটি শতাব্দীর সমতুল্য,
যখন তুলাদণ্ড সুদূর অন্তরীক্ষে আরোহণ করে।
তোমরা তাদের দেখেছ বহুভাবে চিহ্নিত করতে :
একটি ঘণ্টা,
কিংবা তার জায়গায়, হয়ত, একটি স্তম্ভ।
যেমন দুঃখের,
তেমনি আনন্দোৎসবের
এটি একটি অভিজ্ঞান।
আবারও তোমরা দেখবে
মাথার ওপর উঠতে।
পৃথিবী,
আমি তোমাদের দেখেছি অমন সৌন্দর্যে নিজেদের আবৃত করতে
পৃথিবী, যার ভার কত আমি কিছুই জানি না,
কোনো দেশবাসীকে আমি কখনও ক্ষুণ্ণ করি নি,
আমি সুখী,
যতদিন এখানে আমার প্রয়োজন থাকবে ॥

আমি জেগে আছি

দাদা, তুমি শান্তিতে ঘুমোও। আব্বাজান, ঘুমোও।
আমি জেগে আছি।
ছেলেমেয়েরা সগর্বে
আমার কথাগুলো হাঁ ক'রে গেলে।
আকাশে ভেসে থাকা
কিংবা পাথরের গা বেয়ে
ঝর্ণার মত আছড়ে পড়ার মধ্যে কোনো তফাত নেই।
আমি দেখেছি সুখের মুখ—সব কিছুই আমার প্রিয়।
তোমরা কি চেয়েছিলে আমি সুখের মুখ দেখি ?
রাত্রে আমি ভয়ের ভেতর দিয়ে হাঁটি,
আমি হাঁটি পাকদণ্ডীর রাস্তায়,
আমার হাতদুটো গোঁজা থাকে অন্ধকারে।
আমার মাথা ঠিক্‌রে থাকে কুঁজের মত।
কিছু একটা আমাকে বিচলিত করে—
অবশ্যই আমি জানি এই তৃণভূমির শেষ নেই।
তবু কী একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা !
হায়, এই পাহাড়গুলোর
অজানা আশঙ্কাব ব্যাপারটা নিয়ে কী জ্বালাতেই না আমি পড়েছি

মণ্ডলাকার নক্ষত্র

স্তেপভূমির নিটোল সমতলের নিচে
তেরছাভাবে কেটে বার করা হয় স্তূপাকার খনিজ
ধনুকের ওপর
উঁচিয়ে থাকা মাথার মতন,
বিচিত্র রকমের দৃষ্টিকোণে ভাঙা
কবিতার মতন—

স্তেপভূমির নির্লিপ্ততার ওপর দিয়ে
উত্তোলিত হয় অশান্ত খনিজ।
সবচেয়ে যা মূল্যবান, তার কথায়
কণ্ঠ রুদ্ধ হয় এমনি ক'রে।
দূরের জিনিসগুলো আমাদের ভাঙচি দিয়ে নিয়ে যায়।
কাছের জিনিসগুলো
মণ্ডলাকার।
কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের নীল নক্ষত্রগুলো
কোণাকুণি।
নক্ষত্র থেকে আমাদের রক্ষা করে
ছাদ,
আমরা কিন্তু তাব আস্তর ফুঁড়ে
বেরিয়ে যাই।
অনুপ্রাণিত পাহাড়গুলোর মাথায়
বিবর্ণ হয়ে গেছে
চাঁদের বিষণ্ণ বলয়।
মেঘের খাড়াইগুলোতে
চিহ্নিত হয়
বিদ্যুতের উত্থান আর পতন।
আর রামধনুও, জেনো, ধনুক নয়—
সম্ভবপর যেকোনো কোণের চেয়ে
তা ঢের বেশি তীক্ষ্ণ।
বলা হয় আমরা নাকি আজ যা ধরি কাল তা ছাড়ি—
কিন্তু ভালবাসাকে আমবা একবার যে ধরেছি
কিছুতেই আর ছাড়া নয়।
আমরা উড়ে যাই যেখানে যাবার। আমরা ঠিক পৌঁছে যাই।
আর আমাদের সঙ্গে দেখা হয়—
এক উপত্যকার। এক প্রান্তরের। এক কর্ষিত ভূমির।
সারবন্দী পাহাড়ের অসমান উচ্চতার, সিন্ধুশকুনের আঁকাবাঁকা পথরেখার
একটি সহজসরল মণ্ডলাকার নক্ষত্রের॥

রোগা ঈগল

মোটাসোটা ঈগলগুলো বুকে ভর দিয়ে হাঁটছে মাঠে,
রোগাপটকা ঈগলগুলো মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।
ঈগলের ধারণায়, সবাই হচ্ছে ঈগল,
সকলের স্বভাবচরিত্রই একরকমের ব'লে তার সন্দেহ।
পাহাড়ী জাতের ইঁদুর দেখে সে ছোঁ মারে,
ভাবে বুঝি সেটাও একটা ঈগল।
তারপর গপাগপ খেয়ে ফেলে মনে মনে বলে—
হাঁ গো, কিঞ্চিৎ তেতো না!
মনিষ্যিরা অবিশ্যি বলতে ছাড়ে না যে, ঈগলে পেড়ে ফেলতে পারে
একটা ভেড়ার ছানা,
একটা ভেড়া,
একটা ছাগল।
ঈগল কখনও জন্মেও নিজের ছায়া দেখতে পায় নি,
তার শিকার দেখতে পায় তার অগ্নিময় ছায়া।
ঈগলের যে কায়া সেই তার ছায়া,
আর সে নিজেই হল ছায়ার অপচ্ছায়া।
ভারী ঈগলেরা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে
আর মাটির ওপর
ঘন সবুজ আর কাঁচা সোনার রঙে
ঘাসগুলোকে অবিচলিত রেখে,
ঘাসগুলোকে অক্ষত রেখে
রোগাপটকা ঈগলেরা তোমাদের পাহাড়তলীর
গোল সমতলের ওপর দিয়ে
কোণ বরাবর উড়ে যাচ্ছে।
ঈগলেরা তো যাবেই।
হলদে আর সবুজ তো থাকবেই।
তৃণময় নিষ্পাদপ ধু ধু করা প্রান্তর হল সেই পাহাড়
যেখানে শিখর নেই, ফাটল নেই

বুখারার রোমাঞ্চ নেই
বজ্র নেই, বিদ্যুৎ নেই
গতি নেই, স্তব্ধতা নেই
সূর্যের নিশ্চুপ বিভীষিকা
আর ঈগল ॥

সুম্‌বুলের তারা

যখন সুম্‌বুলের তারা
ঝিকমিক করতে করতে ফুটে উঠবে,
আর ঘোটকীর পাল
বিলিয়ে দেবে তাদের সাদা দুধ
আমার তৃণভূমির ওপর দিয়ে সরু সরু গলাগুলো বাড়িয়ে দিয়ে
যখন কলহংসেরা উড়ে যাবে
আর অন্ধকারে, ইস্ কী বিষণ্ণ সুরে যে ডেকে উঠবে
বেচারা, আহা বেচারা কলহংসের দল।
তার মানে, ময়দানে ঘাসের বয়স
বেশ অনেকদিন হল।
কিপ্‌চাক, ওহে কিপ্‌চাক, এবার গা তোলো… '
সুম্‌বুলের ঝিকমিকে তারা,
আমি চাই, আমার হাতের ওপর মরুক ॥

আহাম্মকের কথা

মায়ের দুধের সঙ্গে তোমার মধ্যে
যদি এই দুর্বুদ্ধি ঢুকে গিয়ে থাকে,
তাহলে দুনিয়ার তামাম গরুর পক্ষেও
তোমার কল্‌জে বড় করা সহজ হবে না।

যদি এই পৃথিবী পর হত,
যদি আমার স্ত্রী হত দৃষ্টিহীন
তাহলে আমি আমার ব্রত লঙ্ঘন ক'রে
ঠায় তোমার দিকে আমার চোখ রাখতে পারতাম।
শুধু ভয়কে আজ আমি ডরাই
আমার করুণা এখন ওষুধের চেয়েও তেতো—
বুড়ো ব'লে আমি যাই বুড়িদের কাছে
তুমি ভেঙে গেলে আমি তার একটা টুকরো।
বাঘেদের মধ্যে আমি বাঘ,
বানরদের আস্তানায় আমি বানর,
নৈঃশব্দ্যের তীরভূমি হয়ে আমি নৈঃশব্দ্যে ভাসি,
জ্যোৎস্নার মধ্যে আমি চাঁদের হাসি।

হে আক্কেলমন্ত, কান দুটো আরেকটু লম্বা করো
গুপ্তধন থাকার চেয়ে দিলদরাজ হওয়া ভালো।
এই ঠিক।
হে আক্কেলমন্ত, একজন আহাম্মকের কথাও শুনো।
যদি সেই আহাম্মক তোমাকে সত্যি কথা বলে॥

আঙুরক্ষেতে

আঙুরক্ষেতের ওপর দিয়ে
যে যার ডেরাগুলোকে
ঘাড়ে নিয়ে
শামুকেরা হামা দেয়।
এক যাযাবর টগবগিয়ে যেত
কিন্তু তার বয়স হামা দিত।
প্রত্যেক জটিলতারই
একটা নির্বিকার ছবি আছে
এবং সেটাতে থাকে সরলতার প্রকাশ।
কোনো সামাজিক ঘটনার অর্থ বুঝতে হলে
প্রকৃতিতে তার প্রতিরূপ খোঁজো!
কোনো শামুককে যদি তুমি বলো : হামা দিচ্ছ হে—
সে বেজায় অবাক হবে :
বা রে, আমি যাচ্ছি টগবগিয়ে ॥

আমাদের গ্রামে ছিল এক চর্মকার

এই চর্মকার সবার জুতোই
কেবল নিজের মাপে বানাত,
সে ভাবত এইভাবে সে চারিয়ে দিচ্ছে সাম্যের ভাব।
লোকটা ছিল বেঁটে খয়াখর্বুটে
আর আমরা একেকজন দৈত্যের মতো ঢ্যাঙা,
ফলে জুতো পরা তো নয়
আমাদের পক্ষে সে এক নরকযন্ত্রণা।
কিন্তু সবাই ধরে নিয়েছিল ঐ জুতো
ঈশ্বরের উদ্ভাবিত,

যাতে মুসলমানেরা
হরবখত
নমাজ পড়তে পারে
(তোমাকে জুতো খুলে রেখে
বসতে হবে নমাজে, বুঝলে ?)
অতএব, প্রার্থনা হল
যন্ত্রণাক্লিষ্ট চরণের গান।

আবালবৃদ্ধ
সবাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে
ছুটে চলেছে মসজিদে,
আর সেইসঙ্গে চেল্লাচ্ছে
(পাগুলো টাটিয়ে উঠেছে ব্যথায়) :
'আল্লাহু আকবর !'

তোমার জুতো তোমাকে আদেশ করছে
তুমি রসুলের বন্দনা গাও
পায়ে যাদের জুতো নেই
যারা অলপ্পেয়ে অলবড্যে,
শুধু তাদেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই।
আর বিশ্বাস নেই আমাদের ঐ চর্মকারের,
তার পায়ে ফোস্কা পড়ে না।

আল্লাহু আকবর! কিন্তু তিনি তো থাকেন সেই কোন্ সুদূরে। আর ঐ চর্মকার বেটা দন্তবিকশিত করে রয়েছে খোদ্ এইখানে। এখন গাঁসুদ্ধ লোক কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে—চর্মকারের পা, হেই গো, একটুকুন বড হোক। ওস্তাগররা, হেই গো, এইটুকুন কম ধুমসো হোক। টুপিওয়ালারা একটু কম মাথামোটা হোক। ইত্যাদি ইত্যাদি॥

হে মরুভূমি

পামীরের মাথার ওপর পা ঘষছে প্লাবন
এক জলগর্ভ ধুমসো মেঘ
হেঁটমুখে
নিজেকে উজাড় ক'রে
জুড়িয়ে দেয়
দগ্ধানো বুকফাটা পাষাণের শোকতাপ।

পাহাড়ে পাহাড়ে হেঁটে বেড়ায় মেঘ
আর বৃষ্টির আদরে মাথা-খাওয়া চূড়াগুলো—
যারা উদ্ধত, তারা ধ্বসে গিয়ে হয় বালির ঢিপি।
ভেজা চটচটে পশমের গন্ধ কুয়াশাগুলোর গায়ে
অনতিদূর অতীতের গল্পগুলো
বললে বিশ্বাস করতেই চাইবে না মরুভূমির বালিয়াড়ি।
প্রাচীন তিমুতারাকানের উঁচু মিনারগুলো
হিসারের সমাধিতে মুদ্রিত হয়ে টিঁকে আছে।

বিনষ্ট শিখরগুলো থেকে ভেসে যায় মেঘ।
পরিত্যক্ত বালির ওপর
এসে দাঁড়িয়ে যায় একটি মেঘ,
শুকনো বুকে দুধের শেষ ফোঁটাটুকু নিয়ে
জননীর মত।
বালিয়াড়ি স্তব্ধ। হে চূর্ণ পাথর,
আমি যা পারি তোমাকে দিচ্ছি,
তুমি নাও এই স্নিগ্ধতা...
যদি কোনো অভিশাপের মতো নিষ্ফলা হয় আমার ছায়া, তাতেই বা কী।
হে মরুভূমি, তবু আমার এই ছায়াকে কাছে রাখো।
আমি কুয়াশার এক ধূসর আস্তরণ,
আকাশের ঝকমকে জঘন্য নীল নিয়ে তোমার কাজ নেই।

যখন আমি থাকব না, হে মরুভূমি, তখন তুমি ব'লো :
যেখানে সে মেঘ হয়ে যায় না, জেনো, সেখানেই মরুভূমি

ইষ্টনাম জপি

(আউশ্‌ভিৎস্‌ কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী
পোলিশ লেখিকা ভি. ঝিভুলস্কায়া-কে)

এক ডোরা-কাটা পার্কে এক ডোরা-কাটা বেঞ্চিতে
আমি ব'সে।
শরতের ঝকঝকে সূর্যকে আমি বিদায় দিচ্ছি।
আমার কোলের ওপর বইয়ের খোলা পাতাগুলো ফরফর করছে।
আরামে গা এলিয়ে দিয়ে ব'সে আছি।
লোকে বাড়ি ব'য়ে নিয়ে চলেছে গোলাপ : বেগ্‌নে, হলদে, কালো।
কেউ বন্ধুদের, কেউ দেবে গোলাপ তার ভালবাসার মানুষকে,
আজ দিতে হয়
গোলাপ, হাড়-বার-করা মেয়েদের পিঠের ক্ষতের মত।
একটা কচি মেয়ে আইসক্রীম খাচ্ছে।
সেই কচি মেয়ের পরনে ইস্কুলের পোশাক।
তার ঠোঁটময় ক্রীম,
কোনো মৃগীরোগীর গ্যাঁজলা-ওঠা মুখের মত।
চটচটে···
বিয়াল্লিশে একটি ছেলে চেয়েছিল খাসীর মাংস—
খাদ্যের তালিকায় এটা যোগ করুন, ভাই।
তেতাল্লিশে তার বেজায় ইচ্ছে করেছিল রাই থেকে করা রুটি খেতে—
দেখবেন ভাই, ভুলে যেন এটা তালিকা থেকে বাদ প'ড়ে না যায়।
চুয়াল্লিশে সে হাম্‌লে বেড়াত একটুখানি বীটের কন্দ খাওয়ার জন্যে
আর পঁয়তাল্লিশে,
যখন এমন কি বুড়োরাও সব ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল,

সে এসে দাঁড়াত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, তার আত্মীয়কুটুম্বদের প্রতীক্ষায়,
সৈন্যদের পুরো একটা দলের জন্যে…
কেমন যেন জংলী হয়ে গেল, ছটফট ক'রে বেড়াত,
যে পর্যন্ত না চেঁচাতে চেঁচাতে হেঁচকি উঠে যেত,
তার চেঁচানো বন্ধ হত না।
ছোট্ট এইটুকু ছেলে—কতটুকুই বা সে বুঝত।
সে তখন জানত না
তার কাছছাড়া ক'রে নিয়ে গিয়েছিল শুধু পুরুষদেরই নয়।
তার কোলের ওপর শীর্ণকায় বই,
যেন বহুবিলম্বে পৌঁছুনো কোন্ কবেকার একটা চিঠি…
সৈন্যদের ওরা হেনস্থা করে করুক,
কিন্তু মেয়েদের ধ'রে যেন না টানে।
চমৎকার চমৎকার সব কথা কাদের উদ্দেশে বলা হবে?
এই এদের? টাইফয়েডে মুড়িয়ে নিয়েছে যাদের চুল?
যাদের ঠোঁটগুলো লিপস্টিকের মত পিত্তরসে মাখানো?
এই এদের? যারা বঞ্চিত হয়েছে
মাংস, রুটি, বীটের কন্দ
আর মা-র কাছে চিঠি লেখা থেকে?
চোখের জল, মনের বিষাদ, জীবনের মাধুর্য কেড়ে নিয়ে
যাদের জন্যে শুধু খুলে দেওয়া হয়েছে নরক,
শুধু পলায়ন, আত্মহত্যা
আর গ্যাস-কুঠুরি?!
অনুকম্পা পেল না এই মেয়েরা!
ক্ষয় হয়ে যাওয়া কটুগন্ধ
দেহগুলোর জন্যে দরদ!
রাতের দুঃস্বপ্ন হতে পারত—
কবির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া রমণী!…
এখন বিনা লজ্জায় আমি সব খুলে ফেলতে পারি
বেপরোয়া হয়ে আমার যা খুশি এখন আমি সাজতে পারি
আমার ইচ্ছে করছে ছেলেমানুষ হয়ে যেতে

যাতে আমি হাসতে পারি,
কিংবা ইস্কুলের পোশাক-পরা ঐ যে ওর মত
ঠাণ্ডা হিম মিষ্টি ক্রীমে
দাঁত বসাতে,
একে ওকে মুখ ভেংচাতে—

কিন্তু তার কারণ বুক-হিম-করা অনুষঙ্গগুলো নয়।
রাস্তাটাতে এখন কত ফোয়ারা, মাঝখানে মাঝখানে লালের ছোপ,
জমকালো লাল ক্যানা ফুল. পুলিশের উর্দিতে লাল স্ট্র্যাপ।
হৃদয়বান আর প্রাজ্ঞ
নতুন এশিয়ার মহানগরীর প্রত্যুষ।
মনে মনে ইষ্টনাম জপছি।
উজ্জ্বল সব মুখমণ্ডল
সন পঁয়তাল্লিশ। যুদ্ধবিজয়ের দিন ॥

মাটির কেতাবের ত্রুটি খণ্ডাংশ

১। দৈববাণী

…পৃথিবী হল বৃত্ত
তার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি হয়ে এক সূক্ষ্ম ঢ্যারাচিহ্ন
(এক সবুজ পাতার আবডালে
তুমি হলে পরিণততম আপেল)
বৃত্তের চারটি চাপ
চারদিক থেকে কেন্দ্রের অভিমুখে তাকিয়ে,
তুমি কেন্দ্রের দিকে স'রে যাও
আর তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠো।
(ভরে উঠলে তুমিই সর্বাগ্রে
অন্যেরা এখনও তৈরী হয়,

যারা তোমার সবুজ স্বজাতি
রোদে পিঠ দিয়ে তারা ঘুমোচ্ছে,
এসো আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি
স্বপ্ন ওদের মধুর হোক,
এসো আমরা মন দিয়ে শুনি
খান্ ইশ্‌পাকার বচন)।
—একটি ক'রে চেতন জীব
আর তার মাথায় আকাশে বেড়ে উঠছে একটি ক'রে তারা,
তারাগুলো খসে পড়ছে···
—আপনি বলছেন তাই ?
—হ্যাঁ।
মানুষ এক অন্তহীন ঘুমে ন্যাতা হয়ে থাকে,
কিন্তু প্রত্যেক শতাব্দীতে
ভোঁস-ভোঁস ক'রে ঘুমুনো জনসমুদ্র থেকে উঠে আসে
একজন।
হাজারে কিংবা শ'য়ে একজন
—তার আচম্‌কা ঘুম ভাঙে,
পোড়ার ব্যথায় সে চেঁচাতে থাকে :
আকাশ থেকে তার নক্ষত্র তার ওপর খসে পড়েছিল।
ঘুমন্ত লোকগুলোর মধ্যে
গ্রহটাকে নিয়ে সে হৈ-হল্লা বাধিয়ে দেয়,
অসাড় দেহগুলোকে সে পা দিয়ে ঠেলা দিতে থাকে—
নাঃ, কেউ না।
লোকটা চেঁচায়, রাগে ফোঁসে—
কিন্তু না,

কেউ জাগে না !
(কিন্তু পৃথিবীকে সে এমনভাবে দেখতে পাবে,
তার আয়ুষ্কালের পর
যে রূপটি আর কখনই কেউ দেখবে না)।

তারপর সুপ্ত মানুষেরা
অনাগত কালে আবার পাড়ি দেবে,
আর পরের শতাব্দীতে
বর্তমানকে
ধ'রে রাখতে কিংবা উদ্ঘাটন করতে
আবার একজন জেগে উঠবে।
একটি ক'রে যুগ অতিক্রান্ত হবে
আর আকাশে সৃষ্টি হবে একটি ক'রে তারার শূন্যতা
কপালে নক্ষত্র নিয়ে সেই লোকটি
চোখ সম্পূর্ণ খোলা রেখে বাঁচছে।
আহা বেচারা, এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালে
কী প্রতীয়মান হচ্ছে তার কাছে ?
'জীবনটা স্বপ্ন' — অন্যেরা বলেছেন আমাদের আগে।
জাগরণ হল মৃত্যু। মন্দ নয়, কী বলো ?
— ধার আছে।
আকাশে বেশ অনেক জুড়িয়ে-যাওয়া তারা
রয়ে গেল কিনা দেখে নাও।
এই সর্বশক্তিমান ঘুম—
এরই নাম
অনুজীবন।
…কাজেই আকাশ যখন শূন্য
তখনই তাদের আবির্ভাব হবে :
নিটপিটে সব মানুষ,
ঘুমজড়ানো চোখে
আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে

ফুটো দিয়ে চোখ কুঁচকে দিনের আলোর দিকে তাকাবে,
পাছা চুলকোতে চুলকোতে
তারপর একসঙ্গে
এক জোড়া খিস্তির গল্প

কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বলল—

কী গো ?

— অঃ ! জব্বর···

পৃথিবী ঈষৎ বদলেছে

ভূগোল তার যথাস্থানে ঠিক নেই :

অনেক দিন আগেই

ঘুমের মধ্যে সরতে সরতে

ওরা একদম কিনারার দিকে চলে গিয়েছিল।

লোকে গা এলিয়ে দিয়ে ভাববে

বাবা গো মা গো ! এ যে দিনে ডাকাতি গো ! কেন্দ্র গেল কোথায় ?

কিন্তু তারপর দ্বিতীয়বার ভেবে টেবে বলবে : নেই তো নেই !

এটা এখন শরৎ।

আহা !

গাছপালার বাড় বড় কম,

মন-মরা বরফে ঢেকে যাবে প্রান্তরের ঘাস,

আদিকাল থেকে ধবল তুষারে

প্রতিরক্ষাহীন হও,

ও আমার মানুষ,

তোমার অবসাদভরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে প্রত্যেক শতাব্দী।

ভ'রে উঠলে তুমিই সর্বাগ্রে, অন্যেরা এখনও তৈরি হয়,

যারা তোমার সবুজ স্বজাতি

রোদে পিঠ দিয়ে তারা ঘুমোচ্ছে,

এসো আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি

ওদের স্বপ্ন মধুর হোক,

এসো আমরা মন দিয়ে শুনি

খান্ ইশ্‌পাকার বচন ॥

২। বর্গীর দল

চিত্রবিচিত্র ঘোড়ার ওপর আমরা সওয়ার,

পেটের ওপর ভর দেওয়া আমাদের হাত—

প্রার্থনারত।
জাতযাযাবর এই দলটার পুরোভাগে
উড্ডীন হয় পতাকার পর পতাকা।
একেবারে কেন্দ্রস্থলে খান্‌-এর শ্বেত পতাকায় লাঞ্ছিত
নেকড়ের মাথা আর ভয় দেখানো সূর্য,
ডাইনে আর বাঁয়ে পৎ পৎ করছে
রক্তবর্ণ নিশান।

টগবগে ঘোড়ার পদশব্দে শঙ্কিত
গ্রীক, রোমান আর গথ্‌দের
দৃষ্টিগোচর হয়েছিল
ভোরের সূর্যের মত লাল,
ঘোরতম লাল

আমাদের পতাকা
সূর্যাস্তের দেশগুলোতে পৌঁচেছিল
সূর্যাস্তের রং।
ওরা জেনেছিল, রূমের সূর্যাস্তের রং হল

পুবালী নিশানের।
রূমের রমণীদের ওপর অরুচি ধ'রে যাওয়ার পর
পাকা চুল আর পাকা দাড়ি নিয়ে আমরা সব ফিরে যাব,
লড়াই বলতে তখন শুধু হাতাহাতি,
পাহাড়ী নদী—
মাঠের খানাখন্দ।
আমরা ফিরে আসব ঘাসের প্রান্তরে,
ক্রমশ পাতলা হবে অশ্বারোহীর দল,
আমাদের সেনাপতিরা পিঠ খালি ক'রে ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে।

চলো!…বলার সঙ্গে সঙ্গে রেকাবে পা;
চলো!…বলতেই মাথায় চেপে বসল ফারের টুপি,
চলো!…আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ঘোড়সওয়ারের জাত—
চাষী গৃহস্থদের বিরুদ্ধে যাযাবর লুটেরার দল॥

উড়াল

দেখ দেখ,

মেঘের দল

শহরের মাথার ওপর ত্রিশঙ্কু।

এখন পর্যন্ত আর কোনো রাস্তা নেই

আমি উড়ে চলেছি মেঘমণ্ডলের ওপর দিয়ে

আর নিচে—নদীর দুপাড়েই

গাদা করা খড়

আর পাংশু বরফ

আর কালো কালো ঘরবাড়ি।

নদীর বাঁকের মুখে

রাস্তার শেষ।

আহ্লাদে আটখানা হওয়া ছোট্ট মাছ

বলতে গেলে দোরগোড়ায়।

মাথা থেকে ওড়না খুলে একটি মেয়ে

নদীর ঐ বাঁকে আমার কাছে আসত,

জল ফেলে জল আনতে যেত

কখনও ঘর মোছা, কখনও অতিথির জন্যে

চা করার ছলে।

যেন ঝাঁঝালো আলোয়

চোখ কুঁচকে

মেয়েটি নিঃশব্দে রাতের গভীরে তাকাল

যখন আঁকড়ে ধরার আর কিছু নেই

আমাকে বাঁচিয়ে দেয় এই—

নদীর পাড়ে

ভারাক্রান্ত খড়ের গাদা।

মেয়েটি ছড়িয়ে দেয় তার বাহুলতা,
আঙুলে মুঠো ক'রে ধরে
গুচ্ছ গুচ্ছ উলুখড়

আহ্লাদে আটখানা হওয়া ছোট্ট মাছ···

···পাইলটের ঠোঁটে স্মিত হাসি।
ছোট্ট প্লেনটা পড়ে গিয়ে চুরমার হল
নদীর বাঁকে॥

কোজাগরী : লায়লাতুল কাদার

জাগরণে যায় বিভাবরী।
আবহে উষ্ণতা
বিছানো ফরাসে বুড়োদের ফিস্‌ফাস।
চাঁদ—যেন বাঁকানো ভুরুতে
অবাক বিস্ময়।
দামালো নদীর খরস্রোতে
নুড়িপাথর।

অজু করে
রাত্রি আর দিন।
আল্লার কাছে মানুষ পৌঁছে দিচ্ছে
যথাবিহিত বাসনা কামনা।
মানুষ ফিরে ফিরে সকাতরে দোয়া করছে
তাদের রাতের ইচ্ছেগুলো যেন পূর্ণ হয়।
লায়লাতুল কাদারের রাত্রে অভাগা মুসলমানেরা

একরত্তি পার্থিব সুখের জন্যে
মোনাজাত করছে।

মাটিতে স্খলিত হচ্ছে দৃষ্টি।
ধূলিকণাগুলো রাস্তায় ভালুকের মতো
গা ছড়িয়ে,
লোকে হেঁটে যায়,
মসজিদের রোদে-পোড়া ইঁটের দেয়ালগুলো স্তব্ধ।
ধুলোগুলো মসজিদের পাশ কাটায়
যেমন যেমন বছরগুলো যায়।

বাঁকা তরবারির ছায়া ধারণ ক'রে আছে
কুঁকড়ে-যাওয়া মিনার।
ঘাসের মাঝখানে একটা গড়খাই জ্বল জ্বল করছে,
খোলা পাগড়ির গায়ে বুটিদার রেশমের মতন,
আপেল গাছগুলো তাদের শিকড় ধুয়ে নিচ্ছে
পলিতকেশ জলের মধ্যে,
আজ যখন লায়লাতুল কাদারের রাত্রি।

তিনকাল-খোয়ানো এক খুনখুনে বুড়োর মত
শান-বাঁধানো চৌখুপী জাজিমের ওপর আমি ঘুরে বেড়াই
শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলি আর তোমাকে স্বপ্নে দেখি।
আমার ইচ্ছেগুলো, আহা সফল হোক॥

ফাঁসির আগে মহম্মদের মোনাজাত

বিস্‌মিল্লাহ্‌।
দূর অভিযানের মধ্যে নিজেকে আমি ভুলে যাব
লড়াইতে আমি এক বছর আছি
আমার গলা পর্যন্ত অপবাদ
ঘোড়ায় জিন দিয়ে আমার জন্ম
শিকল প'রে আমি মরছি
রাস্তা দিয়ে কুকুরের মত আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে।
ঘোড়ার ঘামের গন্ধ আমি ভুলে যাব।
ধরা গলায় কান্নার শব্দ আমি ভুলে যাব বন্দীশালায়
সকাল হলে আমার দেহটাকে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে
আগুনের কুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলা হবে
আমার মাথার টনক ভুলে যাবে তার অতীতের গৌরব।
আমি ভুলে যাব মেয়েরা আমাকে দেখে কিভাবে আঁতকে উঠত।
আমি যেন এক খোলা তরোয়াল,
কিন্তু জং ধ'রে গিয়ে আমাকে খেয়ে নিচ্ছে।
যেন একটা প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে আমার প্রাণপুরুষ
কণ্ঠায় এসে ঠেকেছে।
না, আমি ভুল বললাম—
আমার হৃদয় যেন পালক-ছাড়ানো বাজপাখি।
আমি সমস্তই ভুলে যাব,
আমার প্রার্থনা, আমার মুক্তি,
অগ্নিকুণ্ড, লড়াই, আল্লা···
হে ঈশ্বর।
মরুভূমির শিয়রে চাঁদ উঠছে
আর উটের দল চলেছে পেছনে পেছনে,
একটা মাদী উট বালিয়াড়িগুলো পেরিয়ে···
মরুভূমির আঁচে ফুটন্ত দুধ,
নিতান্ত বেজার হয়ে কুকুরগুলো খেয়োখেয়ি করছে

আমি বন্দীশালায়, মাটির নিচে, অনেক গভীরে
আর গোলাকার রুটির মত চাঁদ আমার হাতে
গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে…

অগস্টের এইসব রাত

অগস্টের এই সব রাত,
বিদায় নাও, কিন্তু মনে রেখো
এর চেয়ে ঘনঘোর রাত্রি আর নেই।
আমার কাঁধের ওপর আপেলের একটি পল্লব,
ঠিক চায়েরই মত সুরভিত রাত্রি।

হাঁ করো,
দেখবে তোমার গলায়
চুপি চুপি প্রবাহিত হবে ধারা।
হরিৎ নগরের ভেতর দিয়ে বয়ে যায় এই প্রহর, সেখানে বয়
আপেল গাছের শাখা,
ওঠানো যবনিকার মত,
কালো আকাশে আগুনের এক শিখা।
আমি ভুরু কোঁচকাই আর মনে করতে চেষ্টা করি
সেই গ্রহের নাম।
মঙ্গল। মঙ্গল না হয়েই যায় না!

আস্তাবলের তেজী ঘোড়া আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে,
আমার বিশ্বস্ত জুলবার।
তার লোহার লাগাম রুণু রুণু ক'রে বাজিয়েছে
ধূলিধূসর সফরের পর।
শ্রান্তি স্নিগ্ধতা ঘুম

ঊর্ধ্বে নক্ষত্র গম্বুজ,
গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া শিরস্ত্রাণের মত,
তার উজ্জ্বলতম নক্ষত্রকে ঝলকিত ক'রে
মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে—
মঙ্গল। মঙ্গল না হয়েই যায় না!

পাকা টসটসে স্বচ্ছ ফল
নুয়ে পড়ে আপেলগাছের ডালটাকে চাপ দেয়,
ভাঙে।
আর সমানে নুইয়ে দিতে থাকে
অগস্টের এইসব রাত,
বিদায় নাও, কিন্তু মনে রেখো
এর চেয়ে লঘুভার রাত্রি আর নেই,
কত কিছু রয়েছে যা এখনও আমার জানার বাইরে,
ঠিক চায়েরই মত সুরভিত রাত্রি।

ঘন ঘাসে নিক্ষিপ্ত
একটা জরাজীর্ণ জাজিম,
আলুবোখারা গাছের পেছনে অন্ধকার
কালো তেজী ঘোড়ার মতন দাঁড়িয়ে,
জিনের ওপর মাথা রাখা···জিন থেকে বেরোবে
ঘাম আর ধুলোর বোটকা গন্ধ···
আর আমার তলা থেকে উঠে আসছে
একটি দলিত মথিত উদ্ভিন্ন অঙ্কুর ॥

মরুভূমিতে রাত্রি

শিশির নেই,
আশ্চর্যের কথা, শিশিরই নেই,
অসাব্যস্ত, ঠাণ্ডা বালিতে,
আমার মুখমণ্ডলে আর আমার কুর্তায়—

শিশির নেই,
চূর্ণিত পাথরের তরঙ্গমালা
ঠিক যেন প্রহরীর মতই চুপচাপ,
আর এক রাতদুপুরের চাঁদের
জ্বালায় জ্বলছে।

হায়, শিশির নেই।
খালি পায়ে শেয়ালেরা বালির মধ্যে হাসছে,
শিশির নেই ব'লে,
গায়ে আলো পড়ে এক কঙ্কালসার গাছ পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে·

শিশির নেই ব'লে।
অ্যালুমিনিয়াম আলোয় অনাবৃত হয়
মরুভূমির উদ্‌গত স্তনযুগ
আর এক ফোঁটা শিশিরের জন্যে
বালিয়াড়ির কাতর প্রতীক্ষার চেয়ে বড় মানবিক
সৌন্দর্য আর নেই।

চাঁদ জুড়িয়ে আসবে
আর বালিয়াড়ির দূরের কিনার
সূর্যালোকে ফেটে পড়বে···
কিসের জন্যে?
নিঃসঙ্গ মানুষের মুখমণ্ডলে শিশির।

কথাটি

এক সুরাইতে ঢেলে দেওয়া তরল
চটপট বরণ করছে তার কঠিন ছাঁদ।
আত্মার বনগহনে নিবিষ্ট শব্দ
তাকে তার নিজের ছাঁদে ঢেলে সাজে।
রাতের গড়নে যা-নয়-তাই হয় অন্ধকার
আর অতীত থেকে আসে ছেঁদো ঘোড়া নয় তেজী ঘোড়ার হ্রেষারব।
সব জায়গাতেই ভয়াবহ সামঞ্জস্যের সমস্ত কাঠামো
চিৎকার ক'রে ভাঙার একটা প্রবল স্পৃহা।
এমনি ক'রে পৃথিবীতে ঢুকে আমরা পৃথিবীকে বদলাই।
পৃথিবী ওপরের খোলস, আমরা তার ভেতরের শাঁস।
কম্পমান ঈথারের মত দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে
শব্দের কলেবর নিচ্ছে পৃথিবী।
শেষ পুঁথি এখন ভস্মকায়, আর স্ফুলিঙ্গে ছেয়ে গেছে ধোঁয়া
কিন্তু অক্ষরগুলোর ছাইয়ের ওপর চিরন্তনের চিহ্ন
কঠিন প্রস্তরফলকে—
সেই ধ্বনি
চিন্তার নক্সায় উৎকীর্ণ ॥

বিলম্বিত

ট্রেনগুলো যে-সময়ে আসবার আসে নি।
সবুজ সিগন্যাল দুর্ঘটনায় ঠাসা।
গুলিতে ভূপাতিত পাঁশুটে নক্ষত্র
প্লেনগুলো বিলম্বিত।

বাদামী চোখের ওপর তেরছা ভুরু—
দয়ার সাগর এই শতাব্দীর, মরি মরি, কী কেরামত!

মাত্র এক চাবুকপ্রমাণ দেরি ক'রে ফেলেছে
তোমার মন্ত্রণা।

অনেক ছবির রং চটিয়ে দিয়ে
পড়বে ভবিষ্যতের ছায়া।
ওগো প্রিয়া, তোমার পেলবতা
বড় দীর্ঘদিন দেরি ক'রে ফেলেছে।

পিয়ানোকে দাবড়াও! ওরা বাবা-রে মা-রে করবে।
মহাকাব্য থেকে ছিটকে উঠে আসবে
পরিত্রাতা অশ্বারোহীর দল—ইতিহাসের চেয়েও দ্রুতবেগে
—এসে দেখবে ওরা দেরি ক'রে ফেলেছে
বছর শ' তিনেক॥

বিজ্ঞান, ধর্ম আর সৌন্দর্য বিষয়ে

মানছি
ধর্ম টানে সৌন্দর্যের দৌলতে—
রঙীন রঙীন কাঁচ, খোদাই-করা মূর্তি,
উঁচু উঁচু গম্বুজ,
নীলে নীলাকার মিনার, অক্ষয় অমলিন জলরং।
শত শত জেহাদেও
ইসলামের যে জয় সম্ভব হয় নি
তা হয়েছে একটিমাত্র অপরাজেয় আয়া-সুফিয়ায়।
তরোয়াল দিয়ে নোয়ানো যায় মাথা,
আত্মাগুলোকে হাত করায় আয়া-সুফিয়া,
নিষ্ঠুরতা, গায়ের জোরে স্বীকার করায় বশ্যতা।
পটাবার জন্যে রয়েছে সৌন্দর্য।

মসজিদ জাগাবে সম্ভ্রম
তরোয়াল যোগাবে ভক্তি—
মারমুখো বিশ্বাসের এই হল আদত
চাঁদতারাকে আর চালচুলোকে এক জায়গায় এনে
দ্যুলোক আর ভূলোক মিলিয়ে দিয়ে
তরোয়ালে আর মসজিদে এক মিতালি।
মানছি।
কিন্তু ওসব প্রতীকে আর চলছে না,
সময় হয়েছে এখন ওদের আঁস্তাকুড়ে যাবার,
কিন্তু তবু ওরা বস্তুতে বস্তুতে আঠার মত লেগে,
মনগুলোতে তবু ওরা গেড়ে বসে আছে।
দেবলোকে উঠে গেল কোথাকার এক আড়কাঠা
—ক্রসচিহ্নাকারে
কোথাকার এক খঞ্জর অর্ধচন্দ্রাকারে।
রাগ হবে না?
যুগটা পারমাণবিক আর ধর্মের প্রতীকগুলো
যেন সেই কোন্
আদমের সময়কার স্মৃতিচিহ্ন
মিনারের আদরার সঙ্গে
ক্ষেপণযোগ্য একটি রকেটকে একবার মেলাও।
রকেটে মিশে আছে শক্তি আর সৌন্দর্য,
এখানেই তো পেয়ে গেলে তোমার যোগ্য প্রতীক।
ভেতরে এক গোলমুখো দেবতার অধিষ্ঠান,
তার বেশ আঁটসাট মাংসপেশী
আর প্রথম শ্রেণীর রক্ত।
আজ দেবতা বনতে পারে যে কেউ—
ওঁরা বলেন, তার জন্যে চাই যুৎসই স্বাস্থ্য।

মধ্য রাত্রে
কারো পিঠ বেয়ে পিঁপড়েরা যেমন বেড়ায়

তেমনিভাবে সেই দেবতারা চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটে
সেই বিগ্রহ।
ঠাকুরের সাদাসিধে ভাবে কেউ বিমুখ তো হয় না,
সাদা সফেদ শয্যাতেই তো আমার প্রেয়সীকে ঢের ভাল দেখায়।
জীবনের সমস্ত নোংরা নিয়ে
সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে,
আমি উচ্চারণ করি আমার প্রার্থনা,
প্রেমই আমার ধর্ম।
ধুলোর মতন রেণু রেণু হয়ে জমবে
পুরুষের পর পুরুষ, কালের পর কাল, কল্পের পর কল্প
যতদিন বিরাজ করবে ভালবাসার এই ধর্ম,
যতদিন ভেনাসের শরীরের ঢেউগুলো মারাত্মক হয়ে থাকবে।
তামাকের একরাশ ধোঁয়ায়, দেখ
বুড়োর দল কি রকম আড়চোখে ঠাকরুনকে দেখতে দেখতে ভাবছে
উনি নিয্যশ মানুষ, এই মাটির পৃথিবীর,
বিশেষ ক'রে,
শরীরের ঐ বঙ্কিম ঠাম···
কিন্তু তা সত্ত্বেও, গির্জাগুলোতে ঢুঁ না দেওয়াই ভাল,
যেখানে রঙীন কাঁচ ভেদ ক'রে সূর্যের রশ্মিগুলো
খ্রীস্টের বক্ষপঞ্জরের ওপর দিয়ে রক্তের ধারার মত বইছে,
সায়ংকালের প্যাগোডার মতন
যেখানে নৈঃশব্দ্য,
ভোরবেলার মসজিদের মতন
যেখানে উত্তুঙ্গ মহিমা।···
এই সৌন্দর্য হরণ ক'রে নেয় ধর্মে বিশ্বাস॥

পদার্থবিদের প্রার্থনা

ফেব্রুয়ারিতে (হ্যাঁ, আমার মনে হয় ফেব্রুয়ারিতে) মরুভূমি
হয়ে যায় লালে লাল সমুদ্র। পপিফুলে।
মার্চে ঘাসে ঘাসে ঢাকা থাকে বালি,
উটের যে কাঁটা, তাও তখনও ঠিক কাঁটা নয়—
নরম, সবুজ আর তার থলথলে পাতাগুলো
ভেঙে গেলে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে শিশির।
মে মাসে রৌদ্রতাপে দগ্ধ ঘাস বালিতে মিলিয়ে যায়
আর গরম ধুলোয়
ঢের বেশী ক'রে দেখা যায় ভেড়ার নাদি।
আর অগভীর বাটিতে
শুধু সবুজ চা
    স্মরণ না করার কথা
আমাকে মনে করিয়ে দেয়।
আর সেই সঙ্গে শুক্‌নো কুয়োর তলানিতে ঠেকা
কালো জল
    যাকে মনে করিয়ে দেয়
চরাচর হলুদবর্ণ
আর টকটকে লাল।

২

ঠোঁটটাকে স্বাগত জানাবার ভঙ্গিতে নেড়ে নেড়ে
এক বাদামী ঈগল শূন্যে ভেসে আছে।
আমি ফিরে এসেছি, আমার পুনরধিকারে
আমার এই ভূমণ্ডল, আমার ভালবাসার জগৎ।
নিশ্চল সাপ গদ্‌গদ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে :
কুঁকড়ে গেছে লজ্জায়!
    মাঠ, তুমি কেমন আছ!
প্রত্যেকটা নেংটি ইঁদুর আমার জন্যে

তার জীবন আর স্বাধীনতা
হাসিমুখে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।
এখানে সকলেই কুশীলব,
সকলেরই স্থান মঞ্চে
একটা চড়াইও জানে
তাকে ছাড়া এ পৃথিবী অসম্পূর্ণ।
গুবরেপোকাও মানিয়ে যায়।
পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে সে হাঁটে,
গোময়ে তার প্রাণধারণ,
সে ভালবাসা পায়,
তাকে দেখা হয় না ঘৃণার চোখে
পায়ের নিচে কেউ যদি তাকে মাড়িয়ে দেয়
তাহলে তা হঠাৎ দৈবাৎ।
বিনা মদিরায় এখানে শান্তি মেলে,
অতীতকে নাকচ করতে হয় না।
শব্দ আর শ্রুতি হয়ে সময়ের পর্বগুলো এখানে এসে মেলে
তারপর অনাদি-অনন্তে মিশে যায়।
তাড়া না করার ধর্মকে
লগির জোরে অমর করে রেখেছে বালুতট,
এখানে এলে টনক নড়ে :
দার্শনিক জেনো বলেছিলেন ঠিক—
কচ্ছপের পিছু নিয়ে কখনই আমরা তাকে ধরতে পারব না।
সুতরাং : বেঁচে থাকো আর ঘুমোও, হে—
তোমার যা প্রশ্ন আছে করো, সময় হলে উত্তর পাবে ;
কাল অনন্ত, তাকে তাড়া ক'রো না।
সরলরেখা হল
অনন্তে প্রসারিত শুদ্ধমাত্র সংখ্যা।
পরম জ্যামিতিক চিত্রসমূহের যোগফল দিয়ে
বৃত্তকে পরিমাপ করতে যেয়ো না,

আর বুঝে ফেলতে চেয়ো না সব কিছু
কেননা তাতে সব কিছুই অর্থ হারায়।
যুগ যুগ সঞ্চিত অশ্রুর বাষ্পে,
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সঞ্চিত ধূলির আবরণে.
বাস্তব থেকে আমাদের ঠিক শিক্ষাটি হয় নি,
আমাদের মাথা খেয়েছে রূপকথা।

ওভার পেরিয়েও অনেক ট্রেন আছে।
তার একটি হল আমার বিষাদ।
প্রকৃতির ধর্মের দরুনই হোক,
কিংবা দুর্ঘটনাক্রমেই হোক,
হে ঈশ্বর, তুমি দেখো
যেন আমার দেরি হয়ে না যায়।
ঈশ্বর. দেখো
আমি যেন সব কিছু বুঝে না ফেলি,.
আর সে মুরোদ যদি তোমার না থাকে—
ঈশ্বর,
আমাকে মাপ ক'রো ॥

হে পর্বতমালা

হে পর্বতমালা, তুমি কি আমাকে ভালবাসো ?
পাইনগাছ, ভালবাসো ?
নীল আর সাদা পোশাকে
বছরগুলো আমার ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে,
সঙ্গে নিয়ে কত সব মূল্যবান
ওষধির নাম,

চড়া চড়া রঙের মধ্যে শুষে নিয়ে
সকল ছাঁদের নৈঃশব্দ্য।
পাহাড়গুলোকে একজোড়া দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মত ব্যবহার ক'রে
আকাট বাস্তবতাকে আমি শুধ্‌রে নিই—
আমি ভ্রমণ করেছি তুষার-সম্প্রপাতের মত
আর আমার বছরগুলোর
দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পদাঙ্কে জমেছে
তুষারের ধূলিকণা।
উল্কার নামাঙ্ক
বিভ্রমের বছরগুলো।
হে পর্বতমালা, তুমি কি আমাকে ভালবাসো ?
মানুষের জাত, আমাকে ভালবাসো ?
তোমার ভুল কখনও শোধরানো যাবে না,
তোমাকে কখনও সমান করা যাবে না,
তোমার বন্ধুরতাকে,
হে পর্বতমালা,
কখনও চেঁছে ফেলা যাবে না।
তোমার নিয়মের কোনো বালাই নেই, হে পর্বতমালা,
তোমার কোনো ধারণাই নেই বিধিনিয়মের,
তোমাকে কেটে সমান করা যাবে না, হে পর্বতমালা,
কেননা তোমার সমান স্তরের কিছুই নেই ॥

যায় আসে

আকাশে পাখির ঝাঁক
উড়ে যায়
নিচে শুভ্র নদী,

যেন দগ্ধ গ্রীষ্ম দিল অন্তরীক্ষে ছুঁড়ে

কালো ছাই,

বলাকা উড্ডীন, যেন শূন্যে যায় ভেসে

কারো চুল বাঁধবার ফিতে,

আমার হাঁসেরা যায়

যেখানে চেয়েছে তারা যেতে।

মিষ্টি এঁটেল মাটি, লবণাক্ত হ্রদ,

আফ্রিকার মাছ, কিন্তু তেতো নয়,

গায়ে নেই কাঁটা।

আমার কেমন যেন মনে হয়—

মন্থর হাঁসের ঝাঁক নিয়ে

নদীতে নদীতে ফেলে মুক্তাবর্ণ পাঁশুটে পালক

রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে যেন সুবচনী

আমার কেবল ভয়—

হয়ত এলিয়ে পড়বে ডানা,

হয়ত বা থেকে যাবে নিরবধি অন্তহীন কাল

যেখানে যাবার জন্যে বাসনা আমার।

হয়ত আছে বাসনা আমার।

…উঠে আসে পাহাড়ের মাথার ওপর

এলে মধুমাস,

যেন ভারাতুর রশ্মি,

সূচীমুখে প্রথম প্রবেশ,

জোর ক'রে ঠেলে ঠেলে অবসন্ন জলবায়ু-জর্জরিত তাদের ডানায়

ঈষদচ্ছ, সান্দ্র সেই

বায়ুর দ্রবণ॥

পদচিহ্ন

পায়ের
        এই ছাপ
                তোমার না হয়েই যায় না।
হাজারটা পায়ের ছাপ মরতে কেনই বা পড়বে!
ধবধব করছে রাস্তা, তার ওপর দাগ,
আমার নোটখাতার মার্জিনে কলম বোলানোর মত।
...আমি রাত্তিরে যেসব সাংঘাতিক ভুল ক'রে বসি, তার চিহ্ন,
মার-খাওয়া মুখের কালো আর নীল কালশিটের মত!
প্রিয় মুখ হাজার ভিড়ের মধ্যেও আমি খুঁজে নেব,
অভিধান ঘেঁটে আমি ঠিক খুঁজে বার করব ভাল ভাল কথা,
আমি তাদের শিকারী কুকুরের মতন পাদস্পৃষ্ট রাস্তা দিয়ে
                                        হাঁটিয়ে নিয়ে যাব
গ্রামদেশের অমলিন তুষারের দিকে,
নগরের সেই উপান্ত পার হয়ে,
যেখানে শোনা যায় না কোনো হীন কটুকাটব্য,
যেখানে তুষারে মুদ্রিত ছাপ আহাম্মকেরা এখনও পড়ে ফেলে নি।
লাল খেঁকশেয়ালী হয়ে হয়ত তুমি চলে গিয়েছিলে পাহাড়ে?
হয়ত নীল নেকড়ে হয়ে গিয়েছিলে মরুভূমিতে?
নাকি তুমি সাদা তিতির হয়ে গিয়ে
তুষারে ছড়িয়েছিলে ঢ্যারাচিহ্ন?
সীমান্ত পেরিয়ে তুমি উড়ে গিয়েছিলে কি
চীনদেশের ঘননিবিড় কাঁটাবনে?
কিন্তু মুদ্রিত ঢ্যারাচিহ্নগুলো
কত শিখর, কত গহ্বর, কত পাহাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে—
কাকেরা নিশ্চয়ই এই ঠেসে-ধরা, চোট-খাওয়া তুষারে
এই প্রান্তরকে চিহ্নিত করেছে।

আমি কাকদের সেই ঢ্যারাচিহ্নগুলোকে বার বার জিগ্যেস করেছি
তারা তোমার কথা কিছু জানে কিনা।
আমি উত্তর পেয়েছি :
'না।'
আকাশ বর্ষণ করছে তুষার।
কোনো পদচিহ্নই এই তুষারে থাকার নয়।

বিড় বিড় ক'রে আওড়াচ্ছে পদ্য···

মানবিক ক্রিয়ার মন্থর অনুধ্যান হল শব্দ,
ভাষা ফুটে বেরোয় খাড়াই বেধ আর বর্ণ নিয়ে।
যেমন একটা গরাস, তেমনি একটা সজোরে ঘা,
আর একটা স্মিত হাসি,
আর শত শত বছর ধ'রে পায়ের পেটানোর আওয়াজ
আর আঙুরলতার একটা হেলে-পড়া ভাব :
 সমস্তই পুনরাবৃত্ত হবে শব্দে।
আমি পুনর্বার এই কালো রাত্রিকে
আমার শাগ্‌রেদ ব'লে স্বীকার করছি।
এই রাত্রে আমি উপলব্ধি করেছিলাম চাঁদের অস্ফুট স্বগতোক্তি।
আর গলা বেয়ে উঠে এসে
একগুচ্ছ শুভ্র শব্দ
এমনভাবে লাল জিহ্বার দিকে যাবার জন্যে
ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি করছিল
যেন তারা আলোর দিকে যাবার জন্যে ব্যস্ত।
এখুনি আমি তারস্বরে চিৎকার করে উঠব :
পেয়েছি! পেয়েছি!
আমি সকলের কাছে রাষ্ট্র ক'রে দিতে চাই!

দর্পণের ছায়ায়
এই চাঁদ গণনা করবে ভাগ্য।
নিক্ষিপ্ত গুলির দূরাগত ঝলকের মত
এই অনচ্ছ আলো
উলঙ্গ ক'রে দেয় আমার মুখ,
বছরের পর বছর সে জ্বালা জুড়োয় না।
আহাম্মকদের কাছে করুণা না চেয়ে,
আক্কেলমন্তদের আদেশ শিরোধার্য না ক'রে
স্তেপ্‌ভূমিতে টো টো ক'রে ঘুরছে শব্দ
যদি দৈবাৎ আমার দেখা পায়।
…বিড় বিড় ক'রে সে আওড়াচ্ছে পদ্য। কুর্দ্‌রা ঠিক এইভাবেই
উচ্চারণ করে তাদের প্রার্থনা।
ধিকি ধিকি আগুনের ছায়া পড়েছে তার গালের হাড়-উঁচু-করা মুখে॥

রে তিমুর খান, লোহায় তৈরি খঞ্জ

আমার আছে দুই তুমেন* সৈন্য
তোমার আছে এক কুড়ি দুই।
চীনা ভিক্ষু মু চিন তাঁর সম্রাটের কাছ থেকে
আমার জন্যে আনছিলেন ভেট।

সোনালি জরি দিয়ে বোনা দুটো গালচে,
দুটো নাকাড়া
আর পান্না-বসানো একটা তরোয়াল।
তুমি পুড়িয়ে ছাই করেছ আলমা-তাউ,
আমার শ্বেতপক্ষ প্রাসাদ লুটিয়ে গেছে ধুলোয়।

---

* তুমেন—হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী

তোমার পল্টনে তুমি জুটিয়ে নিয়েছ আমার লোকজন,
আমার কাছে পড়ে রয়েছে আর মাত্র দু তুমেন।
চীনা ভিক্ষু মু চিন
আমাকে দিয়েছিলেন দুটি নাকাড়া আর তাঁর করুণা।
আমি তাঁকে পুঁতে ফেলার হুকুম জারী করেছিলাম।
তিমুর, যদি সাহস থাকে তো এসো লড়ে যাও,
খোঁড়া কুত্তা, তোমাকে আমি কচু-কাটা করব,
তুমি হলে লোহার তৈরি খঞ্জ,
কিন্তু আমার তরোয়াল ইস্পাতের।
এক খাপে দুটো তরোয়াল
কখনও আঁটে না।
দুই রথী কখনও বাঁচতে পারে না
শান্তিতে।
তোমার চর্বি আমি মাখিয়ে নেব আমার তরোয়ালে,
তোমার চামড়া দিয়ে ঘোড়ার গায়ের চমৎকার ঢাকা হবে।

আমি কালো ঘূর্ণীঝড়ের মত দেখা দেব তোমার জনপদে,
আমার হাঁটু ছাড়িয়ে যারই মাথা উঠবে,
ইতিহাসে তাকেই বিদায় নিতে হবে
টগবগিয়ে ছুটে আমি ধ'রে ফেলব তোমার মেয়ে বুলবুলকে
আমি তাকে ছিনিয়ে এনে
ছাইগাদায় ফেলে
ধর্ষণ করব!

ক্ষেপেছ?
না, বুলবুল—
বিধ্বস্ত আলমা-তাউয়ে আর আমি থাকব না,
দরিদ্রতম পাড়াগাঁয় চলে যাব
আর সেখানে গিয়ে আমার ছোট্ট ক্ষেতি-বাড়িতে করব জোয়ারের চাষ॥

নিউ ইয়র্কে বৃষ্টি

হাওয়া নেই। লোক গিজ গিজ করছে। জুলাই।
কংক্রিটের গায়ে নেই-আঁকড়া বৃষ্টি,
শার্সিতে রাং-ঝালাই করছে লম্বা লম্বা হল্‌দে ফালি।
শহরটা মুখ বুঁজে জল ভাঙছে।
হাঁটুজল হাডসন।
মোড়ে হেলান দিয়ে
মুখ মুচছে শহর।

লোকে যেমন ঘোড়ার দাঁত দেখে,
তেমনি ক'রে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই শহরকে দেখছি।
আমার জানলা আঁচড়াচ্ছে
ঐ সব লম্বা লম্বা হল্‌দে ফালি।
একটু হেঁটে আসা যাক। ব'লে আমি বেরিয়ে পড়ি।
পার্ক এভিনিউতে বৃষ্টি।
আমি তোমাদেব অতিথি।
তোমরা ভিজে গেছ।
আমিও ভিজব।
হাওয়া নেই।
অঝোরে বৃষ্টি।
হাঁটু অবধি জল ঠেলে চলেছি।
কাদাগোলা নদী উঠে আসতে চাইছে
আমার কোলে।
মরুভূমির নদী
ইটের দালানকোঠার মধ্যে ওর বড় একা একা লাগে।
—আমেরিকা!
ও কি তুমি, এইটুকু শিখা,
ছায়াচ্ছন্ন পদতলে?
—আর তুমি স্বয়ং? কে তুমি?

আমি চুপচাপ, গাড়ির লাশগুলোর পেছন দিয়ে
আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি রাস্তা।
হলুদবর্ণ দিন। বৃষ্টি। বালির ঢল।
শেষ পর্যন্ত আমি পৌঁছোই
হোটেলের গাড়িবারান্দায়।
মেয়েদের চিলচিৎকারের মধ্যে
সবেগে হলুদবর্ণ কাদা পেরিয়ে
গাড়িগুলো পৌঁছে যাচ্ছে শক্ত জমিতে।
তারপর হাঁসের মত গা থেকে ঝেড়ে ফেলে জল।
বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টইটম্বুর হাওয়া।
মুষলধারায় বৃষ্টি আমার চোখমুখে
যেন জুতোপেটা করছে।
একটা নীল বেড়াল ঢেউয়ের মতন
জল ছেটাচ্ছে।
রাস্তার হলুদে ঘোলা জলে
নীল সমুদ্রের তরঙ্গ॥



নাজিম হিকমত

নাজিম হিকমতের আরো কবিতা

শোভামল পারেখ—

স্নেহভাজনেষু

নাজিম হিকমত প্রসঙ্গে

উনিশ শো একান্ন কি বাহান্ন সালে কলকাতায়, জানি না কী ক'রে, আমাদের বন্ধু ডেভিড কোহেনের হাতে এসেছিল নাজিম হিকমতের একগুচ্ছ কবিতার ইংরিজি তর্জমা। ইংরিজি খুব উচ্চাঙ্গের নয়। তবু প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। প্রধানত সেই কবিতাগুচ্ছ অবলম্বন ক'রেই বাংলায় বার হয়েছিল আমার 'নাজিম হিকমতের কবিতা'। অনেকে বলেন, এই সময়কার আমার নিজের অনেক কবিতাতেও নাজিম হিকমতের লেখার ছাপ পড়েছে।

তারপর ছাব্বিশ সাতাশ বছর কেটে গেছে। মধ্যে দুবার, ১৯৫৮ আর ১৯৬২ সালে, নাজিম হিকমতের সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। সুন্দর লম্বা দোহারা চেহারা। খুব নিরভিমান দিলখোলা ফুর্তিবাজ মানুষ। ১৯৫০-এর পর থেকেই দেশছাড়া। হাসিখুশির মধ্যেও চোখেমুখে ছায়া ফেলত একটা ক্ষীণ বিষাদ।

নাজিমকে কাছে পেয়েও তাঁর সঙ্গে কখনই আমার সে রকম বাক্যালাপ হতে পারে নি। নাজিম জানতেন ফরাসী আর রুশ। আমি শুধু ইংরিজি। তাছাড়া সম্মেলনের বাঁধা-ধরা আর ভিড়ে-ঠাসা প্রোগ্রাম। ফলে, নাজিমের সঙ্গে আমার হয়েছে শুধুই চোখের দেখা।

নাজিম যা কিছু লিখেছেন সবই তুর্কী ভাষায়। আমার দুর্ভাগ্য, আজ পর্যন্ত তুর্কী ভাষা জানেন এমন কাউকেই হাতের কাছে না পাওয়ায় ইংরিজি তর্জমাই হয়েছে আমার কাছে অন্ধের যষ্টি।

নাজিমকে আমি শেষ দেখি ১৯৬২ সালে মস্কোয়। সেবার আমরা কায়রোয় অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন থেকে ফিরছি। তুরস্ক থেকে বহিষ্কৃত নাজিমকে সেই সম্মেলনে তাঁর দেশের প্রতিনিধি ব'লে মানতে আপত্তি জানিয়েছিল চীনের প্রতিনিধিদল, যার নেতৃত্বে ছিলেন মাও-তুন। সমাজতান্ত্রিক চীন এ কাণ্ড করবে কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। কায়রোয় সেই সময় দেখা নাজিমের চোখ-ছলছল-করা মুখচ্ছবির কথা আমি কখনও ভুলব না।

সেবার মস্কোয় সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের আয়োজিত এক ভোজসভায় কথা-প্রসঙ্গে নাজিম হিকমত বলেছিলেন, 'পরকে আপন আর দূরকে নিকট করার মন্ত্র এ দুনিয়ায় একমাত্র মস্কোরই জানা আছে। এখানে আমার নিজেকে পরদেশী

ব'লে মনেই হয় না। আপনজনের মত এরা ভুলিয়ে দিতে পারে নির্বাসিতের বেদনা।'

নাজিম মারা যান এর ঠিক পরের বছর। ১৯৬৩-র জুন মাসে।

নাজিমের জন্ম ১৯০২ সালে। বড় হন ইস্তানবুলে। ঠাকুর্দা ছিলেন তুরস্কের একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ। কবিতায় নাজিমের হাতেখড়ি হয় যখন তাঁর চোদ্দ বছর বয়স।

প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির দখলে চলে যায় তুরস্ক। ১৯২১ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে নাজিম ইস্তানবুল ছেড়ে গোপনে চলে যান আনাতোলিয়ায়। তারপর সীমান্ত পেরিয়ে বাতুম। সেখান থেকে মস্কো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সঙ্গে সঙ্গে সেইসময় তিনি নানা দেশের লেখক শিল্পীদের সংস্পর্শে আসেন। দেশ স্বাধীন হলে নাজিম তুরস্কে ফিরে এসে এক বামপন্থী পত্রিকায় কাজ করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। তারপর কোনরকমে পালিয়ে সোভিয়েতে চলে যান। ১৯২৮ সালে সব বন্দী ছাড়া পেলে নাজিম দেশে ফেরার অনুমতি পান। দেশে ফিরে নাজিম প্রুফরিডার, সাংবাদিক, চিত্রনাট্যকার এবং অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। দশ বছরে তাঁর ন'টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। তুরস্কের গোয়েন্দা পুলিশ তখনও তাঁর পেছনে লাগা ছাড়ে নি এবং কমবেশি মেয়াদে মোট প্রায় চার বছর তাঁকে জেলে আটক থাকতে হয়। এরপর আবার তিনি গ্রেপ্তার হন ১৯৩৮ সালে ; সৈন্যবাহিনীর লোকদের মধ্যে তিনি নাকি বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়েছেন। নাজিমের কবিতা পড়তে দেখা গেছে তাদের অনেককে—এই সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিয়ে নাজিমকে আটাশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

তেরো বছর জেলে থাকার এই সময়টাতে নাজিম অজস্র কবিতা লিখেছেন। এইসব কবিতা তাঁকে লিখতে হয়েছে জেলকর্তাদের চোখ এড়িয়ে। তারপর গোপনে চালান করতে হয়েছে বাইরে। অস্বাভাবিক ব্যবস্থার দরুন তাঁর বেশ কিছু কবিতা খোয়া গেছে।

১৯৪৯ সালে নাজিম হিকমতের মুক্তির জন্যে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয়। তাতে ছিলেন নেরুদা, পিকাসো, আরাগঁ, সার্ত্র্। দেশে দেশে নাজিমের মুক্তি দাবি ক'রে সভাসমিতি হতে থাকে। কিছুদিন আগে গুরুতর হার্টের অসুখ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫০ সালে নাজিম হিকমতকে আঠারো দিন ধ'রে লম্বা অনশন ধর্মঘট করতে হয়। একই বছরে তিনি পান বিশ্বশান্তি পুরস্কার। শেষে বিশ্ব জনমতের চাপে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে নাজিম জেল থেকে ছাড়া পান। আটচল্লিশ বছর

বয়সেও জোর ক'রে তাঁকে মিলিটারিতে ভর্তি করার চেষ্টা হয়। ফলে, বাধ্য হয়ে আবার তাঁকে গোপনে দেশ ছেড়ে, স্ত্রীপুত্র ফেলে পালাতে হল। শেষের এই তেরো বছর সোভিয়েতে থাকা ছাড়াও পৃথিবীর দেশে দেশে তিনি সমানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। লিখেছেনও বিস্তর।

নাজিম হিকমতের কবিতার সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় তার প্রায় সবটাই ইংরিজি অনুবাদ মারফত। এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। কবিতা বাছাইয়ে আমার কোনো হাত নেই। বাংলায় নাজিম হিকমতের দ্বিতীয় কবিতাগুচ্ছ বার করার ব্যাপারে আমাকে যে দীর্ঘ আটাশ বছর অপেক্ষা করতে হল, তার কারণ এর আগে ইংরিজি অনুবাদে এই কবিতাগুলো আমার হাতে আসে নি।

তুরস্কের এক তরুণ লেখক বন্ধু বছর দুই আগে তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত নাজিম হিকমতের গ্রন্থাবলীর চারটি খণ্ড আমাকে পাঠান। দুঃখের বিষয়, কলকাতায় আজও তুর্কী ভাষা জানা এমন কারো খোঁজ পাইনি আমি যাঁর দ্বারস্থ হতে পারি। ফলে, ইচ্ছে থাকলেও নাজিম হিকমতের কবিতার গভীরে ডুব দেবার আমার শক্তি নেই।

কিছুদিন আগে আফ্রো-এশীয় লেখক সঙ্ঘের 'লোটাস' পত্রিকায় তুর্কী সাহিত্য-সমালোচক মেহ্‌মেৎ দোহান্‌-এর লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ি। আমাদের মতন বিদেশীদের পক্ষে নাজিম হিকমতের কবিতার মর্মগ্রহণে সাহায্য হবে ভেবে দোহান্‌-এর লেখা থেকে কিছু কিছু কথা আমি আমার নিজের ভাষায় পাঠকদের কাছে ছোট ক'রে উপস্থিত করছি :

নাজিম হিকমত তাঁর গোড়ার দিকের এক কবিতায় লিখেছিলেন :

'...শুধু লেখায় আর ছবিতে
আমি ঘুরে বেড়িয়েছি ইউরোপে।
সারা জীবনে নীল ডাকটিকিট লাগানো
এমন একটি চিঠিও আমি পাই নি
যার ওপর আছে এশিয়ার শিলমোহর
আমাদের পাড়ার মুদির দোকানী আর আমি
মার্কিন মুলুকে আমরা দুজনেই সমান অজানা।'

তুরস্কের বাইরে তাঁর নাম তখনও ছড়ায় নি। শেষ জীবনে তুরস্কের এই কবি হলেন জগদ্বিখ্যাত। মাতৃভাষা তুর্কীতে ছাড়া অন্য কোনো ভাষাতেই কখনও তিনি লেখেন নি। এ সত্ত্বেও পৃথিবীর ছোটবড় প্রায় সব ভাষাতেই তাঁর কবিতার তর্জমা হয়েছে।

নাজিমের নিজের বিপ্লবী জীবনের মহিমা আর আন্তর্জাতিক মনুষ্যত্ববোধ—এই দুটি গুণই তাঁর কবিতায় সর্বজনীন আবেদনের সঞ্চার করেছে।

ওপরের সেই একই কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

'...
এ সত্ত্বেও কিন্তু
চীন থেকে স্পেন, অন্তরীপ থেকে আলাস্কা
প্রত্যেকটি জলকাটা মাইলে, প্রত্যেক
কিলোমিটারে আছে আমার দোস্ত আর দুশমন।
বন্ধুরা আমার, কোনোদিনই আমাদের একটিবারও
দেখা হয় নি, তবু একই রুটি, একই স্বাধীনতা—
একই আকাঙ্ক্ষার জন্যে আমরা মরে যেতে পারি।
আমি যেমন আমার দুশমনদের,
দুশমনরাও তেমনি আমার রক্তপিপাসু।
আমার জোর এইখানে যে,
আমি এই বিপুল পৃথিবীতে একা নই।'

এই সাযুজ্যের দরুন নির্জন কারাকুঠুরিতে থেকেও, দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েও, স্ত্রীপুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও নিজেকে কখনও তাঁর একা মনে হয় নি।

এরই ফলে নাজিমের কবিতা অতিক্রম করতে পেরেছে দেশ, কাল আর ভাষার গণ্ডী।

কবিতার অকৃত্রিম কিংবা অবিকল ভাষান্তর কখনও সম্ভব নয়। অনুবাদক শক্তিশালী এবং নিষ্ঠাবান হলে বড়জোর তিনি করতে পারেন অন্যের কবিতাকে নিজের ভাষায় যথাসম্ভব ঢেলে সাজতে। একাজে খানিকটা সুবিধে হয় মূলভাষা জানা থাকলে কিংবা তার খানিকটা আঁচ পেলে। সে সুবিধে না থাকলে কবিতা বাছাইয়ের ব্যাপারেও পুরোপুরি পরনির্ভর হওয়া ছাড়া অনুবাদকের অন্য কোনো উপায় থাকে না।

নাজিমের কবিতায় যে সর্বজনীনতা, তার শিকড় রয়েছে বিশেষভাবে তাঁর স্বদেশেরই মাটিতে। নাজিমের জীবন আর তাঁর কাব্য অভিন্ন। তাঁর কবিতাই তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত। সমসাময়িক তুরস্কের ধারাবিবরণ তাঁর কবিতায়। তাই নাজিমের সব কবিতা কালানুক্রমে সাজালে তুরস্কের ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে উঠবে।

তুর্কী ভাষায় নাজিম হিকমত আধুনিক কবিতার জনক। প্রথাগত ছন্দ ভেঙে তাকে তিনি এনে দাঁড় করান মুখের কথার কাছাকাছি। কবিতায় বাঁধাগৎ ছিল

তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নিজেকে তিনি ক্রমাগত বদলেছেন। তাঁর বলবার কথা থেকেই ফুটে উঠেছে তাঁর বলবার বিচিত্র ধরন। নিজের ভাষার ঐতিহ্যে অবিচল থেকেও অন্য ভাষার সার্থক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে তিনি কখনও দ্বিধা করেন নি।

নাজিম হিকমতের বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত আনাতোলিয়ায়। দেশ আর দেশের মানুষকে তিনি এই প্রথম কাছ থেকে দেখতে শেখেন। তার ফলে, নাজিম হিকমতের কবিতারও রূপান্তর ঘটল। প্রচলিত ছন্দমিলের বন্ধন ঘুচিয়ে তিনি এই সময়েই মুক্তছন্দে, কথা বলার মত ক'রে, প্রথম কবিতা লিখলেন। এইভাবে যখন তাঁর কবিতার নবজন্ম হল তখন তাঁর মাত্র কুড়ি বছর বয়স।

'নাজিম হিকমতের কবিতা'র মত 'নাজিম হিকমতের আরও কবিতা' যদি পাঠকদের ভাল লাগে, তাহলে অনুবাদক হিসেবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

২৯।৪।৭৯ সু. মু.

মাথা উঁচু করে

২১শে সেপ্টেম্বর

আমাদের ছেলেটা অসুস্থ
তার বাপ জেলখানায়
আর তোমার ভারাতুর মাথাটা তোমার ক্লান্ত করতলে—
আমরা ভাগ করে নিচ্ছি সারা পৃথিবীর ব্যথাবেদনা।

মানুষের দৌলতে আর সবাই সুদিনের মুখ দেখবে
কাজেই, ছেলে আমাদের ভাল হয়ে যাবে
তার বাবা জেল থেকে বেরোবে
আর তোমার সোনালি চোখের ভেতরটা আবার হেসে উঠবে
সারা পৃথিবীর ব্যথাবেদনা ভাগ করে নিয়ে।

২২শে সেপ্টেম্বর

আমি একটা বই পড়ি :
তার ভেতরে তুমি
আমি একটা গান গাই :
তার ভেতরে তুমি
আমি বসেছি রুটি খেতে :
আমার মুখোমুখি তুমি।
আমি হাত লাগিয়েছি কাজে :
আমার মুখোমুখি তুমি।
সব জায়গাতেই তুমি আছ
তবু তুমি কিছু বলতে পারছ না আমাকে
আমরা কেউ কারো গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি না—
তুমি আমার আট বছরের বিধবা বউ।

২৩শে সেপ্টেম্বর

ঠিক এই সময়, এখন, এই মুহূর্তটিতে
ঠিক এক্ষুণি সে কী করছে ?

সে বাড়িতে, না কি কোথাও বেরিয়েছে ?
কি করছে, না গা এলিয়ে দিয়েছে, না দাঁড়িয়ে আছে ?
সে কি ওপরদিকে তুলে রেখেছে তার বাহুলতা—
সে আমার প্রিয়তমা
তার এই গতিচ্ছন্দে
হাতের চ্যাটালো কব্জিটা কী দিগম্বর যে দেখায় !

এই সময়, এখন, এই মুহূর্তটিতে
ঠিক এক্ষুণি সে কী করছে ?
কোলে তার এক বেড়ালছানা
তার আদর কাড়ছে ।
হেঁটে চলেছে, আরেক পা মাটিতে পড়বে—
কী সুন্দর দুটি চরণ
যা তাকে নিভৃতে আমার কাছে এনে দিত
যখনই চোখে আমি অন্ধকার দেখতাম ।

কি ভাবছে—
আমার কথা ?
কি তার চিন্তা
(অবশ্য আমি জানি না)
না বিন রাঁধতে এত কেন সময় লাগে ?
বা এও ভাবতে পারে, এত আকছার লোক
কেন এত অসুখী হয়ে থাকছে ?
কিন্তু ঠিক এই সময়, এখন, এই মুহূর্তটিতে
ঠিক এক্ষুণি সে কী করছে ?

২৫শে সেপ্টেম্বর

তারা আমাদের নিয়ে এসে
এখানে জেলখানায় পুরেছে
আমাকে, পাঁচিলের ভেতরে
তোমাকে. পাঁচিলের বাইরে ।

আমার অবস্থা তত খারাপ নয়
তার চেয়েও খারাপ অবস্থা হল :
জেনে হোক, না জেনে হোক
তোমার নিজের ভেতরে জেলখানাকে বয়ে বেড়ানো।
আজকাল বেশির ভাগ লোকেরই এই হাল,
সৎ, কঠোর পরিশ্রমী, ভাল লোক তারা
এবং ঠিক তোমারই মতন তাদেরও ভালবাসা দরকার।

৫ই অক্টোবর

আমরা দুজনে জানি, প্রিয়তমা,
আমাদের শেখানো হয়েছে
কিভাবে অনশনে থাকতে হয়, শীতে কাঁপতে হয়
খেটে খেটে হাড় কালি করে মরতে হয়
একে অপরকে বাদ দিয়ে কিভাবে ভাবতে হয়।
এ পর্যন্ত আমাদের কোনো কারণ ঘটে নি খুন করার
আর খুন হওয়ার ব্যাপারটা
এখনও আমাদের ঘটে ওঠে নি।

তুমি আমি জানি, প্রিয়তমা,
আমরা শেখাতে পারি :
দেশের মানুষের জন্যে লড়তে
আর দিনে দিনে, আরেকটু অন্তর থেকে,
আরেকটু অকপটে
কিভাবে ভালবাসতে হয়।

৬ই অক্টোবর

খবরের ভারী বোঝা নিয়ে মেঘ চলে যায়।
তোমার কাছ থেকে যে চিঠি আজও আমি পাই নি,
হৃদ্‌পিণ্ডাকার অক্ষিপল্লবের কিনারায়
আমি দলা পাকাতে থাকি :
অন্তহীন মাটিতে জো লাগে।

আর আমার খুব চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে
পিরায়ে! ও পি-রা-য়ে!

৯ই অক্টোবর

তোরঙ্গ থেকে বার ক'রে আনো সেই পোশাক
তোমার পরনে আমি যা প্রথমবার দেখেছিলাম,
চুলে গুঁজে দাও সেই লাল ফুল
জেলখানা থেকে আমি যা পাঠিয়েছিলাম
এখন তা যতই শুকিয়ে গিয়ে থাক।
সেজেগুজে সপ্রতিভ হও
ঠিক বসন্তেরই মতন।

এমন দিনে তোমাকে যেন কিছুতেই
ছন্নছাড়া, বিষণ্ণ না দেখায়।
না, কিছুতেই নয়!
আজ এমন দিনে
মাথা উঁচু ক'রে
তোমাকে গট্‌গট্‌ ক'রে হেঁটে যেতে হবে,
নাজিম হিকমতের সহধর্মিণীর গর্ব নিয়ে
তুমি হাঁটবে॥

খালি পায়ে

আমাদের মাথাগুলোকে বেড় দিয়ে সূর্য,
যেন এক জ্বলন্ত উষ্ণীষ;
রাঙা মাটি,
যেন আমাদের পায়ের নিচে দু পাটি খড়ম।

এক বুড়ো চাষী
তার বেতো মাদী ঘোড়ার চেয়েও
যেন ঢের বেশি ঘাটের মড়া
আমাদের কাছেপিঠে
আমাদের কাছেপিঠে নয়
বরং অন্তর্দেশে
আমাদের জ্বালাময় ধমনীতে।

ফতুয়াখোলা কাঁধ
চাবুকছাড়া হাত ;
বিনা ঘোড়ায়, বিনা শকটে
গাঁয়ের দফাদার ছাড়াই
আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি
ভালুক-বাসার মতন গাঁয়ে গাঁয়ে
প্যাচপেচে শহরগুলোতে,
ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড় পেরিয়ে।
রোগা গরুগুলোর চোখের জলধারায়
আমি শুনেছি
পাথুরে জমির কণ্ঠস্বর ;
আমরা দেখেছি সেই মাটি
লাঙলের কালো ফলার মুখে
ফোটাতে পারে নি সোনালি ফসলের সঞ্জীবনী মন্ত্র।
আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি,
না গো !
স্বপ্নচালিতের মত নয়।
আবর্জনার স্তূপ থেকে রওনা হয়ে আরেক আবর্জনার স্তূপে।
আমরা
জানি
একটি দেশের
কী মনোবাসনা।

একজন বস্তুবাদীর
মানসিকতার মতই
স্পষ্টাস্পষ্টি এই চাওয়া,
আর বস্তুতই
এই চাওয়ার মধ্যে
রয়েছে সত্যিকার বস্তু ॥

আমাদের সন্তানসন্ততির প্রতি উপদেশ

দোষ নেই, হোস্ দুরন্ত। ঠিক আছে
উঠে যাবি স্রেফ দেয়াল আঁকড়ে,
চড়বি লাফিয়ে ধুম্বো গাছে।
ঝানু সারেঙের মত পাকা হাতে
তোর সাইকেল হাওয়া যেন কাটে।
যে কলমে ল্যাং খেয়ে মৌলবি
হররোজ হন ব্যাঙের ছবি,
তার খোঁচাতেই উল্টে পড়ুক কোরান।
এ কালো মাটিতে গড়বি বেহেস্ত
তোকে পেতে হবে সেই জ্ঞান।
ক্লাসের পাঠ্য ভূতত্ত্ব করে রপ্ত
ছিপি এঁটে দিবি তার মুখে তুই একদম
যে তোকে বলবে সৃষ্টির মূলে আদম।
পৃথিবীর যে কী কর্ম তা বুঝে নিবি,
হৃদয়ের পটে যেন আঁকা থাকে
চির ভাস্বর পৃথিবী।
যেন ভুলিস নে
যিনি মা তিনিই মাটি।
যে ভালবাসায় মা এবং মাটি একাকার হয়
সে ভালবাসাই খাঁটি ॥

কেটে যাচ্ছে এইভাবে

রয়েছি আমি ছড়িয়ে পড়া আলোর মধ্যে।
দুহাতে বয় প্রাণের বন্যা।
কী সুন্দর যে বসুন্ধরা।
গাছের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা পড়ে না:
কী যে সবুজ পাতা, কিছুতেই আশা মরে না।
মাল্‌বেরিগাছ পেরিয়ে রাস্তা রোদে হাসছে,
জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আছি একলা জেলের হাসপাতালে।
হাওয়ায় নেই ওষুধের সেই তীব্র গন্ধ,
বাগানে কোথাও ফুল ফুটেছে, সন্দেহ নেই।
এমনি করে কেটে যায় দিন, বন্ধু আমার।
ধরা পড়াটা সমস্যা নয়,
দেখতে হবে, যেন না দিই ধরা কিছুতেই॥

লোহার খাঁচায় সিংহ

লোহার খাঁচায় সিংহটাকে দেখ,
ওর দুচোখের মণিতে চোখ রাখো:
ঠিক যেন একজোড়া
তীক্ষ্ণধার ছোরা
ঝিলিক দেয় রাগে।
মান খোয়ায় না, দেমাক ঠিক রাখে
যদিও ক্রোধ বেজায়
এই-আসে আর এই যায়
এই আসে আর এই যায়।

বাঁধন ওকে পরাবে কোন্ ঠাঁই?
ঝাঁকড়া পুরু কেশর ওর গ্রীবায়।

যদিও ওর বেত্রাহত
পাংশু পিঠে
জ্বলছে ক্ষত
ছড়ানো ওর দীর্ঘ দুপায়
ঠিকরে থাকে তাম্র থাবা।
উদ্ধত শির
ঘাড়ের কেশর
গর্বে ফোলায়।
ঠিক তখনি দারুণ ঘৃণা
এই আসে আর এই যায়
এই আসে আর এই যায়।

দেখ আমার ভাইয়ের ছায়া
কারাকক্ষের দেয়ালের গায়
ওপর নিচে
ওপর নিচে
অহোরাত্র ঘুরে বেড়ায়

নির্বন্ধ

সেই কোন্ দূরের এশিয়া থেকে টগ্‌বগিয়ে এসে
মাদী ঘোড়ার মতন
ভূমধ্যসাগরে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে—
এই আমাদের দেশ।
রক্তে কব্জি ডোবানো, দাঁতে দাঁত দেওয়া, খালি পাগুলো
রেশমের গাল্‌চের মতন এই জমিতে—
এই দোজখ, এই বেহেস্ত্ আমাদের।
গোলামির ফটকগুলো বন্ধ করো, আর যেন খুলো না।

এক মানুষ যেন অন্ত মানুষের ভজনা আর না করে—
আমাদের এই নির্বন্ধ।
গাছের মত আল্‌গা হয়ে যে যার নিজের মতন
কিন্তু অরণ্যের মত ভাই-ভাই এক ঠাঁই হয়ে বেঁচে থাকা

—আমাদের এই প্রবল বাসনা॥

আমাদের এই মেতে ওঠা

আমাদের এই মেতে ওঠায় নেই
ক্ষ্যাপা
নারাজ ঘোড়ার
টিপছাপ।
লাইন বেয়ে গড়গড়িয়ে নামলেও
আমাদের মত্ততা
যে-কে সে-ই ইঞ্জিন—
যে তার অয়স্কঠিন মান কখনও খোয়ায় না।
এমনই এক ইঞ্জিন।
প্রত্যেকটা এইটুকু-টুকু ইস্ক্রুপ তাতে আঁটার জন্যে,
বস্তুবাদের দিকে আমাদের মনগুলোকে ফেরাই,
খোলা হয় আর বন্ধ হয় দিনের পর দিন
যাতে বলবিদ্যার জটগুলো ছাড়ানো যায়।
শক্তির হাতে অর্পণ করব বলে আমরা যাকে বড় করেছি
এখন ভূমিষ্ঠ সেই ইঞ্জিন
এই চেতনার দুলাল।
আজ সে এতটাই
আমাদের মত যে—
আমরা যা কিছুই তাকে দিয়ে দলিত মথিত করতে চাই

তার রাস্তায় ফেললে পয়সার মত করে সে পিষে দেবে।
তবে কথা এই,
আমাদের বেঁধে দেওয়া গণ্ডির বাইরে
যদি ক্ষণমাত্রও সে পা বাড়াতে যায়,
তাহলে ভেঙে চুরমার হবে।
ওর আর আমাদের একই গোত্র ;
আমাদের চেতনার অপত্য
ইঞ্জিন ॥

কবির ক্ষণিক কুঁড়েমি

রোদমাখা নীল আড়াআড়ি ভাসতে ভাসতে
ক্রমশ গা ছেড়ে স্থির হয়ে গেল।
সাঁকো বাজাল ঘণ্টা,
পাক খুলে গেল দড়িদড়ার,
আমার দুচোখে নোঙর ফেলল ঘুম।

ভাসা-ভাসা ঘোড়াগুলোর
ভাসা-ভাসা সব সওয়ার
আমার লাল রক্তকণিকাগুলোর ওপর
হঠাৎ হারে-রে-রে ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল
আমার মগজের মধ্যে
ফস্ ক'রে উড়ে গেল ছিপি।
আমার হাতের পেন্সিল
বেড়ে বেড়ে
হল লম্বা
আর মোটা।
তারপর নিল হাতলওয়ালা ঝাঁটার আকার,

আমার হাত তখন হয়ে গেছে এক বুড়ো ঝাড়ুদার.

হাতলে ভর দিয়ে

ঘুমে অকাতর !!!

ধু-

উউ-

উউম

শব্দগুলোর কাঁধে-চড়া রং,

ছাপগুলোর কোলে-বসা আলো—

ওরা ভেসে যায়…

আমার মগজের মধ্যেকার হুকুমনামায় একটাই আদেশ :

কিচ্ছু ক'রো না !!!

অনড়

অচল

খালি পিপের মত আমি ব'সে আছি শূন্য হাতে

কিছু নেই

কিছুই নেই…

না আছে ভালবাসা, না আছে ঘৃণা,

করুণা নেই, দ্বেষ নেই, কিছুই নেই…

কিন্তু হঠাৎ

আমার জঠরে ভেঙেচুরে গেল দ্বিতীয় এক জাপান।

নাক সিঁটকে

জিভ বার করল

ক্ষিধে।

মৃত্যু

যেন হাড়-মড়মড় আওয়াজে

তার হলদে রুমাল নাড়াতে লাগল…

আমি উঠে বসলাম…
আমার চোখের ঘুম
নোঙর উঠিয়ে নিল।
কুয়াশায় মোড়া ঘোড়সওয়াররা
মিলিয়ে গেল।
আমার মগজের হুকুমনামায় সই করেছিল যে সেনাপতি
মুখে চুনকালি মেখে শিবির থেকে সে ভেগেছে।
রাস্তার বুড়ো ঝাড়ুদারটি তার ঝাঁটাটা বাগিয়ে ধরল—
সেইসব লোকদের হাতে তুলে দিল
যারা দুনিয়ার আলাই বালাই
ঝেঁটিয়ে
সাফ করতে চাইছে।

১৯২৩

চলে গেছে

কাঁচের গায়ে রাত্রি আর তুষার।
রেলের লাইন ঝিকমিকিয়ে শুক্লা রজনীতে
তোমাকে মনে পড়ায় চলে যাওয়া
কখনও আর ফিরে না আসার কথা।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়;
শুয়ে রয়েছে রমণী এক
মাথায় কালো ওড়না বাঁধা
পা দুটো তার খালি।
আমি একবার এগিয়ে যাই, আবার ফিরে আসি।

কাঁচের গায়—রাত্রি আর তুষার।
ভেতরে কারা গান গাইছে।

সেই গান যা ভালবাসত
বিদায়-নেওয়া সংগ্রামের সেই সাথী

তারই প্রিয় গান,
তারই প্রিয়,
তারই—

ভাই তোমরা, সরিয়ে নাও চোখ,
এই মুহূর্তে চোখে আমার ফেটে পড়বে জল।
রেলের লাইন ঝিকমিকিয়ে শুক্লা রজনীতে
তোমাকে মনে পড়ায় চলে যাওয়া
কখনও আর ফিরে না আসার কথা।

কালো ওড়না মাথায় কে রমণী
শুয়ে রয়েছে।
তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীক্ষালয় ;
পা দুটো তার খালি।

কাঁচের গায়ে রাত্রি আর তুষার ;
ভেতরে ওরা গান গাইছে কোথাও ॥

বন্দীমুক্তি

হাজার-এক-রজনী বইটা নামিয়ে রাখি।
একটা সিগারেট ধরাই।
গরাদগুলোর ভেতর দিয়ে
তাকালাম বাইরে :
প্রত্যেকটা নক্ষত্র
জলজল করছে
ভানুমতীর আয়নার মত।

রাত্রি।
বায়সা বন্দীশালা।
পাণ্ডববর্জিত দেশের
কালো হ্রদের জল
চল্‌কাচ্ছে।
দোতলায়, "গুমখুন এক"
মাপের
উত্তেজনা;
ছুঁচোলো কালো
টুপিগুলো
ছটফট করছে।

ঠোঁট সাদা,
ভুরুগুলো কোঁচকানো।
দেয়ালের ফাটল চুঁইয়ে
এক ফোঁটা আলো।
অন্ধদের অচলায়তন
বিড় বিড় করতে করতে এগোচ্ছে।
কানার দল
তাদের সেই অন্ধকারে স্বপ্নের দিকে ছুটছে!
"বন্দীমুক্তি!"

ওরা বলছে,
"আমরা বেরিয়ে যাব,
টুপিগুলো মাথায় পরব
একপাশে হেলিয়ে।
পৃথিবী,
রোদ্দুর,
রমণী,
হাওয়া···

নৌকোয় ওঠো, ট্রেনে চড়ো,
ট্রলিবাস নাও!
নেই হাতকড়া,
নেই লাল পাগড়ি—
নিজেদের মর্জিতে,
নিজেরা নিজেরা,
টো-টো ক'রে ঘোরো,
দেখে বেড়াও!
বনজঙ্গলে ঘুমোও, পাহাড় যাও ডিঙিয়ে!
ট্যাঙোস্ ট্যাঙোস্ ক'রে শুধু ঘোরো!"

ছুঁচোলো কালো টুপিগুলো ছটফট করছে!

বিনা স্বপ্নে কয়েদ খাটা অসম্ভব···
তবু আমি···
আমি চোখ তাকিয়ে আছি আর এইখানে এসে হাতের মধ্যে
আমার সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে যায়—
একটিবারও তাতে টান দেওয়া হয় নি।

আমার দেহস্থ কীট

মিনারের মত লম্বা
পাইনের মত গোলগাল
আমার শরীরে ঢুকেছিলে
নরম
সাদা কৃমির মতন
তুমি,
আমাকে কুরে কুরে খেয়েছিলে।
তোমাকে আমি বহন করছি আমার মধ্যে

একজন ইংরেজ শ্রমিক যেমন ক'রে
তার মাইলের পর মাইল জোড়া অন্ত্রে
বয়ে বেড়ায় কৃমিকীট ম্যাকডোনাল্ডকে।[১]

দোষটা কার
আমি অবশ্যই জানি।

শ্রীমতী হে! তোমার আত্মা
লর্ডদের সভাঘর।
তুমি হলে ঘাঘরা-পরা মাকুন্দ পোয়াঁকারে।[২]
আমার সামনে এসে
স্টীম ইঞ্জিনে
লাল গন্‌গনে
এক তাল লোহার মতন
জ্বলতে থাকা
তোমার এক মোক্ষম কৌশল।
আরেক কৌশল তোমার
জমাট বরফে
এক জোড়া স্কেটের মতন
মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে চলা
কন্‌কনে,
গন্‌গনে—
তুমি স্বৈরিণী,
থামো।
তোমার স্বচ্ছন্দ
শ্বেত গতিভঙ্গে
তুমি ঢুকে পড়ছ আমার মগজে।

১ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৮৬৬-১৯৩৭)—বৃটিশ লেবার পার্টির নেতা। প্রধানমন্ত্রী—১৯২৪; ১৯২৯-৩৫।

২ রেমন্দ্‌ পোয়াঁকারে (১৮৬০-১৯৩৪)—ফরাসী প্রধানমন্ত্রী—১৯১২-১৩; ১৯২২-২৪; ১৯২৬-২৯; প্রেসিডেন্ট—(১৯১৩-২০)।

সেখানে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই
তুমি শুষে নিতেও পারবে না।

যে কীট
স্বচ্ছন্দে শ্বেতভাবে
আমার মগজ
ফুঁড়তে চেষ্টা করেছিল—
আমি তাকে টেনে তুলে ফেলেছি।
ঝরঝরে দাঁতের মতন।
আর ঘেমেছি সমানে।
ব্যস্, নাকে কানে খৎ,
এমন আর
কখনও হবে না॥

চানকিরি জেল থেকে চিঠি

ঘড়িতে চারটে,
না তুমি।
পাঁচটা বাজল,
না কিছু।

ছটা, সাতটা,
কাল,
পরশু,
হয়ত বা—
কে জানে···

জেলখানার হাতায়
আমাদের একটা বাগান ছিল।

রোদ-লাগা পাঁচিলের নিচে,
হাত পনেরো লম্বা।

তুমি আসতে,
আমরা পাশাপাশি বসতাম,
তোমার হাঁটুর ওপর থাকত
তোমার মস্ত লাল
অয়েলক্লথের থলি···

'হেড' মহম্মদের কথা তোমার মনে আছে?
সেই যে ছোক্‌রা-ফাইলে থাকত?
চৌকো মাথা,
গোলগাল, বেঁটে বেঁটে পা,
আর হাতের থাবা যার পায়ের পাতার চেয়ে বড়?
যে একজনের চাকের মউ চুরি ক'রে
নোড়া দিয়ে তার মাথার খুলি ছেঁচে দিয়েছিল?
সে তোমাকে ডাকত 'ভালোমানুষের মেয়ে' ব'লে।
তার একটা বাগান ছিল আমাদের চেয়েও এইটুকু
আমাদের মাথার ঠিক ওপরে
সূর্যের কাছাকাছি,
একটা টিনের পাত্রে।

একটা শনিবারের কথা তোমার মনে আছে?
জেলের ফোয়ারার পাশে জলছিটানো
সেই পড়ন্ত বেলা?

টিনের কারিগর শাবান গান গেয়েছিল,
মনে আছে?—

"বেপাত্তারি মোদের নগর, মোদের গেহ
কেউ জানে না কোথায় মোরা রাখব দেহ···"

আমি তোমার কত যে ছবি এঁকেছিলাম,
তার একটাও আমার জন্যে তুমি রেখে যাও নি।
আমার কাছে থাকার মধ্যে আছে একটা ফটোগ্রাফ :
অন্য একটা বাগানে,
খুব নির্বিকার,
খুব সুখী সুখী,
তুমি কয়েকটা মুরগির ছানাকে খাবার দিতে দিতে
খুব হাসছ।

জেলখানার বাগানে মুরগির ছানা ছিল না বটে,
তবু হোহো ক'রে ঠিকই আমরা হাসতাম
এবং আমরা অসুখী ছিলাম না।
সবচেয়ে সুন্দর যে স্বাধীনতা
আমরা কিভাবে তার খবর শুনতাম,
সুখবরের পায়ের শব্দ শোনার জন্যে কিভাবে আমরা
কান খাড়া ক'রে বসে থাকতাম,
জেলখানার বাগানে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে
আমরা কথা বলতাম…

২

একদিন বিকেলে
জেলখানার ফটকের ধারে ব'সে
আমরা পড়েছিলাম গজলীর রুবাই :
"সেই বিশাল নীল বাগিচা
রাতের।
নর্তকীদের ঘুরপাকে চমক দেয় সোনা।
কাঠের বাক্সে মৃতের দল শুয়ে।"
যদি কোনোদিন,
আমার কাছ থেকে দূরে গিয়ে,
ঘোর বৃষ্টির মত

জীবন যদি গুরুভার ঠেকে,
তাহলে আবার গজলীর রুবাইগুলো প'ড়ো
আর, এও জানি,
পিরায়ে আমার,
লোকটার বেদম একাকিত্ব
আর মৃত্যুর মুখোমুখি
মহিমান্বিত ভয়
তোমার শুধু করুণারই উদ্রেক করবে।

বহতা জল তোমার কাছে গজলীকে এনে দিক ;
"—কুমোরের কুলুঙ্গিতে,
রাজাধিরাজ বলতে একটি মাটির পাতিল
আর জয়পত্র লেখা হয়
রাজরাজেশ্বরের বিধ্বস্ত দেয়ালে···"
ঠেলে উঠছে ফোয়ারার মত।
কনকনে
তপ্ত
স্নিগ্ধ।
আর সেই বিশাল নীল বাগিচায়,
অন্তহীন,
নিরবচ্ছিন্ন
নর্তকীদের ঘুরপাক···

কেন জানি না
আমার মাথায় আসছে এই প্রবাদটা,
প্রথম তোমার কাছ থেকে শোনা
চানকিরির সেই লোকমুখে ফেরা বুলি :
"পপ্‌লারের গায়ে আঁশ জাগলে
চেরীফুলের আর দেরি নেই।"
গজলীর রুবাইতে পপ্‌লারের গায়ে আঁশ জাগে

কিন্তু ওস্তাদজী দেখতে পান না।

চেরীফুলেরা আসছে।

তাই তিনি উপাসনা করেন মৃত্যুর।

ওপরতলায়, যন্ত্রে সুর ভাঁজছে 'মিছরি' আলি।
বেলা গড়িয়ে সন্ধে।
বাইরে সবাই গলা ফাটাচ্ছে।
চৌকি-ঘরের আলোয়
বাবলাগাছে বাঁধা তিন নেক্ড়ের বাচ্চা।
গরাদ ছাড়িয়ে,

আমার সেই বিশাল নীল বাগিচা নিজেকে খুলে ধরেছে।

যে টা বা স্ত ব সে টা হ ল জী ব ন…

পিরায়ে, আমাকে ভুলে যেয়ো না…

৩

আজ বুধবার—
তুমি তো জানো,
চানকিরির হাটবার।
এমন কি আমাদের কাছেও তা পৌঁছে যাবে,
লোহার দরজা গলিয়ে বেতের চুপড়িতে :
তার ডিমআণ্ডা, ওলকচু,
তার ময়ূরকণ্ঠী রঙের বেগুন…

কাল
গ্রামগুলো থেকে ওদের আমি নেমে আসতে দেখেছিলাম·
ক্লান্ত,
ছলনাপরায়ণ

আর সন্দিগ্ধ,

ওদের ভুরুর তলায় দুঃখ।

পাশ দিয়ে ওরা চলে গেল—পুরুষেরা গাধার পিঠে,
মেয়েরা গেল খালি পায়ে হেঁটে।
তুমি বোধহয় ওদের কাউকে কাউকে চেনো।
আর আগের দুই বুধবার ওরা সম্ভবত
হাটের চারপাশে খুঁজেছে লাল-ওড়না-পরা
নাকউঁচু-নয় সেই ইস্তানবুলের বিবিকে।

৪

এমন গরম তুমি কখনও দেখ নি,
আর আমি তো সমুদ্রের ধারে মানুষ—
সেই সমুদ্র এখন কত দূরে…

দুটো থেকে পাঁচটা
মশারির মধ্যে
চোখের পাতা না ফেলে
চুপচাপ শুয়ে ঘেমে নেয়ে উঠি
আর সারাক্ষণ শুনতে থাকি মাছিদের ভন্‌ভন্‌।
আমি জানি
জেলের হাতায় এই সময়
দেয়ালে দেয়ালে ওরা ছিটিয়ে দিচ্ছে জল,
লাল গন্‌গনে ইঁটগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে ভাপ।
আর বাইরে, দুর্গের দগ্ধ ঘাস ঘিরে,
পোড়া-ইঁটের শহর
শোরাঘটিত অম্লের আলোয় বসে থাকে…

রাত্রে হঠাৎ একটা হাওয়া উঠে এসে
তারপর হঠাৎ মরে যায়।
আর অন্ধকারে কোনো জ্যান্ত জিনিসের মত হাঁপাতে হাঁপাতে
নরম লোমশ পায়ে চারপাশে ঘুরতে থাকে আগুনের হল্কা,
আমাদের যেন কিসের একটা ভয় দেখাতে থাকে।

আর থেকে থেকে
আমাদের চামড়ায় ভয়-পাওয়া প্রকৃতিকে অনুভব ক'রে
আমরা থর থর ক'রে কাঁপতে থাকি…

একটা ভূমিকম্প হতে পারে।
আমাদের কাছেই মাত্র তিনটি দিনের তফাতে তা ঘটেছে।
সেই বিপদ্ নড়িয়ে দিয়েছে ইয়োজ্‌গাৎকে।
আর এখানকার লোকে বলছে :
নুনের খনির ঠিক ওপরে তৈরি হয়েছে ব'লে
রোজ-কেয়ামতের চল্লিশ রোজ আগেই
চানকিরি শহরটা ধ্বসে পড়বে।

এক রাত্রে বিছানায় শুতে গেলে
কিন্তু পরের দিন সকালে আর তোমার ঘুম ভাঙল না,
তোমার মাথাটা গুঁড়িয়ে গেল কড়িকাঠে।
কী একটা বাজে বিচ্ছিরি চোখের-মাথা-খাওয়া মৃত্যু।
আমি চাই আরও একটু বাঁচতে—
আরও বেশ খানিকটা।
অনেককিছু জিনিসের জন্যে এটা আমি চাই,
অনেককিছু
খুব জরুরী জিনিসের জন্যে।

৫
পাঁচটাতেই অন্ধকার জেঁকে বসে
মেঘগুলো এমনভাবে চড়াও হয়।
ওরা বহন করছে বৃষ্টি এটা স্পষ্ট।
অনেকে
এত নিচে দিয়ে যাচ্ছে যে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।
আমাদের ঘরে জলছে একশো পাওয়ারের আলো
আর দর্জিদের ঘরে কেরোসিনের ডিবে।

দর্জিরা খাচ্ছে গরম লেবু-পানি…
তার মানে শীত এসে গেছে…
আমার ঠাণ্ডা লাগছে।
কিন্তু আমি বিষণ্ণ নই।
এ এমন এক সুখসুবিধে যা শুধু আমাদেরই জন্যে রাখা :
শীতের দিনগুলোতে জেলখানায় থাকা
আর শুধু জেলখানায় নয়
বরং এই বিশাল পৃথিবীতে
যা হওয়া উচিত—
যা নিশ্চয়ই হবে—
উষ্ণ মধুর,
ঠাণ্ডা লাগা
কিন্তু বিষণ্ণ হওয়া নয়…

তারান্তা-বাবুকে লেখা পত্রাবলী

১

তার পিতার পঁচিশতম কন্যা
আর আমার তৃতীয়া স্ত্রী
আমার দুনয়ন, আমার ওষ্ঠাধর, আমার সব কিছু
তারান্তা-বাবু
তোমাকে আমি পাঠাচ্ছি
রোম থেকে
এই চিঠি
এই চিঠিতে শুধু একটা জিনিসই জোড়া থাকছে
সে আমার হৃদয়।
আমার ওপর যেন চটে যেও না
কেননা রাজতুল্য এই শহরে

আমার হৃদয়ের চেয়ে
ভালো কোনো উপহার
আমি খুঁজে পাই নি।

তারান্তা-বাবু
আজ নিয়ে এখানে আমি এই দশ রাত্তির আছি,
আর এ সময়ে সোনার জলে বাঁধানো বই মুখে দিয়ে
আমি বসে আছি
আমাকে তারা বলে
রোমের
জন্মবৃত্তান্ত
আর ঐ যে !···ছিপছিপে নেকৃড়ে বাঘিনী
আর তার পেছনে
মোটাসোটা দিগম্বর রোমুলুস আর রেমুস
আমার ঘরের চারপাশে হেঁটে বেড়ায়।
আহা, তাই ব'লে কেঁদো না ;
এ রোমুলুস
সেই রোমুলুস নয়
নীল রুদ্রাক্ষের বণিক
যে-লোকটা
প্রকাশ্য দিবালোকে
ভাল্-ভালের হাটতলায়
তোমার নাবালিকা বোনকে ধর্ষণ করেছিল।
ইনি হলেন রাজা রোমুলুস, প্রথম রোমক।

* * *

আন্তিয়ুমের ঢালু গা থেকে ধু-ধু করা সমুদ্রের দিকে
যখনই তিনি গর্জে উঠতেন
ঢেউগুলো এ-ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে
দূর কর্সিকার উপকূলে আছড়ে পড়ত।

আর যখনই তিনি তুলে ধরতেন তাঁর হাত
আকাশের দিকে
বজ্রের লম্বা লম্বা ঝুঁটিগুলো পাকড়ে
মাটির ওপর সপাটে ছুঁড়ে দিতেন।
···ভাবখানা, তাঁর বাপ যেন মুষ্টিযোদ্ধা কার্‌নেরা
আর মা যেন ইল্‌ দুচে মুসোলিনি।

* * *

রোমুলুস আর রেমুস
সিল্‌ভিয়ার যমজ ছেলে
ভেনাসের নাতিপুতি···
ওদের
চোখের জল
গায়ে না মেখে
একদিন অন্ধকার রাত্রে
মা ওদের ফেলে রেখে চলে গেল
না দিয়ে গেল
ওদের মাথায়
কোনো শিরোমাল্য
না তাদের পরনে কোনো ভদ্রগোছের কটিবাস।
সে কালে, তারান্তা-বাবু,
আমাদের স্বদেশভূমি ইথিওপিয়া
পরের হাতে চলে যায় নি।
তার গায়ে পড়ে নি ঔপনিবেশিক সবুজের পোঁচ ;
রোমের যে ব্যাঙ্ক, তখনও তার পত্তন হয় নি।
সুতরাং রোমুলুস আর রেমুস
একদিন খুব ভোরে উঠে
নিজের মনে ভাবল :
'এ জায়গায় পড়ে থেকে
আমরা
কী ছাই করব!'

তখন তারা বেরিয়ে প'ড়ে এক নেকৃড়ে-বাঘিনীকে দেখতে পায়,
তার ছানাগুলোকে মেরে ফেলে
পেট পুরে খেয়ে নেয় তার দুধ
এবং তারপর গায়ে ফুঁ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে
এক সময়ে পত্তন করে

এই নগর, রোম।

পত্তন তো হল, কিন্তু
ওঁদের দুজনের পক্ষে
রোম হল নিতান্তই ছোট।
কাজেই, একদিন সন্ধেবেলায়

ভাইয়ের ঘাড়ে

মাঝখানের পাঁচিল ডিঙোবার দোষ চাপিয়ে
রোমুলুস তার ভাই রোমুসের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিল।
এইসব সোনার জলে বাঁধানো বইগুলোতে,
তারাস্তা-বাবু, এইসব লেখা আছে :
রোমের ভিত্তিমূলে

রয়েছে

এক নেকড়ে-বাঘিনীর কেঁড়ে কেঁড়ে দুধ
আর এক ভাইয়ের এক আঁজলা রক্ত।

তোমার গলায়
এক নীল বাঁদরের দাঁত দিয়ে তৈরি

তিন-নরী হার ;

আকাশের তলায় তুমি থাকো

যেন লাল-পালকওলা পাখি

কিংবা স্রোতস্বতীর মত ছুটে বেড়াও মাটিতে—
তোমার কথাগুলো আমার

তোমার চোখদুটো আমার

তোমার দর্পণে আমার ছায়া,
আমার তৃতীয় কন্যার জননী তুমি

আমার পঞ্চম পুত্রের জননী তুমি
তারান্তা-বাবু!

আজ মাসের পর মাস
আমি সমানে কড়া নেড়েছি প্রত্যেকটি দরজায়
রাস্তা ধ'রে ধ'রে
বাড়ি ধ'রে ধ'রে
পদে পদে
রোমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
আমি হন্যে হয়ে খুঁজেছি রোমকে।

আর সেই
ওস্তাদ শিল্পীরা
রেশমী সুতোর মতন কাটে না মর্মর;
ফ্লোরেন্স থেকে বয়ে আসে না কোনো হাওয়া;
দান্তে আলিগিয়েরির কবিতা নেই
নেই বিয়াত্রিচের ফুলকারি-করা মুখচ্ছবি
না আছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মাথায় ক'রে রাখার মত হাত
জাদুঘরগুলোতে পায়ে-বেড়ি-পরানো কেনাগোলাম
মিকেলাঞ্জেলো
আর ক্যাথিড্রালের দেয়ালে
আকণ্ঠ ঝুলছেন পাণ্ডুরোগাক্রান্ত রাফায়েল।

ইদানীংকালে,
রোমের লম্বাচওড়া যে রাজপথ
তার শানবাঁধানো পাড়ে ঠেস দিয়ে
ফাঁসি-দণ্ডের মতন খাড়া
একমাত্র একটি কালচিটে
একটি রক্তের ছোপ-ধরা ছায়া,
প্রতি পদে
একটি ক'রে ক্রীতদাসের
মুণ্ডু ঘচাং,

প্রতি পদে

একটি ক'রে কবর অশুচি ক'রে

চলে যাচ্ছে—

এই ছায়ামূর্তি সীজার।

রোমা

'কো ভাদিস্ রোমা ?' 'কোথায় চলেছ, রোম ?'

জিগ্যেস ক'রো না।

ঠিক আমাদের দেশে যেমন

এখানেও মাটি সিক্ত করছে একই সূর্য···

কিন্তু চুপ, তারান্তা-বাবু

ভালবেসে

আর শ্রদ্ধায়,

এই নিঃশব্দে,

এই হো-হো ক'রে হেসে,

চুপ !

একবার কান পেতে শোনো :

রোমের উপকণ্ঠে

স্পার্তাকুসের শিকল

ঝন্‌ঝন্ ক'রে ভাঙছে।

৩

পোপ একাদশ পিয়ুস-কে,

তারান্তা-বাবু,

আজ দেখলাম।

ঠিক যেমন আমাদের আছে, আমাদের উপজাতিতে,

চাঁই-গুনীন,

এখানে, এদের ইনি।

তবে,

তফাত এই :

তিন মাথাওলা

নীল ভূতকে ঝেড়ে
হারার-পাহাড়ে চালান ক'রে দিতে
আমাদের গুনীনকে পয়সা দিতে হয় না ;
তার পাওনা উশুল হয়
উৎসর্গ-করা বুনো মাদী-ঘোড়ায়
আর বছরে দু বস্তা হাতির দাঁতে।
কিন্তু এই সাধুপুরুষ পোপ
সে জিনিস আশা করতে পারেন না
বুনো মাদী-ঘোড়াগুলোর কাছ থেকে।
এই চড়া-দরের ভদ্রলোক নিযুক্ত করেন
সোনার ক্রসের ফুলকারি-করা
কালো জোব্বা-পরা দূতদের ;
নিযুক্ত করেন নিম্নাঙ্গে চুস্ত্, পায়ে চকমকে চামড়ার পটি
লাগানো সেপাই—
তারা তাঁর আর তিনি তাদের
হাতের দিকে নির্নিমেষে তাকান।
এই রম্য ইতালির একজন মুক্ত নাগরিক,
এক স্ত্রীলোক
নিগমবদ্ধ উত্তেজনায় যে তার ওষ্ঠাধর বিকিয়ে দেয়
আর চিৎ হয়ে পড়ে থাকে আধঘণ্টা আধ-লীরায়,
ঐ পয়সার অর্ধেক দিয়ে কেনে
এই সাধুপুরুষটির একটা ছোট্ট ছবি,
তার বিছানার শিয়রে টাঙিয়ে রাখে
যাতে তার সমস্ত পাপ তিনি মার্জনা করেন।

তাঁর দিকে আমি তাকালাম :
সেণ্ট জর্জ কিংবা
সেণ্ট পিটারের মতন তিনি নন,
ওঁদের কারো চোখেই সোনা দিয়ে বাঁধানো চশমা ছিল না।
বরং থাকার মধ্যে ছিল না-আঁচড়ানো

লম্বা
তেল্‌তেলে দাড়ি।
একাদশ পিয়ুস, তারান্তা-বাবু, যেন একজন রাখাল
তুলতুলে পশমওলা কালো ভেড়ার পাল নিয়ে
মুকুট-পরা বা মুকুটহীন রাজাদের প্রেতগুলোকে
যেন তৃণভূমিতে চরাচ্ছে।

কুমারী মেরীর নিকটতর হওয়ার জন্যে
পিতৃব্যতিরেকে নাদার মধ্যে জন্মানো
অদ্বিতীয়ের দূত
যিনি
সেই পিয়ুস একাদশ
তাঁর দেহকে পীড়ন করেন,
আর প্রতি রাত্রে
মর্মরের স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদে নিদ্রা যান।

৪

রেশমী শালগুলোর কশিদা-করা প্রত্যেকটি নক্সায় সূর্য
পম্পেইয়ের রাস্তায় কালো খচ্চরগুলোর খুরধ্বনি ;
ব্যারেল-অর্গানের রংচঙে বাক্সের মধ্যে
ভের্দি-র স্পন্দিত হৃদয় ;
আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মাকারোনি…
এর মতই, তারান্তা-বাবু,
ফ্যাসিজম্‌-এর জন্যেও ইতালির খুব নামডাক॥
এমিলিয়ার বড় বড় কাউন্টের জমি থেকে
আর রোমান ব্যাঙ্কারদের
স্টীলের সিন্দুক থেকে
সাঁ ক'রে বেরিয়ে
এই ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এসে ঘা মেরেছে

ইল্ হুচে-র টেকো মাথায়
একটা আলোর ভাব নিয়ে।
একটা আলো,
তারান্তা-বাবু।
যা দেখতে দেখতে অবতরণ করবে
ইথিওপিয়ার
প্রান্তরে প্রান্তরে
কবরখানার পর কবরখানায়।

৫

দেখা
শোনা
ছোঁয়া
ভাবা
বলা
না থেমে ছোটা
ছুটে যাওয়া
ওঃ, ছুটে যাওয়া
তারান্তা-বাবু
হি হি হি!
মরুকগে যাক এসব
কী সুন্দর
জিনিস
এই বেঁচে থাকা।
আমাকে মনে করো
তোমার প্রশস্ত নিতম্ব বেষ্টন করে আছে আমার হাত
আমার তিন সন্তানের জননী তুমি,
ভাবো আবেগের সঙ্গে,
কষ্টিপাথরে ঝরে পড়া
একটি উদোম জলবিন্দুর আওয়াজের কথা।

যে ফল তোমার সবচেয়ে প্রিয়
তার শাঁসের কথা
তার রঙের কথা ভাবো,
লাল টকটকে সূর্য,
গাঢ় সবুজ ঘাস
আর চাঁদ থেকে ফুটে বার হওয়া
নীল সুনীল প্রকাণ্ড কিরণ
তোমার দৃষ্টিতে আস্বাদনের কথা ভাবো।
ভাবো, তাবান্তা-বাবু :
মানুষের
হৃদয়
মন
আর বাহু
ভূপৃষ্ঠের সপ্তম তলদেশ থেকে
তুলে এনেছে
আর গড়ে তুলেছে কত যে অগ্নিচক্ষু, অয়স্পাত্রী দেবতা
যারা আজ একটি মাত্র ঘা দিয়ে
দুনিয়াকে ভেঙে গুঁড়ো কবে দিতে পারে ;
যে ডালিমগাছে বছরে ফল হয় একটি
তাতে হতে পারে হাজারটা ;
আর পৃথিবীটা কত বড়
কী সুন্দর
আর উপকূলগুলো কী অপার
রাত্রে স্বচ্ছন্দে আমরা বালির ওপব শুয়ে থেকে
নক্ষত্রখচিত জলরাশির শব্দ শুনতে পারি।
কী যে অবাক-করা ব্যাপার এই বেঁচে থাকা,
তারান্তা-বাবু,
জীবন যে কী আশ্চর্যের।
এ জিনিসটাকে সেরা শিল্পকর্ম হিসেবে বোঝা
প্রেমের গান হিসেবে শ্রুতিগোচর করা

শিশুর মতন বিস্ময় নিয়ে বাঁচা

জনে জনে

কিন্তু সকলে একসঙ্গে হয়ে

বেঁচে থাকা

যেমন ক'রে বোনা হয় পরমাশ্চর্য রেশমের থান।

ইস্, বেঁচে থাকা···

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, তারান্তাবাবু,

ইদানীং

'এই অসম্ভব সুন্দর সৃজনকর্ম'

সবচেয়ে আনন্দময় এই সর্বভূতের অনুভব

হয়ে পড়েছে

কী কষ্টকর

কী অনুদার

কী লাথিঝাঁটা খাওয়া

মান খোয়ানোর ব্যাপার কী বলব।

৭*

আমি বিলক্ষণ জানি

তোমার মনের খোপগুলোতে

ছিপি-আঁটা একসার বোতলের মতন দাঁড় করানো

অনধিক ছ'টি হেঁয়ালি···

সরকারী হর্তাকর্তাবিধাতার মতই তুমি

লাগামছাড়া গোমুখ্যু!

এতৎসত্ত্বেও

ধরো তোমাকে আমি জিগ্যেস করলাম:

'কী করবে তুমি

যদি

আমাদের বক্‌রিগুলো খুইয়ে ফেলে তাদের কোঁকড়ানো লম্বা লম্বা লোম;

* ৬নং অংশটি সম্পূর্ণ গদ্যে ব'লে ইংরেজি তর্জমায় বর্জিত।

তাদের দুই বোঁটার স্তন থেকে
আলোর বাহুযুগলের মত
নিঃসৃত দুধের ধারা
হঠাৎ যদি রুদ্ধ হয় ;
সুয্যিঠাকুরের ছানার মতন
আমাদের দেশের কমলালেবুগুলো
ডালে ডালে যদি শুকিয়ে যেতে থাকে ;
আর আমাদের ভূখণ্ডের দেশীয় রাজার মত
অস্থিসার পায়ে
দুর্ভিক্ষ যদি হাঁটতে শুরু করে—
তবে তুমি করবে কী ?'

আমাকে তুমি তখন বলবে,
'ফোঁটা ফোঁটা ক'রে আমার রং খুইয়ে
আমি নিজেই তখন বিলীন হতে থাকব,
সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়লে
যেমন মিলিয়ে যায়
নক্ষত্রময় রাত্রি—
আমার মতন একজন আফ্রিকার রমণীকে
বলিহারি প্রশ্ন !
আমাদের কাছে দুর্ভিক্ষ মানে অমোঘ মৃত্যু ;
অগাধ, অপার আনন্দ।'

কোন্‌দেশী প্রাজ্ঞতা এটা, তারাস্তাবাবু,
এর ঠিক বিপরীত এই ইতালিতে।
লোকে ফোত হয় প্রাচুর্যের সময় :
লোকে বাঁচে দুর্ভিক্ষ এলে।
রোমের শহরতলীতে
রুগ্ন, ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত মানুষ হেঁটে বেড়ায় ;

কিন্তু গোলাগুলো আগল-দেওয়া, কুলুপ আঁটা
যদিও তারা আকণ্ঠ ফসলে ঠাসা !
এখান থেকে সূর্য অবধি
সারা পথ মুড়ে দেওয়ার মত রেশমী চাদর
বুনবার ক্ষমতা রাখে তাঁতগুলো,
তবু রাস্তায় লোকের পায়ে জুতো নেই,
পরনে ছেঁড়া উলিঝুলি জামাকাপড়
কী এক ধাঁধায় ভরা জগৎ !
ব্রেজিলে যখন মাছদের খাওয়ানো হচ্ছে কফি
এখানে দুধ জুটছে না বাচ্চাদের···
মানুষকে ওরা কথা গেলায়,
শুয়োরকে দেয় বাছা-বাছা আলু !

৮

মুসোলিনি বড় বেশি বক্‌বক্‌ করে, তারান্তাবাবু।
নিজের খেয়ালে
বন্ধুহীন অবস্থায়
যেন কোনো কচি খোকাকে
ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে ঘোর অমানিশায়।
সপ্তমে গলা চড়িয়ে
আর নিজের কণ্ঠস্বরেই ধড়মড়িয়ে উঠে
ভয়তরাসে কখনও জলে উঠছে
কখনও দগ্ধ হচ্ছে,
বকবকানির কামাই নেই !
লোকটা বড় বেশি বক্‌বক্‌ করছে, তারান্তাবাবু।
কারণ
ভয়ে ওর আত্মারাম খাঁচাছাড়া

৯

(এই চিঠির একেবারে গোড়ায় একটি বেতারযন্ত্রের ছবি।)

আজ কী একটা জিনিস আমার মনে হয়েছিল

একটা ছবি

রেখাবিহীন

কথাবিহীন, তারাস্তাবাবু।

আর অকস্মাৎ

আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করল,

তোমার মুখ নয়

তোমার চোখ নয়

দেখতে ইচ্ছে করল তোমার গলার স্বর, তারাস্তাবাবু।

নীল নদীর জলের মত স্নিগ্ধ,

বাঘের আহত চোখের মত গভীর

তোমার গলার স্বব।

(চিঠির এক জায়গায় খবরের কাগজের একটা কাটিং জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা আছে :

ইল্ ডুচের বশম্বদ সেপাই

প্রকাশ, মারকনি আজ একদল সাংবাদিককে বলেন যে, তিনি হলেন তাঁর নেতা মুসোলিনীর আজ্ঞাবহ। লোকমুখে শোনা যায়, মারকনিব নবোদ্ভাবিত এক ধরনের মারণ-রশ্মির কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে অবিলম্বে তা ইথিওপিয়ায় নিয়ে গিয়ে হাতেকলমে প্রয়োগ করে দেখা হবে।...এই রশ্মি')

সেই তাঁর

যিনি গলার স্বরগুলোকে মুক্তি দিয়েছেন

অন্তরীক্ষে

নীল ডানাওয়ালা পাখির মত;

হাত দিয়ে তিনি চয়ন করেছেন
মধুরতম সব সঙ্গীত
আকাশ থেকে পাড়া পাকা ফলের মতন—
কিন্তু আজ তিনি
কালো কুর্তা-পরা বেনিতোর কেনাগোলাম
কলঙ্কিত করতে চলেছেন কনুই অবধি তাঁর হাত
আমার ভাইবেরাদারের রক্তে।
মালুম হচ্ছে, ইথিওপিয়ার মৃত্তিকায়
শ্রীল শ্রীযুক্ত মার্কনি
সওদাগরী অধিকোষের
অংশীদার
সাত অঙ্কের বহু লক্ষপতি
হত্যা করবেন বড় বৈজ্ঞানিক মার্কনিকে।

১০

(এ চিঠিরও গোড়ায় খবরের কাগজের একটা কাটিং। তাতে লেখা: 'বর্ষার মরশুম শেষ ক'রে বসন্তকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইথিওপিয়ার ওপর চড়াও হওয়ার জন্যে ইতালির সেনাদল অপেক্ষা করে আছে।')

এ বড় অদ্ভুত, তারান্তাবাবু,
আমাদের নিজের জমিতে আমাদেরই কোতল করবে ব'লে
ওরা ব'সে ব'সে দিন গুনছে
কবে মঞ্জরিত হবে আমাদের বসন্ত।
এ বড় অদ্ভুত, তারান্তাবাবু।
এ বছর আফ্রিকায়
বর্ষার শেষ,
দেবলোক থেকে আসা সুরের মত
যাবতীয় রং আর গন্ধের
সমাগম—
গ্যালা থেকে আসা তামার বরণ রমণীর মত

সূর্যের নিচে প্রসার্যমান আর্দ্র মাটি—
এ সমস্ত কিছুই আমাদের এনে দেবে মৃত্যু
যে সময়ে যুগপৎ
জেগে উঠছে তোমার মধুময় বক্ষস্থল।
এ বড় অদ্ভুত, তারান্তাবাবু।
মৃত্যু
তার ঔপনিবেশিক টুপিতে
একটা বাসন্তী ফুল গুঁজে
আমাদের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে।

১১
আজ রাতে
ইল্ দুচে
একটা ধুসর ঘোড়ায় চেপে
বিমান বন্দরে
৫০০ বিমান-চালকের সভায়
বক্তৃতা ঝাড়লেন।
ব্যস্, কাজ শেষ।
রাত পোহালেই
ওরা সব উড়ে যাবে আফ্রিকায়।
উনি অবশ্য নিজে
তাঁর প্রকাণ্ড প্রাসাদে বসে
এখন সাঁটাচ্ছেন স্প্যাগেটি দিয়ে বোলোনিয়ার কাবাব।

১২
ওরা আসছে তারান্তাবাবু,
ওরা আসছে তোমাকে মেরে ফেলতে,
তোমার পেট ফুটো ক'রে দেখতে
ক্ষুধিত সরীসৃপের মত
বালির ওপর মোচড়-দেওয়া

তোমার অস্ত্র।
ওরা মেরে ফেলতে আসছে, তারান্তাবাবু,
তোমাকে আর তোমার বকৃরিগুলোকে
একই সঙ্গে মারতে।
তা হলেও, ওদের তুমি চেনো না
আর ওরাও তোমাকে চেনে না ;
এমনও নয় যে, তোমার বকৃরিগুলো
বেড়া টপ্‌কে ওদের বাগানে ঢুকেছে।

ওরা আসছে তারান্তাবাবু,
কেউ নেপ্‌ল্‌স্‌ থেকে
কেউ তিরোল থেকে
ছিনিয়ে আনা হয়েছে কাউকে প্রেমবিগলিত চাহনি থেকে
কাউকে বা
নরম উষ্ণ হাতের
স্পর্শ থেকে।
স্থলবাহিনী হোক
অশ্বারোহী হোক
বৈমানিকের দল হোক
জাহাজের পর জাহাজ
তিন তিনটি বিশাল দরিয়া পেরিয়ে
একের পর এক সৈন্যকে এনে তুলেছে
যমের দুয়োরে,
যেন তারা চলেছে বিয়ের ছাঁদ্‌নাতলায়।

ওরা আসছে, তারান্তাবাবু,
যেন এক জলদগ্নির অন্তস্তল থেকে ;
আর তোমার মাটির বাড়ির
খোলার চালের ওপর
একবার নিশান উড়িয়ে দিয়েই

ওরা সবাই হয়ত ফিরে যাবে—
কিন্তু তৎসত্ত্বেও
তোরিনোর লেদের মিস্ত্রি
সোমালিয়াতে যাকে খোয়াতে হয়েছে তার ডান হাত
তাকে দিয়ে আর কখনই হবে না ইস্পাতের রডের কাজ
যা সে একদিন একগাঁট রেশমী সুতোর মতন নাড়াচাড়া করত।
আর সিচিলির সেই জেলে
আর কখনই দেখতে পাবে না সমুদ্রের আলো
তার অন্ধ-হয়ে-যাওয়া চোখদুটো দিয়ে।

ওরা আসছে, তারান্তাবাবু,
মরতে আর মারতে আসা এই লোকগুলো
অবিলম্বে বেঁধে দেবে টিনের ক্রস
তাদের রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজে
যে মুহূর্তে তারা ঘরে ফিরে যাবে।
তারপর,
বিরাট এবং ন্যায়পরায়ণ রোম নগরীতে
শেয়ারের দাম চড়চড় ক'রে বাড়বে, ব্যাঙ্কগুলো শাঁসেজলে হবে
এবং আমাদের নতুন প্রভুরা সৈন্যদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে
মৃতদের সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নেবে।

শেষ চিঠি

ইতালিতে শ্রমিকের মজুরি

একজন ইংরেজ শ্রমিকের আনুপাতিক মজুরি যদি ১০০ ব'লে ধরে নেওয়া যায়। তাহলে:

আমেরিকা	১২০
কানাডা	১০৬
ইংলণ্ড	১০০
আয়ার্ল্যাণ্ড	৮০

নেদারল্যাণ্ডস্	৭২
পোল্যাণ্ড	৫০
স্পেন	৩০
ইতালি	২৯

ইতালিতে বেকার এবং দেউলিয়া অবস্থা

	বে	দে
১৯২৯	৩০০,৭৮৬	২,২০৪
১৯৩০	৪২৫,৪৩৭	১,২৯৭
১৯৩১	৭৩১,৪৩৭	১,৭৮৫
১৯৩২	৯৩২,২৯১	১,৮২০

এই পরিসংখ্যানটি হল, তারান্তাবাবু, ইতালীর ফাশিজ্‌মের জাব্‌দাখাতা।' আগামী বছরগুলোতে কী ঘটবে? আমাদের দেশের মাটিতে মরতে এসেছে যে নওজোয়ান সৈনিকের দল, এর উত্তর রয়েছে তাদের কাছে।

১৯৫৩

ইথিওপিয়ার গ্যালা প্রদেশে থাকত রোমপ্রবাসী এক তরুণ ইথিওপিয়ানের স্ত্রী তারান্তা-বাবু। এই কবিতাগুচ্ছ যেন সেই স্ত্রীর কাছে তার লেখা কয়েকটা চিঠি। পশ্চাৎপটের কাহিনীটি হল এই: হিকমতের এক ইতালিয়ান বন্ধু তাঁকে লেখেন যে রোমের গরিব পাড়ায় ঘর ভাড়া করতে গিয়ে তিনি ল্যাণ্ডলেডির কাছে শোনেন তাঁর ঠিক আগেই ঐ ঘরে থাকত ইথিওপিয়ার এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ। 'সে এখন কোথায়?' 'তোমাকে বলা ঠিক হবে কিনা জানি না·· পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে।' হিকমতের সেই ইতালিয়ান বন্ধু আলমারির ড্রয়ার ঘেঁটে ইথিও-পিয়ান ছেলেটির নিজের ভাষায় লেখা একতাড়া চিঠি পান। চিঠিগুলো লিখলেও কখনও সে ডাকবাক্সে ফেলে নি। হিকমতের বহুভাষাবিদ্ ইতালিয়ান বন্ধুটি সেইসব চিঠির অনুবাদ ক'রে তুরস্কে হিকমতের কাছে পাঠিয়ে দেন। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পর মুসোলিনীর অনুচরেরা খুব সম্ভবত ইথিওপিয়ান ছেলেটিকে গুলি করে মারে।

প্রাহায় সকাল

প্রাহায় আলো ফুটছে
আর বৃষ্টির সঙ্গে
সীসের মত ভারী
তুষার।
প্রাহায় আস্তে আস্তে আলোকিত হয় ব্যারক :
অস্বচ্ছন্দ, দূরগত,
শোকমলিন তার গিল্টি।
চতুর্থ চার্ল্‌স্ সেতুর ওপর পাথরের মূর্তিগুলো
মৃত নক্ষত্র থেকে নেমে আসা পাখিদের মত।

প্রাহায় প্রথম ট্রলিবাস ডিপো থেকে ছেড়ে গেছে,
জানলায় জানলায় হল্‌দে উষ্ণ আলো।
কিন্তু আমি জানি
ভেতরটা বরফের মত ঠাণ্ডা :
প্রথম যাত্রীর নিশ্বাসে ভেতরটা এখনও উষ্ণ নয়।
প্রাহায় পেপিক খাচ্ছে তার দুধ-দেওয়া কফি,
সাদা রান্নাঘরে ঝকঝক করছে কাঠের টেবিল।
প্রাহায় আলো ফুটছে
আর বৃষ্টির সঙ্গে
সীসের মত ভারী
তুষার।

প্রাহায় টগবগিয়ে পেরিয়ে যায়—
এক ঘোড়ার একটা মাল-টানা গাড়ি—
ইহুদীদের কবরখানার সামনে।
অন্য কোনো শহরের আকুল আকাঙ্ক্ষা চাপানো গাড়ি,
আমি তার কচুয়ান।
প্রাহায় আস্তে আস্তে আলোকিত হয় ব্যারক :

অস্বচ্ছন্দ, দূরগত,

শোকমলিন তার গিৰ্জা।

প্রাহায় ইহুদীদের কবরখানায় রুদ্ধশ্বাস, নিঃশব্দ মৃত্যু।

ও আমার গোলাপ, ও আমার গোলাপ

মৃত্যুর চেয়েও খারাপ নির্বাসন···

২০।১০।১৯৫৬

একটা চিঠিতে মুনেভার আমাকে এই কথা লিখেছিল :

নাজিম, আমি যে শহরে জন্মেছি তার কথা আমাকে বলো।
যখন আমি সোফিয়া ছেড়ে যাই তখন আমি খুব ছোট,
কিন্তু শুনতে পাই আমি তখন বুলগেরিয়ান জানতাম···
সোফিয়া শহরটা কী রকমের ?
আমার মার কাছে শুনতাম
সোফিয়া ছিল এইটুকু,
এখন নিশ্চয় বড় হয়েছে—
ভাবো
মধ্যে একচল্লিশটা বছর।
তখন ছিল এক 'পার্ক বারিস'।
আমার ধাইমা আমাকে সেখানে নিয়ে যেতেন সকালে।
ওটাই নিশ্চয় সোফিয়ার সবচেয়ে বড় পার্ক।
পার্কে তোলা আমার ছবি এখনও আমার কাছে আছে।
সেখানে যেমন প্রচুর রোদ আর তেমনি প্রচুর ছায়া।
তুমি সেখানে গিয়ে একবার ব'সো।
হয়ত যে বেঞ্চির চারপাশে আমি খেলতাম সেটা তোমার চোখে পড়বে।
তবে বেঞ্চির আয়ু কখনই চল্লিশ বছর হবে না,
এতদিনে নিশ্চয় ঝরঝরে হয়ে গিয়ে কলেবর পাল্টেছে।
গাছই সবচেয়ে ভালো।

স্মৃতির চেয়েও গাছ বেশিদিন থাকে।
সবচেয়ে পুরনো চেস্টনাট গাছের নিচে গিয়ে একদিন ব'সো।
সব কিছু ভুলে গিয়ে।
এমনকি আমাদের এই বিচ্ছেদও,
শুধু আমার কথা ভেবো।

১৯৫৭

মুনেভারকে এই ব'লে চিঠি লিখেছিলাম :

গাছগুলো দাঁড়িয়ে, পুরনো বেঞ্চিগুলো ম'রে ভূত।
'পার্ক বারিস' এখন হয়েছে 'স্বাধীনতা উদ্যান।'
চেস্টনাট গাছের তলায় এইমাত্র তোমার কথা মনে হল,
কেবল তুমি, আমি বলতে চাইছি মেমেৎ,
কেবল তুমি আর মেমেৎ, আমি বলতে চাইছি আমার দেশ···

১৯৫৭

মুনেভার—নাজিমের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

বর্ হোটেল

ভার্নায় রাত্তিরে কিছুতেই তোমার ঘুম হবে না
কিছুতেই ঘুম হবে না :
আকাশে তারার প্রাচুর্যে,
তারাগুলো বড় বেশি কাছে ব'লে, বড় বেশি জ্বল্‌জ্বল্ করে ব'লে,
বালিয়াড়িতে মৃত ঢেউগুলোর ঝিরঝির শব্দে,
মুক্তোর মত ঝিনুক
আর নুড়ির সঙ্গে
লবণাক্ত লতাপাতার মর্মরধ্বনিতে,

সমুদ্রে হৃদয়ের মত স্পন্দমান মোটরবোটের আওয়াজে,
আমার ঘর ভরিয়ে তোলা স্মৃতিতে,
বস্‌পরাসের ভেতর দিয়ে আসা
আর আমার ঘর ভরিয়ে তোলা
ইস্তানবুলের স্মৃতিতে,
কারো হরিৎ নয়ন,
কারো হাতে হাতকড়া,
কেউ হাতে ধ'রে আছে রুমাল,
সে রুমালে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ,
রাত্তিরে কিছুতেই তোমার ঘুম হবে না, প্রিয়তমা,
ভার্নায় বর্ হোটেলে ॥

২রা জুন ১৯৫৭

আশাবাদী প্রাহা

১৯৫৭, জানুয়ারি ১৭ই।
কাঁটায় কাঁটায় ন'টা।
রৌদ্রোজ্জ্বল শুকনো হিম, মিথ্যে নেই,
শুকনো হিম গোলাপী-লাল,
আসমানী-নীল শুকনো হিম।
আমার লালচে গোঁফ বরফে জমে যাওয়ার মতন।
পল-তোলা কাঁচে হীরের সূচীমুখে খোদাই-করা
প্রাহা নগরী।
আমি ছুঁলেই ঠুনঠুন করে বেজে উঠবে :
সোনালী-কানা, স্বচ্ছ, শুভ্র কাঁচ।
এখন কাঁটায় কাঁটায় ন'টা
সমস্ত মিনারে
আর আমার ঘড়িতে।

"শুক্‌নো হিম রৌদ্রোজ্জ্বল, গোলাপী-লাল,
আসমানী-নীল শুক্‌নো হিম।
এখন কাঁটায় কাঁটায় ন'টা
এই দণ্ডে, এই মুহূর্তে
প্রাহায় একটি মাত্র মিথ্যেও উচ্চারিত হয় নি।
এই দণ্ডে, এই মুহূর্তে
স্ত্রীলোকেরা বিনা ব্যথায় প্রসব করেছে সন্তান,
কোনো একটি রাস্তা দিয়েও
কোনো একটি শববাহক গাড়িও যায় নি।
এই দণ্ডে
সমস্ত নক্সা ওপরে উঠেছে
পীড়িতের ভালোর জন্যে।
মুহূর্তের জন্যে
সমস্ত রমণী হয়েছে সুন্দর, পুরুষেরা প্রাজ্ঞ,
মানবমূর্তিগুলো বিষণ্ণ নয়।
এখন
ইস্কুলে বাচ্চারা সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে
একটুও না থেমে।
এখন
সমস্ত উনুনেই কয়লা আছে,
সব রেডিয়েটারেই আছে তাপ,
এবং কালো মিনারের গম্বুজ
সোনা দিয়ে পুনর্বার মোড়া হয়েছে।
মুহূর্তের জন্যে
অন্ধেরা ভুলে গেছে তাদের অন্ধকার,
কুঁজোরা ভুলে গেছে তাদের বেঁকে যাওয়া পিঠ।
মুহূর্তের জন্যে
আমার কোনো বৈরী ছিল না
এবং কেউই ভাবছিল না
পুরনো দিনগুলো আবার ফিরে আসতে পারে।

এই সময়

ওয়েন্‌সেস্‌লাউস তার ব্রোঞ্জের ঘোড়া থেকে নেমে এল।

জনতার মধ্যে সে ভিড়ে গেল,

তাকে আর আলাদা ক'রে চিনে নেওয়ার উপায় রইল না।

মুহূর্তের জন্যে

তুমি আমাকে ভালবাসলে

আমাকে এত ভালো আগে কখনই তুমি বাসো নি।

এই দণ্ডে, এই মুহূর্তে,

রৌদ্রোজ্জ্বল শুক্‌নো হিম, মিথ্যে নেই

শুক্‌নো হিম গোলাপী-লাল

আসমানী-নীল শুক্‌নো হিম।

পল-তোলা কাঁচে হীরের স্চীমুখে খোদাই-করা

প্রাহা নগরী।

আমি ছুঁলেই, ঠুন্‌ঠুন্ ক'রে বেজে উঠবে :

সোনালী-কানা, স্বচ্ছ, শুভ্র কাঁচ॥

মিখাইল রেফিলির স্মৃতিতে

আমার প্রজন্মের এখন পাতা-ঝরার দিন,

আমরা বেশির ভাগই শীতটা পেরোতে পারব না।

লোকটা ভেঙে পড়েছিল, রেফিলি।

যখন সে শুনল···

কী বলছিলাম যেন···

তোমার কি মনে আছে, মিখাইল··

কিন্তু তোমার তো এখন স্মৃতি নেই,

তোমার নেই নাক, মুখ, চোখ···

ভাই; তুমি এখন স্তূপাকার অস্থি,

বাকু-র এক সমাধিক্ষেত্রে।

কী বলছিলাম যেন···

মস্কোয়, আমাদের বাসায়, নববর্ষের এক প্রাক্‌-সন্ধ্যায়।
চাঁদোয়া-টাঙানো পাইনের নিচে, টেবিলে,
প্রকাণ্ড একটা খেলনার মত তুমি জলজল করছিলে।
তোমার চকচকে চোখ, টাক-পড়া মাথা,
সমীহ করার মত পেট।
বাইরে, রাত্রিতে নিমজ্জিত তুষারময় অরণ্য।
আমি তোমার দিকে তাকালাম, তারপর ভাবলাম :
মহামান্য—এক পিপে পুরনো মদের মত ডগমগ,
পুরনো মদের পিপের মত পোক্ত।
আমার ঢের পরেও ও ঠিক বেঁচে থাকবে।
আর আমার অবর্তমানে ও লিখে ফেলবে কোনো প্রবন্ধ
কিংবা কবিতা :
নাজিমের সঙ্গে আমার দেখা হয় মস্কোয় ১৯২৪ সালে·
সত্যি মিখাইল, তুমি হতে পারতে কবি,
ছিলে তুমি অধ্যাপক।
কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়।
আমাদের ক'রে যাওয়া সেরা কাজ, কিংবা সবচেয়ে বড় অপকীর্তি,
আমরা চলে গেলেও থেকে যায়।
আমার ধারণা, তুমি ছিলে মাঝারির দলে।
আমিও তাই।
আমি বলতে চাই, এই ভূমণ্ডলে আমাদের কণ্ঠস্বর থেকে যাবে
সে আশ্বাস আমাদের নেই।
আমার দিক থেকে, তাতে কিছু এসে যায় না।
আশ্বাস ছাড়াই আমি বেঁচে থাকতে পেরেছি,
এবং আশ্বাস ছাড়াই আমি মরে যেতে পারব—
তোমার মতন রেফিলি ॥

৫ই জুন ১৯৫৮
প্রাহা

মৌমাছি

মধুর বড় বড় কৌটার মতন মৌমাছি,
ওরা দ্রাক্ষালতা বয়ে নিয়ে যায় রোদ্দুরে,
আমার যৌবনকাল থেকে ওরা উড়তে উড়তে এল,
আপেলগুলো, এই ভারী ভারী আপেল,
এরাও সেখান থেকেই
এই স্বর্ণরেণু সরণি।
জলস্রোতে এইসব শুভ্র উপল,
আমার ভরসা গানে।
ঈর্ষাহীন আমার সত্তা,
মেঘবিহীন দিন, এই নীলবর্ণ দিন,
এও সেখান থেকেই
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে নগ্ন আর উষ্ণ সমুদ্র,
এই উন্মুখ প্রতীক্ষা, এইসব ঝকঝকে দাঁত আর পুরু পুরু ঠোঁট—
মৌমাছির পায়ে
মধুর বড় বড় কৌটার মতন
তারা এসেছিল ককেশাস অঞ্চলের এই গ্রামে
আমার যৌবনকাল থেকে, শেষ করার আগে যে যৌবনকে
কোথাও আমি ফেলে রেখে এসেছিলাম ॥

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮
আরহিপো ওসিপভ্কা

ভোরের আলো

ভোরের আলোয়, টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো,
রাস্তাটা।
প্রসাধনের আয়না ভোরের আলোয় উল্‌সে ওঠে,
টেবিলটা,
পায়ের চটিজুতো—

জিনিসগুলো পুনর্বার এ ওকে দেখে আর জানে চেনে।
আমাদের ঘরে পাল টাঙানোর মত ছড়িয়ে পড়ে ভোরের আলো,
হীরের আংটির মত নীল হিমশীতল বায়ুলোক।
আমাদের ঘরের মধ্যে তারাগুলো ম্লান হয়
সুদূরে,
আকাশগঙ্গার গভীরে, পাথরগুলো গা ধুয়ে পরিষ্কার হয়
বালিশে, আমার গোলাপ ঘুমোয়—
পালকের প্রকাণ্ড বালিশে তার মাথা।
লেপের গায়ে রাখা তার দুটি হাত যেন সাদা টিউলিপ ফুল।
তার কেশপাশে পাখিরা শুরু করে গান।
ভোরের আলোয়, গাছপালা আর কারখানার চিমনি নিয়ে শহর।
গাছগুলো ভেজা-ভেজা, চিমনিগুলো গরম।
শানবাঁধানো রাস্তাকে সোহাগ ক'রে
প্রথম পায়ের শব্দ আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে যায়,
প্রথম ইঞ্জিনের গুঞ্জন,
প্রথম অট্টহাসি
প্রথম শাপান্ত।
পেস্ট্রির গাড়ির কাঁচের ডালায় গরম ভাপ,
বুট-পরা ড্রাইভার যাচ্ছে দুধমাখনের দোকানে,
প্রতিবেশীর চেঁচিয়ে কাঁদা শিশু,
নীল প্রাচীরপত্রে শ্বেতকপোত,
দোকানের জানলায়
হল্‌দে জুতো-পরা মানুষের মূর্তি,
আর চন্দনকাঠের চীনে হাতপাখা
আর তার সেই রমণীয় লাল ঠোঁট
আর ভোরের আলোয় আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে যায়
সবচেয়ে সুখের আর সবচেয়ে তরতাজা জাগরণ।
আমি রেডিও খুলি :
বৃহদাকার নামের ধাতুর সঙ্গে মেশে বৃহদাকার সব রাশি,
শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে পাল্লা দেয় তৈলকূপ।

লেনিন পদক পাওয়া মেষপালক
(প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা তার ছবি দেখেছি
তার মোটা কালো ঝুলন্ত গোঁফ)
কথা বলছে কিশোরীর মত লজ্জায় জড়সড় হয়ে।
তারপর খবর আসে দুই মেরুপ্রান্তেরই :
এরপর যখন তৃতীয় স্পুৎনিক
আজ সকাল ছ'টায়
৮৮৭৮ বার পৃথিবীকে চক্কর দেয়
আমার গোলাপের বিশাল দুটো চোখ বালিশের ওপর খুলে যায়।
দেখতে এখনও তারা ধোঁয়া-ওঠা পাহাড়ী সরোবরের মতন।
তাতে ঝিকিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে নীল মাছ,
তাদের তলদেশ থেকে ওঠে সবুজ পাইন।
দেখায় গভীর আর চ্যাটালো।
তার শেষতম স্বপ্ন চোখ ঝল্‌সায় ভোরের আলোয়।
আমার গায়ে আলো এসে পড়ে,
আমি আরেকবার নিজেকে দেখি আর নিজেকে জানি।
আমি এখন বেপরোয়াভাবে সুখী
সেইসঙ্গে কিছুটা কুণ্ঠিত,
অবশ্য খুবই সামান্য।
ভোরবেলায় আমাদের ঘরের আলো
নৌযাত্রায় তৈরি পালের মত দেখায়
যেন আলোর পাল।
আমার গোলাপ বিছানা ছেড়ে ওঠে খুবানির মত অনাবৃত।
ভোরের আলোয় বিছানাটা পুরোপুরি শুভ্র
নীল প্রাচীরপত্রের শ্বেতকপোতের মত॥

ফেব্রুয়ারি ১৯৬০
কিস্‌লোভদস্ক

চলে গেলে

আমার মনের মানুষ সঙ্গে এসেছিল ব্রেস্ত্‌ পর্যন্ত,
ট্রেন থেকে নেমে পড়ে সে ছিল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে,
ছোট হতে হতে, ছোট হতে হতে
এক সময়ে সে হয়ে গেল অনন্ত নীলিমায় গোধুমের অন্তর্বীজ,
তারপর লৌহবর্ত্ম ছাড়া কিছুই আর চোখে পড়ল না।
তারপর সে আমাকে ডাকতে লাগল পোল্যাণ্ড থেকে, আমি উত্তর দিতে পারি নি,
আমি জিগ্যেস করতে পারি নি, 'হে আমার গোলাপবালা, তুমি কোথায়'?
সে আমাকে 'এসো' ব'লে ডেকেছিল, আমি তার কাছে পৌঁছুতে পারি নি,
ট্রেন এমনভাবে ছুটে চলেছিল যেন কখনই আর থামবে না,
দুঃখে গলা আমার বুঁজে এসেছিল।
তখন, বালুময় মৃত্তিকায় বরফের টুকরোগুলো গলে গলে পড়ছিল,
সেই সময় হঠাৎ আমি জানলাম আমার মনের মানুষ সব কিছু দেখছে,
'আমাকে কি ভুলে গিয়েছিলে,' সে জিগ্যেস করছিল, 'আমাকে কি ভুলে গিয়েছিলে?'
বসন্ত তখন কাদামাখা খালি পায়ে আকাশে আগুয়ান।
টেলিগ্রাফের তারে তারে আলো জেলেছিল নক্ষত্রমণ্ডলী,
অন্ধকার তখন চাবুকের মতন রেলগাড়িতে হেনে চলেছিল বৃষ্টি।
আমার মনের মানুষ টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলোর তলায় দাঁড়িয়ে,
তার হৃদয় উথালপাথাল করছিল যেন সে আমার বাহুডোরে,
খুঁটিগুলো যখন উধাও হয়ে যাচ্ছিল তখনও সে দাঁড়িয়ে,
ট্রেন এমনভাবে চলছিল যেন কখনই থামবে না,
দুঃখে গলা আমার বুঁজে এসেছিল।
তখন হঠাৎ আমি জানলাম এই ট্রেনে আমি বছরের পর বছর ধরে রয়েছি,
—কিন্তু এখনও আমার অবাক লাগে কিভাবে অথবা কেন আমি এটা জানলাম—
এবং সব সময় সেই একই মহৎ আশা-জাগানো গান গেয়ে
আমি চিরকাল ছেড়ে চলে যাই শহরগুলো আর আমার প্রেমাস্পদ নারীদের

আর আমার অন্তরে দগ্‌দগে ক্ষতের মতন আমি বহন করছি বিচ্ছেদ
আর আমি কাছে আসছি, ক্রমেই কাছে আসছি কোনো একটা জায়গার ॥

মার্চ ১৯৬০
ভূমধ্যসাগর

অকস্মাৎ

অকস্মাৎ আমার মধ্যে কিছু একটা ছিঁড়ে গিয়ে গলা ধরে নেয়
অকস্মাৎ, আমার কাজের মাঝখানে, আমি লাফিয়ে উঠি,
অকস্মাৎ আমি একটা স্বপ্ন দেখি, একটা হোটেলে, হলঘরে, দাঁড়িয়ে উঠেছি
অকস্মাৎ রাস্তার পাশের গাছটা আমার কপালে ঘা মারল,
অকস্মাৎ একটা অসুখী, ক্রুদ্ধ, অভুক্ত নেকড়ে চাঁদের দিকে মুখ ক'রে
গাঁক-গাঁক করছে,
অকস্মাৎ একটা বাগানের দোল্‌নায় তারাগুলো দুলছে,
অকস্মাৎ আমি ভাবি কেমন ক'রে আমি কবরে থাকব,
অকস্মাৎ আমার মাথায় ভর করে একটা রোদ-পড়া কুয়াশা,
অকস্মাৎ আঁকড়ে ধরি আমার আরব্ধ দিনটাকে যেন তা কখনও শেষ হবে না
এবং প্রতিবারই তুমি জলের ওপরে ভেসে ওঠো··

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০

সকাল ছ'টা

সকালবেলা, ঘড়িতে ছ'টা।
দিনের দরজা খুলে ভেতরে পা বাড়ালাম,
জানলায় আমায় সুপ্রভাত জানাল তরতাজা নীলিমার আস্বাদ
আয়নায় আমার কপালে গতকালের পরিত্যক্ত রেখা

আর আমার পেছনে এক রমণীর কণ্ঠস্বর, পীচফলের রেণুর চেয়েও কোমল
আর রেডিওতে বলছে আমার দেশের খবর
আর এখন, আমার আকুল আকাঙ্ক্ষা কানায় কানায় ভরে উপচে পড়ছে,
প্রহরের ফলবাগানে গাছে গাছে আমি ছুটব
আর সূর্য অস্ত যাবে, প্রিয় আমার,
আর রাত পেরিয়ে যাবে আমার আশা
এক নতুন নীলিমার আস্বাদ আমার অপেক্ষায় থাকবে, আশা করছি ॥

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০

স্বর্ণকুন্তলা

ভেরা তুলিয়াকোভা-কে
গভীর শ্রদ্ধায়

১

ভোরবেলায় এক্সপ্রেস ট্রেন বেমালুম এসে ঢুকেছিল স্টেশনে
বরফে চারিদিক ঢাকা
ওভারকোটের কলার তুলে আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে
আমি ছাড়া প্ল্যাটফর্মে দ্বিতীয় কেউ নেই
স্লিপার কোচের একটা জানলা ঠিক আমার সামনে এসে থেমেছিল
পর্দাগুলো সরানো
নিচের বার্থে আধো-আলো আধো-ছায়ায় নিদ্রামগ্ন এক তরুণী
তার খড়-রঙা চুল নীল-বরণ আঁখিপক্ষ্ম
আর তার টোবা ঠোঁট জেবড়ানো আর টস্‌কানো
ওপরের বার্থে কে শুয়ে ছিল আমি দেখি নি
বেমালুম স্টেশন থেকে সরে পড়েছিল সেই এক্সপ্রেস
আমি জানি না কোথা থেকে তার যাত্রা শুরু। কোথায়ই বা শেষ।
গাড়িটা ছেড়ে চলে গেল আমি দেখলাম।
আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম ওপরের বার্থে
ওয়ার্‌স' শহরে ব্রিস্টল হোটেলে

এমন অঘোরে কত বছর যে ঘুমোই নি
তবু তো আমার বিছানাটা ছিল কাঠের আর সরু
অন্য বিছানায় শুয়ে ছিল এক তরুণী
তার খড়-রঙা চুল নীল-বরণ আঁখিপক্ষ্ম
যেমন দীর্ঘ তেমনি মসৃণ ছিল তার শুভ্র গ্রীবা
এমন অঘোরে কত বছর যে সে ঘুমোয় নি
তবু তো তার বিছানাটা ছিল কাঠের আর সরু
সময় ধেয়ে চলেছিল বেগে আমরা তখন মধ্যরাতের কাছাকাছি
এমন অঘোরে কত বছর যে আমরা ঘুমোই নি
তবু তো বিছানাগুলো ছিল কাঠের আর সরু
পাঁচতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে আমি নামছি
লিফ্‌ট্ আবার বিগড়েছে
ভেতরের আয়নায় আমি সিঁড়ি ভেঙে নামছি
আমার বয়েস হতে পারে কুড়ি, হতে পারে এক শো
সময় ধেয়ে চলেছিল বেগে আমরা তখন মধ্যরাতের কাছাকাছি
চার তলায় দরজার আড়ালে এক মহিলা সরবে হাসছেন
আমার ডান হাতে আস্তে আস্তে পাপড়ি খুলছে এক বিষণ্ণ গোলাপ
তিন তলার তুষারঢাকা জানলায় কিউবার এক ব্যালে-নর্তকীর সঙ্গে আমার দেখা
এক তাজা ঘোর অগ্নিশিখার মত সে আমার কপাল ঘেঁষে ছিট্‌কে চলে গেল
অনেকদিন হল কবি নিকোলাস গিয়েন হাভানায় ফিরে গেছেন ।
ইউরোপে আর এশিয়ায় বছরের পর বছর হোটেলের লবিতে ব'সে
ফোঁটায় ফোঁটায় আমরা পান করেছি আমাদের হৃত শহর
আর নোঙর-ছেঁড়া সেকালের দাঁড়-টানা নৌকার মতন
শীতের প্রত্যুষের হাওয়ায় জল কাটে কাঠের বজরাগুলো
আর এক কাঁসারীর ছাইগাদায়
ঘুম ভেঙে চোখ মেলে আমার মহাকায় ইস্তানবুল
দুটো জিনিস আছে একমাত্র মৃত্যুই তা ভুলিয়ে দিতে পারে
দ্বারবান তার আলখাল্লা রাত্রিতে ডুবিয়ে আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল

বরফের মত কনকনে হাওয়ায় নিয়ন আলোর মধ্যে আমি হেঁটেছিলাম
সময় ধেয়ে চলেছিল বেগে আমি তখন মধ্যরাতের কাছাকাছি
ওরা অতর্কিতে এসে আমাকে ধরে ফেলল
দিনের মত আলোতেও আর কেউ তাদের দেখতে পায় নি
ওরা এসেছিল ঝাঁক বেঁধে
ওদের পায়ে কাঁটা-মারা বুট পরনে প্যাণ্টকোট
বাহুতে স্বস্তিকার ছাপ তাদের বাহুতে
হাতে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক তাদের হাতে
তাদের কাঁধে শিরস্ত্রাণ তাদের কাঁধে কিন্তু মাথা নেই
কাঁধ আর শিরস্ত্রাণের মাঝখানে শূন্যতা
ওদের এমন কি গলার কলার এমন কি ঘাড়ও ছিল কিন্তু মাথা ছিল না
ওরা ছিল জওয়ান যাদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের বালাই থাকে না
আমরা হাঁটতে লাগলাম
তুমি দেখতে পেতে ওদের ভয় জান্তব ভয়
বলতে পারব না ওদের চোখের মধ্যে ছিল সেটা স্পষ্ট
ওদের মাথাই ছিল না তার আবার চোখ
ওদের ভয়ে জান্তব ভয় তুমি দেখতে পেতে
ওদের বুটজুতোয় সেটা ছিল স্পষ্ট
বুটজুতোয় কি ভয় কখনও প্রকাশ পায়
ওদের বেলায় পেয়েছিল
ভয়েভয়ে ওরা ছুঁড়েছিল বন্দুক
সমস্ত ঘরবাড়ি সমস্ত গাড়িঘোড়া জান্তব সব কিছুর ওপর সমানে ওরা
ছুঁড়ছিল গুলি
যে কোনো আওয়াজে সামান্যতম নড়াচড়ায়
শোপ্যাঁ সরণিতে এমন কি নীল মাছওয়ালা একটা প্রাচীরপত্রেও ওরা গুলি
করেছিল
কিন্তু একপর্দা বালিও তাতে খসে পড়ে নি কিংবা একটা কাঁচও ভাঙে নি
আর আমি ছাড়া অন্য কেউই গুলির শব্দ পায় না
কিন্তু মরে-যাওয়া ঝটিকাবাহিনীর একটি দলও মরে গিয়ে মারতে পারে না
ফিরে এসে মৃতেরা খুন করে কৃমিকীট হয়ে আর আপেলের ভেতরে ঢুকে

তবে তুমি দেখতে পেতে ওদের ভয় জান্তব ভয়
খুন হয়েছিল না কি এই শহর ওরা খুন হওয়ার আগে
এই শহরের হাড়গোড়গুলো একের পর এক ভাঙে নি কি আর
এর ছাল কি ছাড়ানো হয় নি
হয় নি কি এর চামড়া দিয়ে বইয়ের মলাট এর তেল
থেকে সাবান এর চুল দিয়ে রশি
কিন্তু ওদের সামনে এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল এই শহর
রাত্তিরে বরফের মত কনকনে হাওয়ায় তপ্ত রুটির মতন
সময় ধেয়ে চলেছিল বেগে আমরা তখন মধ্যরাতের কাছাকাছি
বেলভিডিয়ার সরণিতে পোলদের কথা আমার মনে পড়ছিল
এই প্রাসাদে আমার প্রথম এবং হয়ত শেষ পদকটি আমাকে তারা অর্পণ
করেছিল
অনুষ্ঠানকর্তা উদ্‌ঘাটন করেছিলেন স্বর্ণখচিত ধবল দুয়ার
এক তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে আমি পদার্পণ করেছিলাম হলঘরে
তার খড়-রঙা চুল নীল-বরণ আঁখিপক্ষ্ম
আর আমরা দুজনে ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না
সঙ্গে জলরঙের আঁকাজোঁকা আর খেলাঘরের মতন চিকন চিকন চেয়ার আর
কৌচ
আর তুমি হয়ে গেলে
হালকা নীলে আঁকা ছবি কিংবা চীনে মাটির পুতুল হয়ত বা
কিংবা আমার বুকে নেমে আসা কোনো স্বপ্নের হয়ত বা ফুল্‌কি
আধো-আলো আধো-ছায়ায় নিচের বার্থে তুমি ছিলে নিদ্রামগ্ন
যেমন দীর্ঘ তেমনি মসৃণ ছিল তোমার শুভ্র গ্রীবা
এমন অঘোরে কত বছর যে তুমি ঘুমোও নি
আর ক্র্যাকাউতে এই খেয়ালী পানশালায়
সময় ধেয়ে চলেছে বেগে এখন আমরা মধ্যরাতের কাছাকাছি
কফির কাপ আর গেলাসের মাঝখানে টেবিলে ছিল বিচ্ছেদ
তুমিই রেখেছিলে সেখানে
যেন কোনো ইঁদারার তলদেশে ঠেকা জল
আমি ঝুঁকে পড়ে দেখছি

মেঘের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে এক বুড়ো মানুষ
আমি ডাক দিই
আমার গলার স্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে তোমাকে হারিয়ে
টেবিলে ছিল বিচ্ছেদ সিগারেটের প্যাকেটে
বয় সেটা এনেছিল গেলাসগুলোর সঙ্গে কিন্তু তুমিই বলেছিলে আনতে
তোমার দুচোখে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল ধোঁয়া
ধোঁয়া ছিল তোমার সিগারেটের আগায়
ছিল বিদায় বলতে উদ্যত তোমার করপল্লবে
যেখানে রেখেছিলে তোমার কনুই সেই টেবিলে ছিল বিচ্ছেদ
ছিল তোমার মনের ভাবনায়
যা তুমি আমার কাছে গোপন রাখছিলে এবং যা রাখো নি তার মধ্যে
বিচ্ছেদ ছিল তোমার প্রশান্তিতে
আমার ওপর তোমার অচলা আস্থায়
তোমার ভীষণ ভয়ের মধ্যে
পাছে হঠাৎ আকাশ-থেকে-পড়া কাউকে ভালবেসে ফেলো যেন তোমার দরজা
হঠাৎ খুলে গেছে
আসলে আমাকে তুমি ভালবাসো অথচ তুমি তা জানো না
বিচ্ছেদ ছিল তোমার না-জানার মধ্যে
মাধ্যাকর্ষণ-বিরহিত ছিল বিচ্ছেদ বলতে পারব না পালকের মত ভারহীন
এমন কি পালকেরও ভার আছে বিচ্ছেদ কিন্তু ছিল সত্যিই ভারহীন
সময় ধেয়ে চলেছে বেগে মধ্যরাত কাছে আসছে
নক্ষত্র-ছোঁয়া মধ্যযুগীয় প্রাচীরগুলোর ছায়ায় ছায়ায় আমরা হেঁটে গেলাম
সময় দ্রুতবেগে পিছু হাঁটছিল
আমাদের পদশব্দের প্রতিধ্বনিগুলো ফিরে গেল হাড় জিরজিরে হল্‌দে
কুকুরের মত
ওরা একবার আমাদের সামনে একবার পেছনে ছুটছিল
জাগিয়েলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোরাফেরা করে শয়তান
পাথরে সে বসিয়ে দেয় নখ
আরবদের কাছ থেকে পাওয়া কোপার্নিকাসের নক্ষত্র-মাপক সে চায় ভেতর
থেকে ধ্বসিয়ে দিতে

আর কাপড়-কাটারার তলাকার হাটতলায়
সে রয়েছে রক্ অ্যাণ্ড রোলের তালে তালে নৃত্যরত ক্যাথলিক ছাত্রদের সঙ্গে
সময় ধেয়ে চলেছে বেগে এখন আমরা রাতের কাছাকাছি
নোভা-হুতার লাল-আভা মেঘে মেঘে বাড়ি মারে
সেখানে গাঁ থেকে আসা ছোকরা শ্রমিকরা ধাতুর সঙ্গে ঢালাই করে নেয়
তাদের অন্তরাত্মা
নতুন নতুন ছাঁচের মধ্যে জ্বলতে জ্বলতে
আর ধাতু ঢালাইয়ের চেয়েও হাজার গুণ শক্ত আত্মাগুলোকে ঢালাই করা
সেণ্ট মেরীর গীর্জায় গম্বুজে ঘণ্টাধ্বনি করা ভেরী নিনাদে
ঘোষিত হল মধ্যরাত
মধ্যযুগ থেকে উঠে এসেছে তার ত্রাহি রব
শহরের সমীপবর্তী শত্রুর বিপদ্‌সঙ্কেতে
আর সহসা স্তব্ধ হয়েছে সে তার কণ্ঠ ভেদ করে যাওয়া বাণে
শান্তিতে চোখ বুঁজেছে ভেরী
আর আমি ভাবছিলাম
শত্রুকে আসতে দেখেও কাউকে জানাবার আগেই খুন হয়ে যাওয়ার
বেদনার কথা
সময় ধেয়ে চলেছে বেগে মধ্যরাত অতিক্রান্ত
এইমাত্র আলো-নেভা কোনো স্টীমারঘাটের মতন
ভোরবেলায় এক্সপ্রেস ট্রেন বেমালুম এসে ঢুকেছিল স্টেশনে
বৃষ্টিতে ছয়লাপ প্রাহা
যেন কোনো সরোবরের তলদেশে রৌপ্যখচিত এক সিন্দুক
আমি তার ডালা খুলে ফেলেছি
ভেতরে এক ঝাঁক কাঁচের পাখির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে এক কন্যা
তার খড়-বরণ চুল নীল-বরণ আঁখিপক্ষ্ম
এমন অঘোরে কত বছর যে সে ঘুমোয় নি
সিন্দুক বন্ধ ক'রে লাগেজ ভ্যানে আমি তুলে নিলাম
বেমালুম স্টেশন থেকে সরে পড়েছিল সেই এক্সপ্রেস
আমার দুপাশে আমার ডানা দুটোকে ঝুলিয়ে আমি ট্রেনটাকে চলে যেতে
দেখলাম

বৃষ্টিতে ছয়লাপ প্রাহা

তুমি এখানে নেই

আধো-আলো আধো-ছায়ায় নিচের বার্থে তুমি ঘুমিয়ে

ওপরের বার্থ্ খালি

তুমি এখানে নেই

পৃথিবীর এক সুন্দরতম শহর শূন্য

তোমার হাত থেকে খুলে ফেলা দস্তানার মতন খালি

তোমাকে দৃষ্টির আড়াল করা আরশির মতন নিভে গেল তার আলো

হারানো রাত্রির সাঁকোর নিচে অদৃশ্য হয় ভল্‌তাভার জলস্রোত

রাস্তাগুলো সবই ফাঁকা

বাসগুলো যাচ্ছে সমস্তই খালি

এমন কি তাতে না আছে কণ্ডাক্টর না আছে ড্রাইভার

কফিহাউসগুলোতে লোক নেই

পানশালা আর রেস্তোরাঁগুলোরও একই দশা

দোকানে দোকানে শো-কেস খালি

না কাপড়চোপড় না পলতোলা কাঁচের জিনিস না মাংস না মদ

না বই না লজেঞ্চুসের বাক্স না কোনো গোলাপী লাল ফুল

আর কুয়াশার মতন এই নির্জনতায় মোড়া শহরে এক বুড়ো মানুষ

নির্জনতায় দশগুণ বেড়ে যাওয়া বয়সের বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায়

লিজিওনেয়ার ব্রিজ থেকে সিন্ধুশকুনদের দিকে ছুঁড়ে দেয় রুটি

প্রত্যেকটা টুকরো তার অতি-তরুণ

হৃদয়ের রক্তে ভিজিয়ে নিয়ে

আমি ধরতে চাই মিনিটগুলোকে

আমার আঙুলে আঙুলে থেকে যায় তাদের গতিবেগের স্বর্ণরেণু

স্লীপার কোচের নিচের বার্থে এক তরুণী নিদ্রামগ্ন

এমন অঘোরে কত বছর যে সে ঘুমোয় নি

তার খড়-রঙা চুল নীলবরণ আঁখিপক্ষ্ম

তার হাতদুটো যেন রুপোর বাতিদানে মোমবাতি

আমি দেখতে পাইনি ওপরের বার্থে ঘুমিয়ে ছিল কে

কেউ যদি শুয়ে থাকে তো আমি নই

হয়ত ওপরের বার্থ্ খালি
হয়ত ওপরের বার্থে মস্কো
পোল্যাণ্ডে কুয়াশা জেঁকে বসে আছে
ব্রেস্তেও তাই
দুদিন হয়ে গেল কোনো প্লেন না পারছে নামতে না পারছে উঠতে
কিন্তু ট্রেনগুলো যাচ্ছে আসছে কোটরাগত চোখের ভেতর দিয়ে তারা যাচ্ছে
বার্লিনের পর থেকে কামরায় আমি একা
পরদিন সকালে বরফাচ্ছন্ন মাঠের রোদে আমি জেগে উঠলাম
ডাইনিং-কারে আমি খেলাম এক রকমের দই
পরিচারিকা আমাকে চিনতে পেরেছিল
মস্কোয় সে দেখেছিল আমার দুটো নাটক
এক তরুণী স্টেশনে এসেছিল আমাকে নিতে
পিঁপড়ের চেয়েও ছোট তার কটিদেশ
তার খড়-রঙা চুল নীল-বরণ আঁখিপক্ষ্ম
আমি ধরেছিলাম তার হাত আমরা হেঁটেছিলাম
রোদ্দুরে বরফ মুচমুচিয়ে ভাঙতে ভাঙতে আমরা হেঁটেছিলাম
সে বছর বসন্ত এসেছিল একটু আগে
তখন ছিল সন্ধ্যাতারায় ওদের উড়ো খবর পাঠাবার মরশুম
মস্কো তখন আনন্দে ডগমগ আমি আনন্দে ডগমগ আমরা আনন্দে ডগমগ
সহসা আমি তোমাকে হারিয়েছিলাম মায়াকভস্কি স্কোয়ারে সহসা
হারিয়েছিলাম
না ঠিক হঠাৎ নয় কেননা প্রথমে আমি হারাই তোমার হাতের উষ্ণতা
আমার হাতে তারপর হারাই আমার হাতের তালুতে তোমার হাতের
নরম ভার
এবং তারপর তোমার হাত
এবং আমাদের আঙুলে আঙুলে প্রথম ছোঁয়াছুঁয়ির ঢের আগেই নেমে
এসেছিল বিচ্ছেদ
কিন্তু তবু সহসা আমি তোমাকে হারিয়েছিলাম
অ্যাসফল্টের সমুদ্রে গাড়িগুলোকে আমি রুখে দিয়েছিলাম আর ভেতরে
খুঁজে দেখলাম তুমি নেই

বরফে ঢাকা বুলেভার
পায়ের চিহ্নগুলোর একটিও তোমার নয়
তোমার লম্বা-বুট শু-জুতো মোজায় ঢাকা অনাবৃত পায়ের সব ছাপই
আমার চেনা

প্রহরীদের জিগ্যেস করেছিলাম
তোমরা দেখ নি কি
দস্তানা খুললে তার হাতদুটো চোখে পড়বেই পড়বে
তার হাত যেন রুপোর বাতিদানের মোমবাতি
প্রহরীরা সবিনয়ে জানায়
আমরা দেখি নি
ইস্তানবুলের সেরভিলিও পয়েণ্টে একটা গাদাবোট ঢেউ ঠেলে আসে
তার পেছনে তিনটে বজরা
অক্ অক্ সিন্ধুশকুনেরা যায় অক্ অক্
আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম বজরাগুলোকে রেড স্কোয়ার থেকে আমি ডাকতে
পারি নি
গাদাবোটের সারেঙ্‌কে কেননা যেভাবে তার ইঞ্জিনটা গরর্ গরর্
করছিল তাতে
আমার কণ্ঠস্বর তার কানে যেত না এবং সারেঙ্‌টি ক্লান্তও হয়েছিল খুব এবং
তার কোটের সব বোতামই ছিল ছেঁড়া
বজরাগুলোকে আমি চেঁচিয়ে ডেকেছিলাম রেড স্কোয়ার থেকে
আমরা দেখি নি
আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি মস্কোর সব দিকের সমস্ত রাস্তায়
আর আমি জিগ্যেস করছি শুধু মেয়েদেরই
পশমের নিচে হাসি-হাসি মুখের শান্ত ধীর স্থির বৃদ্ধবয়সী বাবুশ্‌কাদের
সবুজ ভেলভেটের টুপি-পরা গোলাপী-গাল আর খাড়া-নাকের তরুণীদের
আর খুব ছিমছাম আর গোলগাল আর সুশ্রী বাচ্চা মেয়েদেরও
সেখানে থাকতে পারে ভয়ানক বুড়ি লবেজান তরুণী আর ছিচকাঁদুনে সব
মেয়েরা

কিন্তু কে তাদের তোয়াক্কা করে
পুরুষদেরও আগে নারীদের নজরে পড়ে সৌন্দর্য এবং তারা ভোলে না

তোমরা দেখ নি কি
তার চুল খড়ের মত সোনালী আঁখিপক্ষ্ম নীল
তার কালো ওভারকোটে সাদা কলার আর তাতে বড় বড় মুক্তোর মত বোতাম
পেয়েছিল সে প্রাহায়
আমরা দেখি নি
মিনিটগুলোর সঙ্গে এখন পাল্লা দিচ্ছি তারা আমার আগে এখন আমি
ওরা আগে গেলে ভয় হয় পাছে আমার চোখের আড়ালে চলে যায়
ওদের অন্তর্ধানরত লাল আলো
যখন আমি আগে আগে ওদের স্পটলাইট আমার ছায়াকে ছুঁড়ে দেয় রাস্তায়
আমার ছায়া আমার আগে আগে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে আমার হঠাৎ ভয় হয়
পাছে চোখের আড়ালে চলে যায় আমার ছায়া
আমি যাই থিয়েটারে বিচিত্রানুষ্ঠানে সিনেমায়
বল্‌শয়তে আমি যাইনি আজ রাত্রের অপেরা তোমার পছন্দ নয়
আমি চলে গেলাম ইস্তানবুলের কালামিশে ধীবরদের পানশালায় আর আমরা
ব'সে সইৎ ফাইকের সঙ্গে জুড়ে দিলাম মধুর আলাপ একমাস হল আমি ছাড়া
পেয়েছি জেল থেকে তার লিভার ব্যথা করছিল এবং পৃথিবীটা ছিল বড় সুন্দর
বিখ্যাত ব্যাণ্ডবাদ্যের কাংস্য অর্কেস্ট্রা যেখানে সেইসব রেস্তোরাঁয় যাই
জিগ্যেস করি সোনালী পটিদার দ্বারপাল উদাসীন বখশিসপ্রিয় ওয়েটারদের
চেকরুমের লোকদের আর আমাদের পাড়ার পাহারাওয়ালাদের
আমরা দেখিনি
স্রাস্ত্‌নয় মঠের ঘড়ি-ঘরে রাত বারোটা বাজল
আদতে ঘড়ি-ঘর আর মঠ বহুকাল আগেই ভেঙে ফেলা হয়েছে
সে জায়গায় তৈরি হচ্ছে শহরের বৃহত্তম সিনেমা হাউস
এখানেই আমার সঙ্গে আমার উনিশতম বছরের দেখা
দেখামাত্রই পরস্পরকে আমরা চিনতে পেরেছিলাম
অথচ কেউ কাউকে আগে দেখি নি এমন কি ফটোগ্রাফও নয়
তবু দেখামাত্র পরস্পরকে আমরা চিনতে পেরেছিলাম একটুও আশ্চর্য হইনি
আমরা চেয়েছিলাম হাতে হাত দিতে
কিন্তু কেউ কারো হাত ছুঁতে পারি নি আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
চল্লিশটা বছর।

বরফে জমাট অন্তহীন উত্তর সাগর এক
আর এখন যেটা পুশকিন স্কোয়ার তখনকার সেই স্ত্রাস্ত্নয় স্কোয়ারে বরফ
পড়তে শুরু করেছিল

কন্‌কনে ঠাণ্ডা বিশেষ ক'রে আমার হাতে আর পায়ে
অথচ পরে রয়েছি পশমের মোজা আর ফার-দেওয়া বুট আর দস্তানা
সে লোকটা ছিল এমন মোজার অভাবে পা কাপড়ে মোড়া
পুরনো ঝরঝরে বুট হাতদুটো আঢাকা

দুনিয়া বলতে তার মুখে ছিল কাঁচা আপেলের স্বাদ
হাতে এক চতুর্দশীর স্তনের দৃঢ়বদ্ধতা
গান ধেয়ে যায় মাইলের পর মাইল তার চোখে মৃত্যুর পরিমাপ এক হাতের
মতন

আর তার কিছুই জানা নেই তার কী ভবিষ্যৎ
একমাত্র আমিই জানি কী তার ভবিষ্যৎ
কেননা তার যা বিশ্বাস আমি সেই সব কিছুতেহ বিশ্বাস করেছি
যে মেয়েদের সে ভালবাসতে চলেছে তাদের সবাইকেই আমি ভালবেসেছি
যে কবিতাগুলো সে লিখতে চলেছে সে সবই আমি লিখে ফেলেছি
যেসব বন্দীশালায় সে থাকবে তার সব ক'টাতেই আমি থেকেছি
যে শহরগুলো দিয়ে সে যাবে তার সব ক'টাতেই আমি পদার্পণ করেছি
তার সমস্ত পীড়ায় আমি পীড়িত হয়েছি
তার সব ঘুম আমি ঘুমিয়েছি তার সব স্বপ্নই আমি দেখেছি
যা কিছু সে হারাবে সমস্তই আমি হারিয়েছি
মেয়েটির চুল খড়-রঙা আঁখিপক্ষ্ম নীল
মেয়েটির কালো ওভারকোটে সাদা কলার আর তাতে প্রকাণ্ড মুক্তোর মত
বোতাম

আমি দেখি নি

২

আমার উনিশতম বছর বেয়াজিৎ-চকের ভেতর দিয়ে যায় আর বেরিয়ে আসে
রেড-স্কোয়ারে

কঁকোর্দে নেমে যায় আবিদিনের সঙ্গে দেখা হলে আমরা চকগুলোর কথা বলি

গত পরশু গাগারিন গিয়েছিল ওদের মধ্যে যেটা বৃহত্তম তাকে চক্কর দিতে এবং
সে ফিরে এসেছে

তিতভ্ ও ঘুর্‌তে বেরোবে এবং এমন কি সাড়ে সতেরো বার ফিরে আসবে
যদিও এসবের এখনও কিছুই আমি জানি না

আবিদিনের সঙ্গে আমার হোটেলের চিলেকোঠায় ব'সে আমরা
আকাশ-মহাকাশ আর গড়ন-কাঠামো নিয়ে কথা বলি

আর সাইনে নদী নোৎর-দামের দুপাশেই বয়ে যায়
রাত্রে আমার জানলা দিয়ে দেখি তারকাপুঞ্জের তক্তাঘাটে একফালি চাঁদের
মত সাইনে নদী

আর পারীর বাড়ির ছাদগুলোর চিমনির সঙ্গে মেশা
আমার চিলেকোঠার ঘরে নিদ্রামগ্ন এক তরুণী
এমন অঘোরে কত বছর যে সে ঘুমোয় নি
তার খড়ের মত সোনালী চুল কোঁকড়ানো তার নীল আঁখিপক্ষ্ম
তার মুখমণ্ডলে মেঘ

আবিদিনের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছে পরমাণুর বীজের মধ্যেকার ফাঁক
আর পরমাণুর বীজের মধ্যেকার গড়ন-কাঠামো নিয়ে

আমরা বলি শূন্যে ঘূর্ণ্যমান রুমির কথা
আবিদিন সীমাহীন গতিবেগের রংগুলো আঁকে
রংগুলোকে আমি ফলের মত খেয়ে ফেলি
আর মাতিস হলেন এক ফলবিক্রেতা তিনি বিক্রি করেন নিখিল বিশ্বের ফল
আর আমাদের আবিদিন আর আভ্‌নি আর লেভ্‌নিও তাই
আর অনুবীক্ষণে আর রকেটের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা কাঠামোগুলো ফাঁকগুলো
আর রংগুলো

আর তাদের কবিকুল চিত্রকর আর সঙ্গীতশিল্পীরা
দেড়শো দৈর্ঘ্য ষাট প্রস্থের পরিমাপে আবিদিন আঁকে আগুয়ান উত্তাল
তরঙ্গ যেভাবে আমি দেখতে পাই আর জলে মাছ ধরতে পারি সেই রকম
আবিদিনের ক্যানভাসের ঝকমকে প্রবহমান মুহূর্তগুলো আমি দেখতে পাই
আর ধরতে পারি
আর একফালি চাঁদের মত সাইনে নদী
এক তরুণী এক একফালি চাঁদের ওপর ঘুমোয়

কতবার যে আমি তাকে হারিয়েছি কতবার যে আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি
এবং আরও কতবার যে আমি তাকে হারাব আর খুঁজে পাব
ঐ হল রাস্তা মেয়ে ঐরকমভাবেই আমার জীবনের খানিকটা
সেণ্ট মিচেল ব্রিজের ওপর থেকে সাইনের জলে পড়ে গেছে
আমার জীবনের সেই অংশটা মঁসিয়ে দুর্পঁ-র ছিপের মুখে এক সকালের
ঝিরঝিরে আলোয় ধরা দেবে
মঁসিয়ে দুর্পঁ সেটাকে জল থেকে টেনে তুলতে গিয়ে তার সঙ্গে উঠে আসবে
পারীর নীল ছবি দুর্পঁ আমার জীবনের অংশটার মাথামুণ্ডু কিছুই
বুঝে উঠতে পারবে না সেটা মাছের মত কিংবা জুতোর মত হবে না
মঁসিয়ে দুর্পঁ সেটা আবার টান মেরে ফেলে দেবে জলে তার সঙ্গে থাকবে পারীর
নিষিদ্ধ নীল ছবি
ছবিটা থেকে যাবে তার পুরনো জায়গায়
আমার জীবনের খানিকটা সাইনের সঙ্গে নদীগুলোর মহা সমাধিতে বয়ে যাবে
আমার ধমনীতে বয়ে-যাওয়া রক্তের মর্মরধ্বনিতে জেগে উঠলাম
আমার আঙুলগুলো ভারশূন্য
আমার হাতপায়ের আঙুলগুলো যেন এখুনি খসে যাবে আকাশে পাখা মেলতে
আর আমার মাথার চারপাশে গা ছেড়ে চক্কর দেবে
আমার ডান-বাঁ ব'লে ঊর্ধ্ব-অধঃ ব'লে কিছু নেই
আবিদিনকে বলতে হবে যেন আঁকে বেয়াজিৎ চকে যে লোকটা শহীদ
হয়েছিল তাকে আর কমরেড গাগারিনকে আর কমরেড তিতভ্‌কে যার
নামযশ বা মুখচ্ছবি এখনও আমার জানা নেই এবং তার পরে যারা আসবে
তাদের এবং চিলেকোঠায়
ঘুমন্ত সেই তরুণীকে
আজ সকালে আমি কিউবা থেকে ফিরেছি
কিউবা ব'লে যে জায়গা সেখানে ষাট লক্ষ লোক সাদা-কালো-হলুদ-মুলাটোর
দল রুয়ে দিচ্ছে বীজ মহানন্দে বীজের সেরা বীজ
আবিদিন তুমি কি আঁকতে পারো সুখ
কিন্তু তাই ব'লে তুড়ি দিয়ে অনায়াসে নয়
গোলাপী গালওয়ালা শিশুকে স্তন্যপান করানো দেবী-প্রতিমার মত মুখওয়ালা
জননীর ছবি নয়

সাদা কাপড়ে রাখা আপেলফলও নয়
নয় মাছপুষিতে চারদিকের বুদ্‌বুদের মধ্যে ছুটোছুটি করা সোনালী মাছ
আবিদিন তুমি কি আঁকতে পারো সুখ
তুমি কি পারো আঁকতে ১৯৬১-র মধ্যনিদাঘের কিউবা
শিল্পাচার্য তুমি কি আঁকতে পারো কী মহিমা আহা কী মহিমা আমার দেখা
হয়েছে সেইদিন এবার আমি মরতে পারি আর কোনো দুঃখ থাকবে না
তুমি আঁকতে পারো হায়রে-হায় হায়রে-হায় আমরা আজ সকালেই জন্ম
নিতে পারতাম হাভানায়
আমি একটা হাত দেখেছিলাম সমুদ্রের অদূরে হাভানার ১৫০ কিলোমিটার
পুবে
আমি একটা হাত দেখেছিলাম দেয়ালে
দেয়ালটা ছিল একটা দিলখোলা গান
হাতটা আদর করেছিল দেয়ালটাকে
হাতটার বয়স ছিল ছ মাস এবং তার মা-র ঘাড়ে টুস্‌কি মারছিল
হাতটার বয়স ছিল সতেরো বছর এবং মারিয়া-র স্তনযুগকে সোহাগ করছিল
তার তালু ছিল রুক্ষ আর তাতে ক্যারিবিয়ানের গন্ধ
তার বয়স ছিল কুড়ি বছর এবং সে তার ছ-মাস বয়সের ছেলেটার ঘাড়ে
টোকা মারছিল
হাতটার বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং সেই হাত কেমন ক'রে সোহাগ করতে
হয় ভুলে গিয়েছিল
হাতটার বয়স ছিল তিরিশ বছর এবং আমি সেটাকে দেখেছিলাম হাভানায়
১৫০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রোপকূলের একটি দেয়ালে হাত দিয়ে দেয়ালকে
আদর করতে
আবিদিন তুমি হাত আঁকো আমাদের শ্রমজীবীদের আর লৌহশ্রমিকদের
হাত আঁকো কাঠকয়লা দিয়ে আঁকো কিউবার মৎস্যজীবী
নিকোলাসেরও হাত
কিউবার মৎস্যজীবী নিকোলাসের হাত যে কো-অপারেটিভের কাছ থেকে
পাওয়া ঝকঝকে বাড়িটার দেয়ালে পুনরাবিষ্কার করেছে আদর-সোহাগ
এবং সেটা সে আর কখনই হারাবে না
একটা জব্বর হাত

সামুদ্রিক কচ্ছপের মত একটা হাত
যে হাত এখন বিশ্বাস করে না একটা দিলখোলা দেয়ালকে সে আদর
করতে পারে
যে হাত এখন সব আনন্দআহ্লাদেই বিশ্বাস করে
একটি রৌদ্রালোকিত লবণাক্ত পূতপবিত্র হাত
আশাভরসার যে হাত ফিদেলের মুখের কথার মত উর্বর মাটিতে জাগিয়ে
তোলে সবুজ অঙ্কুর আর আখের গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে মধুময় হয়
১৯৬১-র কিউবায় ঐ হাতগুলোরই একটি রোপণ করে ভারি রংচঙে স্নিগ্ধ
বৃক্ষের মতন
বাড়ির পর বাড়ি আর খুব আরামদায়ক বাড়ির মতন গাছের পর গাছ
ঐ হাতগুলোরই একটি ইস্পাত ঢালবার জন্যে তৈরি হচ্ছে
যে হাত তৈরি করছে মেশিনগান থেকে গান আর গান থেকে মেশিনগান
যে হাত মিথ্যাবিরহিত মুক্তির
যে হাতে হাত রেখেছেন ফিদেল
যে হাত তার জীবনের প্রথম পেন্সিলে তার জীবনে প্রথম কাগজে লেখে
স্বাধীনতা কথাটা
যখন স্বাধীনতা কথাটা বলে তখন সিক্ত হয় কিউবানদের রসনা
যেন তারা কামড় দিচ্ছে মিষ্টি তরমুজে
আর পুরুষদের চোখ চকচক করে ওঠে
আর মেয়েরা গলে যায় যখন স্বাধীনতা কথাটা তাদের অধর স্পর্শ করে
আর বুড়োমানুষেরা কুয়ো থেকে উঠিয়ে আনে তাদের মধুরতম সব স্মৃতি আর
আস্তে আস্তে তাতে চুমুক দেয়
আবিদিন তুমি আঁকতে পারো সুখ
তুমি কি আঁকতে পারো স্বাধীনতা কথাটা এমনভাবে যাতে থাকবে না মিথ্যে
পারীতে নামছে রাত্রি
নারাঙ্গার বাতির মত নোৎর্‌দাম্‌ জ্ব'লে উঠে আবার নিভে গেল
এবং পারীতে নতুন আর পুরনো সমস্ত ইটপাথর নারাঙ্গার বাতির মত জ্ব'লে
উঠল আবার নিভে গেল
আমি ভাবি আমাদের কারুশিল্প কবিতা সঙ্গীত রচনা ইত্যাকার যাবতীয় বিষয়ে
আমি মনে করি এবং তলিয়ে বুঝি

সর্বপ্রথম মানুষের হাত সর্বপ্রথম গুহার সর্বপ্রথম বাইসনের ছবি আঁকার
সময়ের পর থেকে এক মহানদী বয়ে চলেছে
নতুন নতুন মাছ নতুন নতুন জল ঘাস নতুন নতুন আস্বাদ নিয়ে তাতে এসে
মিশেছে সমস্ত জলধারা এবং একমাত্র এই মহানদীই অন্তহীনভাবে
বয়ে চলেছে এবং কখনও মজে যাবে না

মনে করা হয় পারীতে কোথাও একটা কাঠবাদামের গাছ আছে
পারীর সব কাঠবাদাম গাছের আদি পারীর সমস্ত কাঠবাদাম গাছের পূর্বপুরুষ
গাছটা এসেছিল ইস্তানবুল থেকে এবং বস্‌পরাসের পাহাড় থেকে এসে ডেরা
বাঁধে পারীতে

আমি জানি না প্রায় শ'দুই বছরের পুরনো এই গাছটা আজ অবধি বেঁচে
আছে কিনা

আমার ইচ্ছে করে একবার গিয়ে তার হাতে ঠোঁটদুটো ছোঁয়াতে
আমার খুব ইচ্ছে করে একবার আমরা গিয়ে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ি
সেইসব মানুষ যারা এ বইয়ের জন্যে কাগজ বানায় যারা
এর ছাপার অক্ষর সাজায় যারা এর আঁকা ছবিগুলো ছাপায় সেইসব মানুষ
যারা তাদের দোকান থেকে এই বই বিক্রি করে যারা পয়সা খরচ করে আর
এই বই কেনে

এবং চোখ রাখে এর পাতায় আর আবিদিনকে আর আমাকেও দেখে
আর সেইসঙ্গে দেখে আমার জীবনের খড়-রঙা ফ্যাসাদ

১৯৬১, ট্রেন, ওয়ারস', ক্র্যাকৌ, প্রাহা, মস্কো, পারী, হাভানা, মস্কো

আমার অন্তিমে

আমার শবযাত্রা শুরু হবে কি আমাদের উঠোন থেকে ?
চারতলা থেকে কেমন ক'রে আমাকে তোমরা নামাবে ?
লিফ্‌টে কফিন তো আঁটবে না,
আর সিঁড়িও তো অসম্ভব সরু।

উঠোনে হয়ত থাকবে হাঁটু অবধি রোদ্দুর, আর পায়রা,
হয়ত থাকবে বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে মুখর বরফ,
হয়ত জলেভেজা শানের ওপর বৃষ্টি।
আর উঠোনে থাকবে, যেমন চিরটা কাল থাকে, ময়লা ফেলার টিন

এখানকার রেওয়াজমত মুখ খুলে ট্রাকের ওপর যদি আমাকে শোয়ায়
কোনো পায়রার একটা কিছু আমার কপালের ওপর পড়তে পারে ; ওটা
কপাল ভালোর লক্ষণ।
ব্যাণ্ড বাজুক না বাজুক, বাচ্চার দল আমার দিকে দৌড়ে আসবে,
কেউ মারা গেলে ওদের কৌতূহলের সীমা থাকে না।

আমাদের রান্নাঘরের জানলা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখবে
আমি চ'লে যাচ্ছি
ভিজে কাপড় মেলে দেওয়া আমাদের গাড়িবারান্দাটা
আমাকে হাত নেড়ে বিদায় দেবে।
এই চত্বরটাতে আমি যে কী সুখে ছিলাম তোমরা কেউ
কোনোদিন জানবে না।
পড়শীরা আমার, আমি কামনা করছি তোমরা দীর্ঘজীবী হও॥

এপ্রিল ১৯৬৩

একটু পা চালিয়ে, ভাই

গানে রেকর্ড-করা

কিন্নরকণ্ঠ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

আনন্দ

রাস্তার ছোট ছোট গর্তে
জমানো ছিল
আমাদের চোখের জল।

একটুও না দাঁড়িয়ে
তার ওপর দিয়ে
লাফাতে লাফাতে চলে গেল
সময়।

শুধু একজন হাঁটু মুড়ে
নিচু হয়ে
জলে-পড়া আকাশটাকে
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয়—

আর ঠিক তখনই
তার সিঁথি থেকে ঠিক্‌রে
আকাশের গায়ে
আনন্দের রং লাগে॥

সাধ

দু দেয়ালে রুজু রুজু
    দুটো ছবি
        টাঙানো পেরেকে।

একটিতে কাঁটায় বিদ্ধ
যীশুখ্রীষ্ট।

অন্যটিতে
হেলায় করেন কর্ণ মৃত্যুকে বরণ
রথের চাকায় হাত রেখে।

দুটোই জলজল করছে।
বিধিবহির্ভূত দুটি
চিরঞ্জীব
জন্মের মহিমা।

তার নিচে
যেখানেই থাকো—
একবার ফিরিয়ে ঘাড়,
দেখ, কুমারী মা :

বাইরে চলে সারাক্ষণ অক্লান্ত বর্ষণ
থেকে থেকে চম্‌কাচ্ছে বিদ্যুৎ
জন্মাষ্টমীর মত অন্ধকার
এই আলো-নেভানো শহরে।

দেখ, ঘর আলো ক'রে
জন্মদুঃখী মা আমার
সুখস্বপ্নে
একহাতে চিবুক
অন্য হাতে
ভারবহনের গর্বে ধরে আছে
জানলার গরাদ।

জেনে তুমি সুখী হও—
কাল তার সাধ॥

আজ আছি কাল নেই

১

হেমন্তের হলদে পাতার মতন
হায়, আমার
এই দিন-আনি দিন-খাই
লেখার আয়ু।

শীত পড়লে
এক জায়গায় স্তূপাকার ক'রে
লোকে উবু হয়ে ব'সে
আগুন পোহাবে।

পাতাগুলোর এক বর্ণও
কেউ মনে রাখবে না।

যেমন
আমিও মনে রাখি নি
কে কবে কেমন ক'রে
আমাকে বোকা পেয়ে
এই জিনিসটা
হাতে ধরিয়ে দিয়ে
চলে গিয়েছে।

আজ আমি ঠিক আমারই মতন
একজনকে খুঁজছি
যার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে পারি—
ভাই, একটু ধরো তো
আমি আসছি।

বাংলাভাষার এই এক মাধুর্য—
আসছি ব'লে
স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া যায়।
নাকি আমরা আদতে যাই না
আসি

নদী যেমন আসছি ব'লে
নাচতে নাচতে
মোহানায় ছুটে যায়

আবার বৃষ্টির জল হয়ে
চক্রাকারে ফিরে আসে উৎসে।
তেমনি কি ?

কী জানি।

২
ভালো কথা, কাল এই শহর
ডুবে গিয়েছিল বৃষ্টিতে।
লেখার কাজে
জল ভেঙে আমাকে বেরোতে হয়েছিল রাস্তায়।
শহরের অন্য সব কাজ কাল বন্ধ ছিল।

ছপাৎ ছপাৎ ক'রে আমি রাস্তা পার হচ্ছিলাম
আমার সাদা চুল ঢাকা পড়েছিল
জল-রোখা টুপিতে।
তবু আমাকে চিনতে পেরে
রিকশায় যেতে যেতে দুজন তরুণ কবি হাত নাড়ল।
আমার মনে হয়, তারাও চলেছিল লেখারই ধান্ধায়।

জল উপ্‌ছে নাকি মাছ বেরিয়ে এসেছে,
কলোনির একজনের কাছে শুনেছে
মিষ্টির দোকানের ছেলেটা।
তার কাছ থেকে
খবরটা পেয়েই আবার তক্ষুনি আমাকে ছুটতে হল
লেকের দিকে।
মাছ পাই নি,
ইস্‌, কপালটাই খারাপ।

এমন কি, বিনামূল্যে বিলোবার মত
একটা কবিতাও নয়।

৩

পরের বাড়িতে আছি, তা প্রায়
চল্লিশ বছরের কাছাকাছি।
অবশ্য বিনা পয়সায় নয়,
পুরনো ভাড়ায়।
আর
মনে করিয়ে না দিলে
কখনও মনেই হয় না এ বাড়ি
আমাদের নিজের নয়।

এক চিলতে জমিতে আগে ছিল
তিনটে পেঁপে গাছ
লাউগাছ ছিল, কখনও ফল ধরে নি।
পেয়ারা গাছে এখন নিয়ম ক'রে
বছরে দু'বার পেয়ারা হয়।
বাড়ি বাড়ি ডিম বিলোনো হত
যখন এক ডজন মুরগি ছিল।

লাথিঝাঁটা আর শাপমুন্যিগুলো
দুম দুম ক'রে
রোজ দু' বেলা সিঁড়ি দিয়ে ওঠে নামে।

বাড়ির মালিক খুব সজ্জন।
এসে খুব সুন্দর ক'রে বোঝান
কেন অবিলম্বে আমাদের উঠে যাওয়া উচিত

লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে থাকি।
তখন আমার নজরে পড়ে
একরাশ স্মৃতি বুকে নিয়ে
আমার পা দুটো ধ'রে রয়েছে
তিন পুরুষের চেনা মেঝে।

ছোট মুখে বড় কথা ছাড়া
তখন আর কীই-বা আমি বলতে পারি—

দয়া ক'রে আর কিছুটা সময় অপেক্ষা করুন
শুধু এই বাড়ি নয়
দুনিয়াটাই আমি বদল করব।

আমাকে এইটুকু থেকে দেখে আসছেন—
এ বাড়ির মালিক খুব সজ্জন।
আমার আশাবাদ তাঁর নাগাল পায় না,
জিভ কেটে বলেন,
ছি, ও কথা বলতে নেই,
বালাই ষাট!

কিন্তু ইদানীং আমি বুঝে উঠতে পারছি না
বিরুদ্ধ পক্ষের কোনো দুঁদে উকিল

আমাদের ছটো শয়তান কুকুরকে
আর চারটে লুভিষ্টি বেড়ালকে
লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু খাওয়াচ্ছে কিনা।
নইলে –

আমার ভয় হয়,
শেষটায় ওদের জ্বালাতেই কি আমাদের
বাড়ি ছাড়তে হবে ?

৪

দূরের কথা
এখন দিব্যি ঘরে ব'সে
শুনতে পাচ্ছি।
বাড়িতে টেলিফোন এসেছে।
শুনেছেন বোধহয়,
আমার এখন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।
আপনাকে বলা হয় নি
ধার চেয়ে বসবেন,
এই ভয়ে।

সব ব্যাটাকেই আমার দেখা আছে
ধার নিলে আর শোধ দেবার নাম করে না

এখন আমি বাড়ি করছি
গাড়ি করছি
মদ খাচ্ছি
মেয়েমানুষ রাখছি
গড়াগড়ি দিচ্ছি
ঘুরছি
উড়ছি

টাকা হলে বেশ লাগে। বলুন?
খুব জুতোতে ইচ্ছে করে।

চালাও পান্‌সি বেলঘরিয়া।

৫

আপনি তো আজ আছেন কাল নেই
মানে,
এ দেশে—

শুনে শুনে কান পচে গেল।
আমি যত দূরে যাই
তত কাছে আসি।
আকাশে উঠলে
একটু মাটির জন্যে আমার কী যে হয়
কাউকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

যখন আমি বাইরে যাই
ভাষা না জানলেও
একা একা আমি হাঁটি

কখনও ভিড়াক্রান্ত শহরের রাস্তায়
কখনও গ্রামগঞ্জের ধূ ধূ করা মাঠে।
মাটির পাশে মাটি
মুখের পাশে মুখ রেখে রেখে
মনে মনে হিসেব করি
কী করলে কী হয়
কী ক'রে ফোটাতে হয়

বাগানে বাগানে ফুল
আর মুখে মুখে হাসি
লোভের আগাছাগুলোকে কেমন ক'রে
উপড়ে ফেলতে হয়।

আমি তাই যাই
আমি তাই আসি।

যাতে সহজেই চেনা যায়
আমার দরজায় লিখে রেখেছি :
'আজ আছে।
কাল নেই।'

সত্যি কথা বলতে কি
আমার সামনে—

শুধু আজ আছে,
কাল বলে কিছু নেই।

গোলকধাম

ডানা-কাটা পরী বলে,
'বুড়্হ,
একবার খতম হলে খেল্
তারপর স্বর্গে যাবি?
দূর হ—
বলিহারি তোর এই আক্কেল!

'ফের যদি দেখেছি গির্জায়!

উঁহু,
সাধুসন্তেরও কাছে না।
গায়ে দিবি বাহারে মেরজাই,
ফুল কিনবি—
হোক ধারদেনা।

'তুই চোখ বুঁজলে চোখ টেপে
ছাই-মাখা
গুখেকোর বেটা
মালকড়ি দেয় সব ঝেঁপে
শুঁড়ি গণৎকার গাঁট-কাটা।

'এই নরকে ছাখ্‌, দিই পেতে
নতুন
গোলোকধাম খেলা।
সশরীরে স্বর্গে চাস যেতে?
আয় কাছে,
আয় এই বেলা।'

বিশ্বাস ছিল না,
গেল তবু—
কী আশ্চর্য, সে বুড়ো মিস্তিরি
নরকের দ্বার খুলে,
প্রভু,
পেল স্বর্গে পৌঁছুবার সিঁড়ি॥

হিংসে

যাবার আগে মিটিয়ে নেব
যার যার সঙ্গে আড়ি

উঠলে ঝড় ছুটব বাইরে
তারপরে তো বাড়ি

ঠিক করি নি কিসে যাব
হেঁটে না সাইকেলে

ঝনঝনালে পকেটে পয়সা
মাটিতে দেব ফেলে

মাটি কাঁপছে, কাঁপুক—
চল্ রে ঘোড়া,
হাতে তুলেছি চাবুক

মুখপুড়িটা তাকাচ্ছে দ্যাখ্
বলছে, আ মর মিন্সে

ও কিছু নয়, বুঝ্লি না রে
হিংসে হিংসে হিংসে ॥

মরুভূমির হাওয়ায়

আমি কখনও ভুলি না
কিভাবে
তুমি আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলে
এক শোকের রাত্তির।

আকাশের চোখে ধুলো দিচ্ছিল
বাইরে
মরুভূমির হাওয়া।

অন্ধকারে রিনটিন্ রিন্‌টিন্ ক'রে
একদল উট
বেশ একটু নাক-উঁচুভাবে
শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল।

রাস্তার ওপাশে ওটা কী গাছ
আমি জানি না।
বাগানে ফুটে আছে ওটা কী ফুল
আমি জানি না।

আমি পরদেশী,
এ শহরে
নতুন।

কিছুটা দূরে
মাটি থেকে একটু উঠে
গাড়ির আলোগুলো
সারাক্ষণ ঊর্ধ্বশ্বাসে
নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি খেলছিল।

যেন কোনো পোড়-খাওয়া মানুষের
কপালের রেখা।
হঠাৎ আমার চোখের জল পাথর হয়ে গিয়ে
ভয়ঙ্কর ভারী ক'রে তুলেছিল
আমার কাঁধের ওপর চেপে বসা
এক অদৃশ্য শবাধার।
আমি সেইদিন বুঝেছিলাম
জীবনের ভার মৃত্যুর চেয়ে হালকা।

আমার মনে পড়েছিল
এক নিষ্ফল জীবনের কথা।
নিজের দেশ, নিজের কালের কথা।
আমার মন কেমন করছিল।
হাতের ঘড়িতে
ধ'রে রেখেছিলাম আমার দেশের সময়।

আমি পরদেশী,
এ শহরে
নতুন।

আমার দিকে
গড়িয়ে গড়িয়ে আসছিল সহানুভূতির শব্দ,
হাত বাড়িয়ে দিয়ে
তার একটিকেও আমি ধরতে পারছিলাম না।

হঠাৎ উঠে এসে
তুমি আমার হাত ধরেছিলে
নিঃশব্দে।

কোনো কথা না ব'লে

কিভাবে
আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলে সেই শোকের রাত্তির -

তুমি ভুলে গেলেও আমি কখনও ভুলি না ॥

হয় না

কবিতা চান ? মাপ করবেন,
হয় না ।

কলমটা ঠিক কল নয় তো,
কবিরাও নয়
দাঁড়ের ঠিক ময়না ।
হয় না ।

আপনি মশাই,
পেট চিরে চান মুক্তো—
জানেন তো না কী যন্ত্রণা
মুচ্‌ড়ে ওঠে পাতায় পাতায়
যখন ছাপেন একটি ক'রে সূক্ত

কবিতা চান ? মাপ করবেন,
ধৃষ্টতা এই—
আপনি চান গয়না ।

হয় না, ভাই
হয় না ॥

এখন

আমরা কলম নামিয়ে রেখেছি মাটিতে

এখন তোমরা তোমাদের চোখ
সরিয়ে নিতে পারো।

এখন আমাকে ঘিরে
মাথায় আকাশ-ভাঙা অন্ধকার
আমার আস্তিনের আড়ালে এখন
গুটিয়ে রাখা বিদ্যুৎ
ঝড়ের বেগে বয়ে চলেছে
মা, মা-গো ব'লে ক্ষিধেয় ককিয়ে-ওঠা
এক কবন্ধ চিৎকার।

আমার একটা অসাড় হাত
আমি দেখতে পাচ্ছি
সমানে সর্বনাশের দিকে ছড়ানো—
আমি চাইছি প্রাণপণে হাতটা উঠিয়ে আনতে
কিন্তু পারছি না।

চাইছি
কিন্তু পারছি না॥

বাইরে থেকে ভেতরে

যতদূর যায় দৃষ্টি—
বৃষ্টি শুধু
    বৃষ্টি আর
        বৃষ্টি···

নতুন দেশ
    অচেনা নাম
        অজানা অক্ষরে।

সারাটা দিন নিঃসঙ্গ একা
চেয়ারে দিয়ে ডুব
ব'সে রয়েছি আকাশ মুখে ক'রে—
পা টেবিলে রাখা।
                বাইরে তখন বৃষ্টি খুব···

চৌকো ফ্রেমের চলচ্চিত্রে
জলমোছা রং,
ভিৎশূন্য অলীক বাড়ি
তার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক
    কুয়াশা খোলে বন্ধ তোড়ং

পাচ্ছি ভয়—
    এখানে নয়,
    এখন নয়,
        চুপ
            বাইরে তখন বৃষ্টি খুব···

রেডিও খোলা,

দূরের স্টেশন,
বেজে চলেছে করুণ সুরে চেলো।

বইয়ের পাতায়
বাতাস এলোমেলো।
বেদুইনের ঘোড়ার খুরে
রক্তে লাগে দোলা।

উঠছে লিফ্‌ট,
জুতোর শব্দ,
টোকা—

যৌবনকে ভেতরে আন, বোকা॥

টুল

আপিসবাড়ির দেয়ালে,
সিঁড়ির কোণগুলোতে
ঝাঁঝরির আগে পিছে,
কার্নিসের ঢালে

লাল ফিতের নকলে
চাপা-পড়া ফাইলের কথা
মক্কেলদের মনে করিয়ে দেয়
পানের পিক।

এ-নেতা সে-নেতার শ্রাদ্ধ করতে থাকে
উঠোন জুড়ে

বি এ পাশ
থুথু।

টিফিনের সময়কার
অক্ষরযুক্ত ঠোঙার কাগজের মত
আর নিরক্ষর শালপাতার মত
অসংখ্য বেকার

এ-দাদা সে-দাদার পায়ে আঠার মত লেগে
পানের পিক আর থুথু দিয়ে
আরও একটা প্রজন্ম বরবাদ করতে
করজোড়ে প্রার্থনা করছে—

ঘরের ভেতর একটা মাছি-মারা চেয়ার
কিংবা নিদেনপক্ষে
বারান্দায় ব'সে ঢুলবার জন্যে
একটা টুল॥

শুভরাত্রি

মহাশয়, বাংলায় শুভদিন আছে—
হায়,
শুভরাত্রি ব'লে কিছু নেই।

ব্যোম কালী ব'লে
বোতল খালি ক'রে
গেলাস নামিয়ে রেখেছি

নিঃশব্দে
এখন আমাকে উঠে যেতে হবে।

ওপর-ওপর আলো ফেলে
যা আছে শুধু সেইটুকুই
দিন দেখাতে পারে।

রাত তাকে টেক্কা দেয়
অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে।
তার এক মুঠোয় উঠে আসে স্মৃতি,
অন্য মুঠোয় আশা।

কথা দিয়ে,
কথা না রেখে,
জুতোর সুখতলায়
ক্ষইয়ে দিয়েছি
আমার গোনাগাঁথা দিন।

এখন আমার হাতে রইল
ভয়তরাসে এই রাত্তির।

আমি সাহস দিয়ে
তার গলায় গান ফোটাব।

দেয়ালগুলো আজ যে নামই
জপুক—
উঠতে বসতে বিষম লাগছে।

মাথাগুলো চাপড়ে দিয়ে বলি—
হেই গো দাদা,
শুভরাত্রি॥

যেখানে ব্যাধ

এখান থেকে একটা নেয়
ওখান থেকে দুটো
এমনি ক'রে বাসা বানায়
কুড়িয়ে খড়কুটো

যখন ডাকি আয় রে পাখি
ধরা দে
হারিয়ে খেই বুকের এই
গরাদে

একটিবার ফিরিয়ে ঘাড়
সহসা অপ্রস্তুত
বাঁকানো ঠোঁটে চম্‌কে ওঠে
চোখের জলবিদ্যুৎ

রয়েছে সাধ ভালবাসার
সাহস নেই কাছে আসার
কে জানে ব্যাধ পেতেছে ফাঁদ
ছড়ানো কোন্‌ দানায়

হাত বাড়াতেই হালকা ডানায়
আলগা ক'রে মুঠো
অবহেলায় উড়ে পালায়
অন্য কোথাও দ্রুত

এখান থেকে একটা নেয়
ওখান থেকে দুটো
এমনি ক'রে বাসা বানায়
কুড়িয়ে খড়কুটো ॥

টলতে টলতে

১

হাতে রঙীন রুমাল নাড়তে নাড়তে
তারের উপর দিয়ে হাঁটছি

এখন সমস্ত জগৎসংসার
শুধু একটা টানের মধ্যে এসে ঠেকেছে

এ সময় কি আমাকে জিগ্যেস করা ভালো
জীবন কী এবং কেন
 কিংবা কেমন ক'রে আমি বেঁচে রয়েছি ?

একদল নিচে দাঁড়িয়ে খিল খিল ক'রে হাসছে
একদল চোখ তুলে মাপতে চাইছে
 আকাশের সঙ্গে তারের
 তারের সঙ্গে মাটির কতটা ফারাক—

 ভীতুর দল চোখ বন্ধ করে আছে।

কেউ বলছে লাফ দাও
কেউ বলছে গলায় প্যাঁচ লাগিয়ে ঝুলে পড়ো

যারা মজা পেতে
আর যারা মজা দেখাতে চাইছে
তারা সবাই একসঙ্গে
 থেকে থেকে হাততালি দিচ্ছে—

 কানে আঙুল দিচ্ছে চোখবন্ধ ভীতুর দল

আমি খুব আস্তে আস্তে
পা টিপে টিপে এগোচ্ছি—

মুখ তুলে
নীচে অনন্তকাল ওরা দাঁড়িয়ে থাক।

২

আমরা যারা একই পা-দানিতে
বুঝলে হে, রড ধ'রে প্রাণ হাতে নিয়ে
এই সেদিনও ঝুলতে ঝুলতে গিয়েছি—

দু'একজন ছিটকে পড়েছে চাকার তলায়
আর দু' একজন, কী বলব মশাই—
নিজেরা গাড়ি হাঁকিয়ে
আমাদেরই গায়ে কাদা ছিটিয়ে যায়।

আমি হাঁটতে শিখে
বুকের মধ্যে চয়ন করেছি সেই আগুন
যে সব কিছুর কোথায় শেষ তা জানে।

সে তো গাছের ফুল নয়
হাত বাড়ালেই কেউ ছিঁড়ে নিতে পারবে?

দেখ, আমার হাতের মুঠোয়
আমাদের সর্বস্ব ধরা রয়েছে।

আমাদের এ এক অদ্ভুত বাড়ি
রক্তের চেয়েও এক নিবিড়তর সম্পর্কে
নিজেদের আমরা জড়িয়ে রেখেছি।

এ বাড়িতে না থাকলেও আছে
প্রত্যেকের একটা ক'রে জন্মদিন।

আজ আমাদের বিয়ের পঁচিশ বছর
কয়েকজন বন্ধুকে বলেছিলাম আসতে···

আজ আমাদের বিয়ের পঁচিশ বছর···
কয়েকজন বন্ধুকে বলেছিলাম···

আজ আমাদের বিয়ের···
কয়েকজন বন্ধুকে···

আজ আমাদের···

সারাদিন ঘুরে ঘুরে
সন্ধ্যেবেলা খালি হাতে।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের চাঁদায়
বিয়ের পঁচিশ বছরে
হঠাৎ দেখি তারের ওপর দিয়ে

টলতে টলতে চলেছি ॥

যাব না সভায়

যে আমাকে চায় আমি তার কাছে যাব

গলায় খেলে না সুর
তবু আমি গাইব গান মৃদঙ্গ বাজাব

বৃষ্টি এলে
বাইরে বেরোব ভিজতে

নদী যদি পারে যেন আমাকে ডোবায়

আমি যেতে চাই না তীর্থে
পুণ্যে নেই লোভ

কেন ডাকো
মন নেই, যাব না সভায় ॥

হিকোরি চিকোরি

ইংরিজির পুচ্ছে
ডাল ধরেছি উচ্চে

নইলে কে আর
করত কেয়ার

আজ সকলেই পুঁচছে।

জ্ঞানের ঝুলি ভিক্ষার

উচ্চারণে হিক্কার
ভাবটা থাকে

তারই ফাঁকে
বাংলাকে দিই ধিক্কার ॥

ঝুলতে ঝুলতে

এখন আমার হাড়ে দুব্বো গজাচ্ছে
শিরদাঁড়ার ব্যামোয়।
ভিড়ের বাসে এক পায়ে ঝুলতে ঝুলতে
শিরায় টান ধ'রে
মুঠো যখন আল্‌গা হয়ে আসে

টেলিগ্রাফের তারে
বৃষ্টির শেষে জলের ফোঁটার মত
যখন আমি টলমল করি

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে
আমার খুব কষ্ট হয়।

আমি আজও মনে করে রেখেছি
বড়দের সেই বারণ :
চলন্ত গাড়ি থেকে পেছনদিকে মুখ করে
কক্ষনো নামতে নেই।

আমার যে বন্ধুরা পৃথিবীকে বদ্‌লাবে বলেছিল
ত্বর সইতে না পেরে
এখন তারা নিজেরাই নিজেদের বদ্‌লে ফেলছে।

আমি এক পায়ে এখনও পা-দানিতে ঝুলছি।
মুঠো আল্‌গা হয়ে এলেও, আমার কপাল ভালো,
ঘাড় ফিরিয়ে
কিছুতেই পেছনে তাকাতে পারছি না॥

না কী বলেন

ভাবছি।
 একটা গাড়ি কিনব ?
 নাকি একটা বাড়ি ?

আমার মতে, গাড়িই ভালো—
 নাকি বলেন, বাড়ি !

বাড়ি হলেও মন্দ হয় না
কিন্তু দেখুন, গাড়ি—

কত স্থবিধে। মনে করলেই
 ডায়মণ্ডহারবার
কিংবা ধরুন, উইকেণ্ডে রাঁচি।

নো-মশা, নো-মাছি।

তেলের ব্যাপার তা অবিশ্যি,
 গাড়ির বেলায় ঐ
একটাই যা মুশকিল।

সেদিক থেকে বাড়ি থাকলে
খরচা নেই, থাকলেও সামান্যই।

বরং বাড়ি ভাড়া দিয়ে
 সেই টাকায় গাড়ি
চড়া যায় বেশ মনের স্থখে।

আমি বলি কি,

তার চেয়ে কি ভালো নয় কেনা

একই সঙ্গে বাড়ি এবং গাড়ি ?

জাগ্রত

কে কোন্‌খানে ঘুমোন সেটা
একেবারই গৌণ
দেখব তিনি কোথায় জেগে
কোথায় নন মৌন

কোথায় ভাঙেন শিকল, বাঁধেন
ভাইয়ের হাতে রাখী
মনের কথা মুখে আনতে
করেন পরোয়া কি

তিনি কোথায় ঘুমোন সেটা
আমার চোখে বাহ্য
কোথায় জেগে আছেন তাই
একমাত্র গ্রাহ্য

গুণীকে দেন মালা কোথায়
খুনীকে দেন সাজা
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে
তাকে করেন রাজা

কে কোন্‌খানে ঘুমোন সেটা
আমি করি না গণ্য

খুঁজব তিনি জেগে আছেন
কোথায় কিসের জন্য

কোথায় তিনি শান্তির রথ
সাজান ময়ূরপঙ্খে
ঝড়ের বেগে গড়েন দেশ
ফুঁ দেন মুক্তিশঙ্খে

তিনি কোথায় ঘুমোন সেটা
আমার কাছে গৌণ
দেখব কোথায় আছেন জেগে
কোথায় নন মৌন ॥

সাজা চাই

চারদিকে থই থই করে জল।
মুখ যেই বাড়ায় তান্তালস
সঙ্গে সঙ্গে এক গণ্ডূষে
মাটি নেয় শুষে।

সামনে ঝুলছে রাশি রাশি ফল।
হাত যেই বাড়ায় তান্তালস
ঠেলে দেয় ডাল হাওয়া এসে
চোখের নিমেষে।

পুত্রহন্তা তান্তালস।
দৈবের বিধানে
তার এই সাজা।

এদিকে 'জল দাও' ,জল দাও' বলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুনিয়াতে
আরও বড় নরান্তক খুনী এক।
সেজেছে সে রাজা।

তার হাতে
শুধু তো পুত্রের নয়,
পিতাপুত্র
জনকজননীবধু
আত্মীয়কুটুম্ববন্ধু স্বজাতির ছিন্নমুণ্ড।

জ্বালা হল অগ্নিকুণ্ড।
ছুটে এসো,
যে আছ মানুষ।

ইস্রাফিল, শিঙা তোর বাজা।

তাহলে বিচার হোক।
তান্তালস যা পেয়েছে
আততায়ী যেন পায় তার চেয়ে আরও বেশি সাজা॥

বাঘের আঁচড়

থু
থু
থু...

এই একটি শব্দে
গলা চিরে
এবার আমি আগুন ওগরাব।

নরকের সেই রাত,
সাপের মত বুকে-হাঁটা ট্যাঙ্কের সেই চাকা,
বৃষ্টি-ধোয়া ঘাসের ওপর শোয়ানো
নিহতদের শব···

সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও শালুক ফুল,
আমি চোখ চাইতে পারছি না ঘৃণায়
শেকলের ঝনঝনার সঙ্গে
বাতাসে নোংরা হাতের গন্ধ।

আমি আমার ছেলেবেলার মতন
মাঝের আঙুলটা তর্জনীতে তুলে দিয়েছি,
হাঁটুর নিচে কেটে রেখেছি
বাঘের আঁচড়
যাতে ওরা ছুঁয়ে দিতে না পারে।

মাটিতে কান পেতে শুনছি :
আরও একবার জলন্ত লাভাগুলো
ওগরাবার আগে
আগ্নেয়গিরি
থুথু ফেলে ফেলে
গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছে॥

কমলেকামিনী

খবরের কাগজের পোকারা
যা পায় তাই খায়।

কবিরা লাইন বেঁধে শিরোনাম লেখে,
গল্পকাররা খবর।
ঠিক ঠিক মশলা পড়লে
মাথার শিং থেকে পায়ের খুর,
সত্যি বলতে,
কিছুই তেমন ফেলা যায় না।

মাইনে-করা কলমগুলো
সমানে কালি ছিটিয়ে
দিনকে রাত করে,
ছোটদের হাত করে,
বড়দের কাত করে।
খবরের কাগজের পোকাদের
সেই সকাল থেকে
মুখ চলে।

যত না খায়
তার চেয়ে ঢের বেশি
তারা ওগরায়॥

কোথায়

সকালে ঘুম ভাঙলে ভাববার চেষ্টা করি
আমি কোথায়।
এখন আমার অভ্যেস ব'লে কিছু নেই—
বাইরে গেলে যেমন
তেমনি ঘরে ফিরলেও আমার মন কেমন করে
মুখের দিকে তাকিয়ে
কাছের সঙ্গে দূরের আশ্চর্য আদল দেখে
আমি চম্‌কে উঠি।

রোজই ঘুম ভাঙলে ভাববার চেষ্টা করি
আমি কোথায়॥

কথার ঝুড়ি

তুলছি চাঁদা
বলছি, দাদা,
মুক্ত কণ্ঠে—
সাম্‌লে চাম্‌ড়া।
আছি আমরা
যুক্তফ্রণ্টে।
করছি রফা
বত্রিশ দফা
কারণ উহ্য।
কথার ঝুড়ি
যাঁর নেই জুড়ি—
তিনিই পূজ্য।

রাস্তা

বিকেলে ময়দানে জোর সভা
চলছে লোকজন দল বেঁধে

সূর্য পশ্চিমে প্রায় ডোবা
বেকার হাওয়া আহা গায় বেঁধে।

মেজেছি সারাদিন মুখ রোদে
নরম ঘাসে লাগে সুড়সুড়ি,

পেয়েছি কিছু, গেছে ধার শোধে—
জোটায় কিঞ্চিৎ জোচ্চুরি।

হোটেলে জমকালো লাল, নীলে
তামাসা লোটে শাদা বোম্বেটে।

একদা ছিল কাজ জুট মিলে
পড়তো রোজ মদ খালি পেটে।

আজকে বানচাল নৌকা যে
ঢুকেছে সংসার, ভালবাসা;

উঠুক ঝড়,—মেঘ তান ভাঁজে—
নতুন দিন, চাই নব আশা॥

যা তাই

ছি

কাগের ছা বগের ছা ক'রে
লিখে দিয়েছি
যা-তাই।
কাগজে ছা-
-পার অক্ষরে
দ্যাখো বে কী খোলতাই!

করতে হাঁটি হাঁটি পা পা
পাছে উল্টে
পড়হ বাপা
রেখেছি ভেতরটা ফাঁপা।

ব্যথা ভুলতে
দুহাতে তাই

তাই-তাই তাই-তাই॥

রক্ত বীজ

বন্ধুরা, এবার যেতে পারো

থাকা আর না থাকার মধ্যে
এখন
দোল খাচ্ছে সময়।

আমি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে এসেছি

তোমরা দয়া ক'রে
কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিও।

মাটি হাতড়ে হাতড়ে আমাকে দেখতে হবে
অন্ধকারে ছোঁড়া
আমার বীজগুলোর কী দশা হল।

বীজ তো নয়,
জলের মধ্যে
আমি পুঁতেছিলাম আগুন।

আগুন নয়—
রক্ত।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে—
পুঁতেছিলাম রক্তবীজ॥

সরলা বসুর জন্যে

অন্ধকার
        সময় দেখছে—
                দাঁড়িয়ে ঝন্‌কাঠে।

বন্ধ দেরাজ।
        ভেতরে উঁই
                পাণ্ডুলিপি ঘাঁটে।

জানলা খোলা

মাটির মেঝে
ভেজে বৃষ্টির ছাঁটে।

হাওয়ায় করছে
এপাশ ওপাশ
পিলসুজের ছায়া—

তার সঙ্গে
একজন মা
বদল করেন কায়া।

মাথায় দিয়ে
শক্ত ইঁট
কাঠের ভাঙা পায়া।

খাটের নিচে
সাধআহ্লাদ
জমানো খালি টিনে।

স্মৃতির কিছু
পুরনো রেকর্ড
মর্চে-ধরা পিনে।
বনবিবির
কাগজের নৌকো
যা ভেসে দক্ষিণে।

অন্ধকার
মুখ তুলতেই
দেখে সকাল ফোটে।

ফুলের গাছ
নামিয়ে চোখ
সমানে নখ খোঁটে।

দেরাজ খোলা।
পাণ্ডুলিপি
নীলকণ্ঠের ঠোঁটে॥

শের জঙ্গ্-এর ডেরায়

সাহস থাকে

দরজা ঠেলে ঢোকো—
সর্বনাশ, রোখো!
কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে
বিশাল থাবায় বাগিয়ে বাঘনখ

হেঁটমুণ্ডে
শিবলিকের এক বেতাল
হিংস্র নরখাদক
এই বুঝি দেয় লাফ
ও কিছু নয়
ভেতরে এসো, পাপোশে মোছো ভয়

গা ডুবিয়ে ফুলদানিতে
দেখ, তোমাকে ডাক দিচ্ছে
হাতছানিতে
রক্তবরণ শঙ্কাহরণ গোলাপ

পেরেকে ঝোলে তীরধনুক
বর্শাছোরা
গাদাবন্দুক
তরোয়ালের খাপ
মুখোশ মাদল ফ্রেমে-বাঁধানো খাঁড়া
জুজুর ভয় তাড়াতে রুজু রুজু
চার দেয়ালে
সশস্ত্র পাহারা

আলমারিতে সাজিয়ে গুছিয়ে
যত্নে তোলা আছে
যারা মানুষের রক্তমাংসে বাঁচে
চার-পা কিংবা দু-পায়
তাদের চরম দণ্ড দেবার উপায়

মানচিত্রে স্বাধীন ভারত
টেবিলে ভূগোলক
ঘুলঘুলিতে পায়রা দুটো
জোটায় খড়কুটো
ঘরের মধ্যে
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায় সাদা পালক

টাঙানো তার নিচে পিকাসোর
আঁকা শান্তিকপোত

কাগজচাপা
গোলার টুকরো
হাতবোমার খোল
তারই তলায় সোনার-জলে মলাট-ছাপা
হরবোলা সব বইয়ের দঙ্গল

রেডিওগ্রামে আস্তে গান
রঙীন ফুলে
স্মৃতির কালো ভ্রমর
দেরাজে রাখা গায়েবী টুপি
শিকল খুলে
শিকড়ে দেয় টান

জীবনে বনে রণে রমণে লড়াই বহুরূপী

চোখে চশমার ফ্রেমে পরানো
ঈদের চাঁদ যেন
মাথায় শুভ্র কেশ
শিয়রে জেগে
রাত্রি আর রমণী আর
অরণ্য আর দেশ
একটা গুলী এখনও তাঁর শরীরে আছে লেগে

দিনে দিনে
ঝাপ্‌সা হয়
স্মৃতির দূরবীনে

ফাঁসির দড়ি
ইন্‌কিলাব
যাবজ্জীবন
বন্ধ জাল
লোহার গরাদ
জিন্দাবাদ
ডাণ্ডাবেড়ি
নির্জন কুঠুরি

দেওয়ান নয়, জওয়ান নয়
চৌধুরীর বেটা নয় চৌধুরী

লাল নিশান সরিয়ে দেয়
ঘরের এক কোণে
তাম্রপত্র
শেষ মুক্তির লড়াই বুকের মণিকোঠায় একচ্ছত্র
অন্ধকারে আকাশপ্রদীপ
নিশানা ঠিক রাখে

এমনি ক'রে ভয়ঙ্কর সুন্দর এই ডেরায়
সাহস বেঁচে থাকে ॥

কিউবার কৃষ্ণাঙ্গকীর্তন

(ফেদেরিকো গার্থিয়া লবৃকা)

উঠলে পূর্ণিমার চাঁদ যাবো গো
কিউবার সান্তিয়াগোয় ।
যাবো গো সান্তিয়াগো
কালাপানির গাড়িতে,
যাবো গো সান্তিয়াগো ।
গোলপাতারা উঠবে গেয়ে
যাবো গো সান্তিয়াগো ।
পামগাছ হতে চাইলে সারস
যাবো গো সান্তিয়াগো ।
কলাগাছ হতে চাইবে যখন জেলিমাছ
যাবো গো সান্তিয়াগো ।
সঙ্গে নিয়ে সোনার ঝুড়ি ফন্‌সেকার
যাবো গো সান্তিয়াগো ।

সঙ্গে নিয়ে শিরিন-ফরহাদের গোলাপ
যাবো গো সান্তিয়াগো।
ওগো কিউবা! শুকনো বীজের ছন্দ ও।
যাবো গো সান্তিয়াগো।
ও উষ্ণ কাঁকাল, একফোঁটা কাঠ।
যাবো গো সান্তিয়াগো।
জ্যান্ত গাছের তন্ত্রী। কুমির। তামাকের ফুল।
যাবো গো সান্তিয়াগো।
ব'লে এসেছি চিরটা কাল সান্তিয়াগোয় যাবো
কালাপানির গাড়িতে।
যাবো গো সান্তিয়াগো।
চাকায় পুরে হাওয়া এবং সুরা
যাবো গো সান্তিয়াগো।
অন্ধকারে প্রবাল আমার
যাবো গো সান্তিয়াগো।
বালির ভেতর ডুবল সাগর
যাবো গো সান্তিয়াগো।
সাদা মাথা, শুকনো মেওয়া,
যাবো গো সান্তিয়াগো।
বেতসবনে কী আশ্চর্য প্রাণের ছোঁয়া।
ও কিউবা! দীর্ঘশ্বাসের কাদামাটির ধনুক ও!
যাবো গো সান্তিয়াগো॥

বোবা ছেলেটা

(ফেদেরিকো গার্থিয়া লর্‌কা)

ছোট্ট ছেলে। খুঁজছে তার
গলার স্বর।
(নিয়ে গিয়েছে ঝিঁঝিঁর রাজা)।
ছেলেটা তার গলার স্বর
খুঁজে বেড়াচ্ছে জলের ফোঁটায়।

কথা বলব সে জন্যে নয়
গলার স্বরে গড়াব আংটি
নৈঃশব্দ্য পরবে তার কড়ে-আঙুলে।

ছোট্ট ছেলে খুঁজছিল তার গলার স্বর
জলের ফোঁটায়।

(অনেক দূরে বন্দী তার গলার স্বরকে
হায় রে, তখন পরানো হচ্ছে ঝিঁঝিঁর পোশাক।)

মাকড়সা

(সেসার ভালেহো)

দৈত্যকায় মাকড়সা এক, হয়ে পড়েছে অথর্ব আজ;
জ্ব'লে গেছে রং, শরীর বলতে
একটা মুণ্ডু একটা উদর, রক্তাক্ত।

আজকে তাকে খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলাম। কী কষ্টে যে
মেলছিল তার অতগুলো পা
এদিক ওদিক।

মনে মনে ভেবেছিলাম তার
যমের পেয়াদা অদৃশ্য দুই চোখের কথা।

স্থিরনিশ্চল চুঁচোলো এক শিলাখণ্ডে
থরথরিয়ে কাঁপছিল সে ;
এদিকে উদর
ওদিকটাতে মুণ্ডু রাখা।

অতগুলো পা, তবু বেচারা
পড়েছে আজ মহা ফাঁপরে। যত দেখছি
ঘোর বিপদে ধন্ধ-লাগা তার অবস্থা—
কী যে আমার কষ্ট হচ্ছে বলবার নয়।

দৈত্যকায় এই মাকড়সা, উদর তাকে বাধা দিচ্ছে
করতে মাথার অনুসরণ।
আমি কেবল ভাবছি তার চোখের কথা
এবং তার কতগুলো পা, কত যে পা…
কী যে আমার কষ্ট হচ্ছে বলবার নয়॥

জনগণ

(সেসার ভালেহো)

যখন লড়াই হয়েছে শেষ,
শিঙে ফুঁকেছে সেপাই, তখন একটি লোক এসে
ডেকে বলল, 'মারা যাস্‌নে, মানিক আমার সোনা।'
তবুও তার লাশ, হায় রে, যেতে লাগল মারা।

আরও দুজন এগিয়ে এল, অনেক ক'রে তাকে বোঝালো,

'ভাই, আমাদের ছেড়ে যাস্‌নে, বেঁচে ওঠ্‌, ফের
সাহসে বুক বেঁধে।
তবুও তার লাশ, হায় রে, যেতে লাগল মারা।

ক্রমে কুড়ি, একশো হাজার, পাঁচ লক্ষ লোক
আওয়াজ তুলল, 'ভালবাসার জোরের চেয়েও
তাহলে কি মৃত্যুর জোর বেশি!'
তবুও তার লাশ, হায় রে, যেতে লাগল মারা।

কোটি কোটি মানুষ এসে ঘিরে ধরল তাকে ;
সবার মুখে একই কথা,
'ছেড়ে যেও না, থাকো।'

শেষে সারা দুনিয়ার লোক
ছুটে এসে দাঁড়ালো চারপাশে ;
আবেগে অভিভূত সেই লাশ
সজল চোখে তাকিয়ে তাদের দিকে
উঠে বসল, প্রথম জনকে বেঁধে বাহুর ডোরে
হাঁটতে লাগল···

তুষার ঝঞ্ঝা

(তু ফু)

গোলমাল, হৈচৈ, কান্না, ভূতপ্রেত বিস্তর নতুন।
বিদীর্ণ হৃদয়, জরা ছেঁকে ধরে, সঙ্গীহীন একা,
নিজেকে শোনাই গান। শতচ্ছিন্ন আঁচল বিছায়
কুয়াশা ঘনায়মান গোধূলিতে। ঘূর্ণ্যমান হাওয়া
চতুর্দিকে ছুঁড়ে দেয় পুঞ্জ পুঞ্জ সমানে তুষার।

মেঝেতে ওল্টানো ভাঁড়। মদ নেই বোতলে এককোঁটা
পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে আঁচ শীতার্ত উনুনে।
সমস্ত জায়গায় লোকে কথা বলে চাপা কণ্ঠস্বরে।
ব'সে ভাবছি মনে মনে এজীবনে অক্ষর অকেজো॥

চাকরান কুলি

(সি. এফ. এণ্ডরুজ)

অদূরে রয়েছে কুঁকড়ে,
সারা পিঠে, দু'বাহুতে ক্ষত—
তাড়া খেয়ে ধরা-পড়া যেন এক
ভয়ার্ত শিকার।
আমার হৃদয়মন উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে ছোটে তার দিকে,
ধায় অশ্রুধারা।

তারপরই দৃশ্যান্তর।
একি দেখি, প্রভু!
চোখের দর্পণে তার মুকুরিত তোমারি যে জ্যোতির্ময় মুখ!
শান্তসৌম্য, অনাবৃত, মৃত্যুঞ্জয় সৌন্দর্যে ভাস্বর
হে আমার ব্যথার ঠাকুর॥

ইয়েসেনিনের গ্রামদেশে

(আলেকজান্দার সলঝেনেৎসিন)

রাস্তায় একসূত্রে গাঁথা পরের পর ঠায় একই ধরনের চারটি গ্রাম।
ধুলোয় ধূসর। ধারেকাছে না বাগবাগিচা, না বনজঙ্গল।
লিকলিকে প্যাকাটির বেড়া। এখানে সেখানে রংচঙে চটকদার ঝিলমিল।
রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পাম্পে গা আঁচড়াচ্ছে এক ব্যাটা শুয়োর।

একটা সাইকেলের ছায়া পাশ দিয়ে সাঁ ক'রে যেই না যাওয়া,
এক সারে চলা একঝাঁক রাজহাঁস মহানন্দে গলায় ভেঁপুর আওয়াজ ক'রে
দাবড়ানি দিল। মুরগির ছানাগুলো খাবারের খোঁজে উঠে প'ড়ে লেগে
রাস্তা আর উঠোন আঁচড়াচ্ছে।

কন্‌স্তান্তিনোভোর গ্রাম্য মুদীর দোকানটিও কম যায় না—
দেখতে মুরগির বাসার মতই রোগাপটকা। নোনা হেরিংমাছ।
ভোদ্‌কার গোটাকতক ব্র্যাণ্ড। এক ধরনের আঠা-আঠা মিঠাইমোরব্বা,
বছর পনেরো আগেই লোকরুচি থেকে যার পাট উঠে গেছে।
শহরে তুমি যে রুটি কেনো, তার দ্বিগুণ ভারী গোল গোল কালো পাঁউরুটি—
দেখলে মনে হবে ও-রুটি কাটতে ছুরি তো নয়, কুড়ুল লাগবে।

ইয়েসেনিনদের কুঁড়েঘরের ভেতরটা ছোট ছোট নড়বড়ে পার্টিশান
দিয়ে ভাগ ভাগ-করা—দেখে মনে হবে ঘর তো নয়, যেন কুলুঙ্গি কিংবা
প্যাকিং বাক্স। বাইরে আছে খানিকটা বেড়া-দেওয়া চত্বর।
এখানে এক সময়ে ছিল একটি স্নানঘর, সেখানে সের্গেই অন্ধকারে
নিজেকে বন্ধ ক'রে রেখে তাঁর প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন।
বেড়ার বাইরে নিয়মমত যৎকিঞ্চিৎ চারণভূমি।

আমি গ্রামটাকে বেড় দিয়ে ঘুরি ; আর পাঁচটা গ্রাম যেমন হয়।
তাদের প্রধান ভাবনা ফসল নিয়ে, কেমন ক'রে
দিনে দিনে সঞ্চয় বাড়ানো যায়,
পাড়াপড়শীদের সঙ্গে কিভাবে টেক্কা দিয়ে চলা যায়।
যত দেখি ততই আমার হৃদয় স্পন্দিত হয় :
একদিন যে দিব্য হুতাশন এই দেশখণ্ডকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল,
আজও আমার দুই গালে তার আঁচ যেন অনুভব করছি।
ওকা নদীর উঁচু পাড় বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একদৃষ্টে
দূরদিগন্তে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি—
খোরভস্তভের বনরাজিনীলা ঐ অরণ্যরেখাই কি কবিচিত্তে
এই অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিটি জাগিয়ে তুলেছিল :

'বনময় কলকোলাহল ওঠে বনমোরগের বিলাপে…?'

হিলিমিলি হিলিমিলি জলার মাঠ দিয়ে যাওয়া
এই কি সেই নিরুপদ্রব নদী, যাকে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

'সূর্যের খড় জলের ডহরে ডাঁই করা আছে'?

হাজার বছর ধ'রে অন্ধেরা যে সৌন্দর্যকে মাড়িয়ে চলে গেছে
এবং দেখেও দেখে নি—উনুনের ধারে, শুয়োরের খোঁয়াড়ে,
ঢেঁকিশালে, ক্ষেতেখামারে ছড়িয়ে-থাকা সেই অফুরন্ত সৌন্দর্যকে
গাঁয়ের এক বদ্‌রাগী গোঁয়ার ছেলে মনের মধ্যে অসম্ভব নাড়া খেয়ে
চোখ মেলে যাতে দেখতে পায়,
তার জন্যে সৃষ্টিকর্তাকে ঐ কুঁড়েঘরে কবিশক্তির কি রকম বজ্রটাই না
হানতে হয়েছিল!

এক কবির শব

(আলেকজান্দার সল্‌ঝেনেৎসিন)

এখন ল্‌গোভো গাঁ। নীচে ওকা নদী। ওপরে খাড়া পাহাড়।
এই খাড়াইতে একদা ছিল প্রাচীন শহর ওল্‌গভ।
সেকালের রুশীরা এ জায়গা বাছাই করেছিল মন্দের ভাল হিসেবে;
পানযোগ্য বহতা জল ছিল তার মাধুর্য।

ভাইদের হাতে খুন হতে হতে দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন
ইঙ্‌মার ইগোরেভিচ।
কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি স্থাপন করেছিলেন যীশুমাতার স্বর্গারোহণের উদ্দেশে
নিবেদিত মঠ।

দিনটা ঝকঝকে থাকলে এখান থেকে দুই দূরে জলার মাঠ পেরিয়ে
বারো ক্রোশ তফাতে অন্য এক পাহাড়ের খাড়াইতে দেখা যাবে
সন্ত জন্‌দেবের মঠের দীর্ঘাকার ঘণ্টাঘর।

খান বাহ্‌তির ছিল শাপ লাগার ভয়। ফলে,
মঠ দুটো টিঁকে গিয়েছিল।

ইয়াকভ পেত্রভিচ পোলন্‌স্কি আর সব ছেড়ে এই জায়গাটাকেই
নিজের ক'রে নেন এবং নির্দেশ দিয়ে যান যে,
এখানেই যেন তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

মারা গেলে কবরের ওপর দেহমুক্ত আত্মা বিচরণ করবে,
পাহাড়তলির শান্ত নিসর্গচিত্র অবলোকন করবে—
মনে মনে সেটা বিশ্বাস করবার প্রবণতা,
এ বোধহয় চিরদিনই মানুষের মজ্জাগত।

কিন্তু গির্জা-গম্বুজ কিছুই আর নেই ; অবশিষ্ট
আধখানা পাথরের দেয়ালের বুক কাঁধ মাথার ফাঁকা জায়গাগুলো ভরা হয়েছে
কাঁটাতারে-মোড়া তক্তার বেড়ায় আর এই প্রাচীন স্থানে জাঁকিয়ে বসেছে
সেইসব পরিচিত গা-ঘিন্‌ঘিন্‌-করা বিকট বিকট মূর্তি :
চৌকিদার শান্ত্রীদের বুরুজ। মঠের তোরণদ্বারে এক গুমটি আর সেইসঙ্গে
দেয়াল ধ'রে এক পোস্টার—কালোকোলো একটি বাচ্চা মেয়ে কোলে ক'রে
এক রুশী মজুর বলছে 'জাতিতে জাতিতে শান্তি'।

আমরা কিছুই না জানার ভান করি। সেপাইদের ডেরায় ফতুয়াপরা
ডিউটিছুট পাওয়া গেল একজনকে।
সে আমাদের কাছে সব খোলসা ক'রে বলল :

'দোস্‌রা দুনিয়ায় এখানে ছিল এক মঠ।
শুনেছি পয়লা দুনিয়া ছিল রোম আর তেস্‌রা দুনিয়া মস্কো।
এক সময়ে এখানে ছিল বালখিল্যদেরও আস্তানা ;
কিন্তু স্থানমাহাত্ম্য না জানায় দস্যিগুলো এখানকার দেয়াল তছ্‌নছ্‌ করল
আর মূর্তি-বিগ্রহগুলো ভেঙে চুরমার করল।
এরপর এক সমবায় খামার লাখ টাকা দিয়ে গির্জাদুটো খরিদ ক'রে নিল—
সেই ইটে ছ-সারি গোয়ালঘরওয়ালা একটা প্রকাণ্ড
গোশালা তৈরির জন্যে। আমি স্বয়ং কাজ করেছি সেখানে।
আভাঙা ইট খসাতে পারলে পাঁচ সিকে। আধলা ইটের জন্যে দু সিকে।
কিন্তু কক্ষনো সাফসুফ ইট মিলত না—
তাতে সেঁটে থাকত চুনসুরকির দলা।
গির্জার তলায় একটা সমাধিকক্ষ পাওয়া গিয়েছিল।
দেখা গেল তার মধ্যে এক পাদ্রী। কঙ্কালমাত্র সার।
তবে তার জোব্বাটা তখনও ছিল আস্ত অটুট।
আমি আর আরেকজন টেনেটুনে জোব্বাটাকে দুখানা করার
কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু জিনিসটা ছিল এমন খাপী যে,

কিছুতেই ছেঁড়া গেল না…'

'আচ্ছা, ম্যাপে রয়েছে যে, এক কবি, নাম পোলন্স্কি—
তাঁকে এখানে মাটি দেওয়া হয়। বলতে পারেন তাঁর কবরটা কোথায়?'

'পোলন্স্কিকে দেখা যাবে না। তিনি আছেন পাঁচিলের মধ্যে।'

কাজেই পোলন্স্কি পড়েছেন নিষিদ্ধ এলাকায়। তাহলে আর
দেখবার কী থাকল? চুনসুরকির ভগ্নস্তূপ? রও, রও—
সেপাইটা তার বউয়ের দিকে ফিরে কী বলছে শোনো—

'পোলন্স্কিকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে না?'

দাওয়ায় ব'সে দাঁত দিয়ে সশব্দে বাদামের খোলা ভাঙতে ভাঙতে
তার বউ বলল, 'হুঁ, রিয়াজানে।'

যেন খুব একটা মজার ব্যাপার, এমনি ভাব ক'রে সেপাইটি
বলল, 'মেয়াদ খাটা হয়ে গেছে—কাজেই রেহাই দিয়েছে…'

নেভা নদীর ধারে শহর

(আলেকজান্দার সল্‌ঝেনিৎসিন)

সন্ত ইসাকের বিজান্তিন রীতির গম্বুজ ঘিরে
ঝাড়বাতি হাতে নতজানু হয়ে আছে দেবদূতের দল।
সোনায় মোড়া সরু গম্বুজের মোচার মত তিনটি চূড়া
নেভানদীর এপারে ওপারে আর মোইকায়
যেন একটি আরেকটির প্রতিধ্বনি।
যেখানেই মুদ্রারাক্ষস, সেখানেই সর্বত্র নজর রাখছে কিংবা ঘুমোচ্ছে
পাহারাদার সিংহ, নৃসিংহ আর ঈগলসিংহ।
রসির কল্পনানিপুণ বক্রতনু খিলানের মাথায় ষড়শ্ববাহিত রথে
টগবগিয়ে চলেছেন বিজয়লক্ষ্মী।
শতসহস্র স্তম্ভে, তিড়িং-লাফানো ঘোড়ায়, টান-টান হওয়া বৃষস্কন্ধে আরূঢ়
অলিন্দের পর অলিন্দ…

কি ভাগ্যিস, এ তল্লাটে নতুন কোনো বাড়ি বানাতে দেওয়া হয় না।

নেভ্স্কি প্রস্পেক্তে পিটুলির ছিরির মত আকাশ-আঁচড়ানো কোনো বাড়ি
গোঁত্তা মেরে ঢুকে পড়তে পারে না,
গ্রিবোয়েদভ ক্যানেলটাকে মাটি ক'রে দিয়ে কোনো
পাঁচতলা জুতোর বাক্স মাথা তুলতে পারে না।
যতই পা-চাটা, যতই অপটু হোক,
এমন কোনো জ্যান্ত বাস্তুকার নেই—যে তার প্রভাব খাটিয়ে
কালো নদী বা ওখ্‌তার এদিকে কোনো জমিতে বাড়ি তুলতে পারে।
আমাদের না হয়েও এ আমাদের সবচেয়ে বড় গৌরব।
আজ এখানকার সরণিতে সরণিতে যখন আমরা পদচারণা করি,
কী যে আনন্দ হয়।
কিন্তু এর সমস্ত সৌন্দর্যই রুশীদের হাতে গড়া—
তারা বিষাদময় জলাভূমিতে পচে মরতে মরতে দাঁত কিড়মিড় করেছে
আর শাপান্ত করেছে।
আমাদের পূর্বপুরুষদের অস্থিকঙ্কাল প্রাসাদে প্রাসাদে
পিষ্ট, শিলীভূত একাকার হয়ে
গৈরিক, বৃষরক্তে রাঙা, পাটালি পিঙ্গল, সবুজে রং মিশিয়েছে।
আমাদের মাথায়-হাত-দেওয়া বিশৃঙ্খল জীবনগুলোর কী হবে ?
আমাদের একের পর এক ফেটে-পড়া প্রতিবাদ,
ফাঁসি-যাওয়া লোকগুলোর গোঙানি, মেয়েদের অশ্রুর বন্যা—
এ সবের কী হবে ? এ সবও কি—ভাবতে ভয় লাগে—
চূড়ান্তভাবে বিস্মৃত হবে ? এও কি
অমন সর্বাঙ্গসুন্দর, চিরঞ্জীব রূপলাবণ্যের জন্ম দিতে পারবে ?

সেগদেন সায়র

(আলেকজান্দার সল্‌ঝেনেৎসিন)

এ সায়রের কথা কেউ লেখে না, বলবার সময় কানে কানে
ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে। যেন কোনো প্রেতপুরীতে এসে পড়া গেছে ;
ভেতরে যাবার সব রাস্তাই বন্ধ।

প্রত্যেকটি পথ আটকে প্রবেশনিষেধের একটি ক'রে চিহ্ন—
সপাটে মুখের ওপর সোজা সটান আড় হয়ে আছে।

ঐ চিহ্নের মুখোমুখি হলে—মানুষ হও, পশুপাখি হও—
অমনি পিঠটান দেবে।
মর্ত্যের কোনো জাঁহাবাজ ওখানে ঐ চিহ্নটি লাগিয়েছে;
তার ওপারে গাড়ি ক'রে, পায়ে হেটে, বুকে হেঁটে, এমন কি
পাখায় ভর দিয়েও কেউ যেতে পারবে না—খবরদার!

নিশ্চুপ বনস্থলীতে সায়রে যাবার পথের খোঁজে যতই তুমি
চক্কর দাও, পথ তুমি পাবে না; কোনো লোক পাবে না জিগ্যেস করার
—কেননা মানুষে ও-বন মাড়ায় না। ভয় দেখিয়ে তাদের ভাগানো হয়েছে।
ভেতরে গলে যাবার আছে একটাই উপায়; তা হল,
বৃষ্টিবাদ্‌লার দিনে কোনো এক গোধূলিলগ্নে
গরুর গলার ঘুন্টির ঠুন ঠুন শব্দ শুনে যদি পিছু নিতে পারো।
দু'পাশের গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে যেন তুমি এক ঝলক দেখে নিলে
ঝিকমিক ঝিকমিক ঝিকমিক করছে দূরবিস্তৃত সায়র—ব্যস্‌,
পাড় পর্যন্ত আর তোমাকে পৌঁছুতে হল না,
তৎক্ষণাৎ তুমি জেনে গেলে বাকি জীবনটা
তোমাকে এখানেই ক্রীতদাস হয়ে থেকে যেতে হল।

কম্পাসের জোড়া কাঁটায় বৃত্ত আঁকার মত নিখুঁত গোলাকার
সেগদেন সায়র।
এপার থেকে চিৎকার করলে (খবর্দার, চিৎকার করেছ কি ধরা পড়ে যাবে)
ওপারে গিয়ে পৌঁছুবে একটা শুধু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
এপারে ওপারে দুস্তর দূরত্ব।
সায়রের ধান বনে বনে সম্পূর্ণ অন্তরীণ,
একটানা সারিবদ্ধ গাছে গাছে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বন পেরিয়ে জলের ধারে
আসা মাত্র আগাগোড়া নিষিদ্ধ ডাঙা দৃষ্টির গোচরে আসবে:
এখানে সেখানে একফালি হলুদবর্ণ বালি,
খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে শণের মুড়ো,
সবুজে সবুজ হয়ে আছে ছেঁটে-ফেলা ঘাস জমি। নিথর নিস্তরঙ্গ মসৃণ জল;

ডাঙার কাছাকাছি কিছু শ্যাওলার জটা বাদ দিলে
স্বচ্ছ জলের ভেতর ধবধব করে সায়রের তলদেশ।

এক লুকানো জঙ্গলে এক লুকানো সায়র।

মুখ তুলে চেয়ে আছে জল আর তাকে হেঁট হয়ে দেখছে আকাশ।
এই বন পেরিয়ে দুনিয়া ব'লে কিছু আছে কিনা জানা নেই, দেখা যায় না;
যদি থেকেও থাকে, তবে এ জায়গা সে দুনিয়ার বার।

এ এমন এক জায়গা মানুষ যেখানে
চিরটা কাল থেকে যেতে পারে,
যেখানে সে পারে প্রকৃতির সঙ্গে সদ্ভাব ক'রে থাকতে
আর সেইসঙ্গে ভাবে মাতোয়ারা হতে।

কিন্তু তা হওয়ার নয়। তেরছা-চোখো এক দুষ্টু রাজা
এই সায়রটাকে নিজের ব'লে দাবি ক'রে বসেছে:
ঐ তার দালানকোঠা, ঐ তার স্নানঘর।
তার আলালের দুলালটি পাজীর পাঝাড়া—
সে এখানে মাছ ধরে, নৌকোয় ক'রে পানকৌড়ি মেরে বেড়ায়।
সায়রের মাথার ওপর এই দেখা গেল একফালি নীলচে ধোঁয়া,
আর তার ঠিক পরক্ষণেই—গুড়ুম।

বনের পেছনে অনেকখানি তফাতে হাঁইও-হো হেঁইও-হো ক'রে
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রামশ্যামযদুমধুর দল।
পাছে তারা এখানে অনধিকার প্রবেশ করে,
তার জন্যে এখানে আসবার সব পথে আগল দেওয়া হয়েছে।
মাছপোষা, পাখিপালন—সমস্তই লাগছে ঐ দুরাত্মার ভোগে।
এখানে দুটো একটা দাবানল ঘটানোর চিহ্ন চোখে পড়ে;
কিন্তু সে আগুন নিভিয়ে ফেলে আগরওয়ালাকে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জনগণমন অধিনায়ক, জনশূন্য সায়র।

জননী আমার, আমার দেশ···

হলধরের গান

(মহাকবি ভাল্লাথোল)

কান্না থাকলে লোহার-দু'চোখে গড়িয়ে পড়ত ফোঁটা ফোঁটা জল,
দেখা যেত সেই অশ্রুলেখায় ফোটে এইসব অক্ষর :

"আমার স্বজাতি, যার ধর্মই কৃষিকর্মীর হাতিয়ার হয়ে
প্রাণের রক্তরসের লালন,
কলেকৌশলে তাকে দিয়ে আজ যুদ্ধে
সমানে চলেছে প্রাণের রক্তরস নিংড়ানো।

"যেখানেই কেউ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়—
অসহায় ব'লে আমাদেরই হতে হয় তলোয়ার,
দাঁত বার করি, তেড়ে যাই তাকে ;
কেউ বল্লম হয়ে লাফ দিই,
কেউবা কামান হয়ে গর্জাই, আগুন ছিটাই।
বইয়েছি কত রক্তগঙ্গা পাষণ্ড সব প্রভুর জন্যে !
হায়, এ পাপের কালিমা যে কবে ঘুচবে ?"

অক্ষরজ্ঞানহীন কৃষকের কৃষ্ণাঙ্গ এ স্বদেশ ছাড়া
কে আর সে-লেখা পড়বে ?
কামানের কালো রঙের ধোঁয়ায় চারিদিক লেপে
শুধু নিজেদের নামগুলো যারা চুনকাম করে
সে রকম বীর কখনই নয় এই দেশবাসী।

অন্যায়ে যারা বিমুখ, তাদের কাছে
পরকে দলন করে যে মহিমা, সে তো একেবারে অসার।
ভারতভূমির গিরিরাজ মাথা উঁচু করেছে কি
অন্য পাহাড়পর্বত পায়ে ঠেলে ?

বরঞ্চ সেই তুষারমৌলী প্রবলপুরুষ স্মিত হাসি হেসে
দেখেন তাদের উন্নত শির পরমানন্দে।

গ্রাহ্য না ক'রে বন্যা বা খরা এ-ঋতু সে-ঋতু
অগণিত গাছে সবুজের যেন হাট বসে মাঠে ;
তবু আমাদের কাছে থেকে যাবে সে জমি বন্ধ্যা
যতক্ষণ না সেখানে জাগছে বিশ্বপ্রেমের অঙ্কুর।

শরীর আমার, গোবর কুড়োতে হেঁট হও স্বচ্ছন্দে
কিন্তু কখনও অন্যায় যেন তার পায়ে মাথা নোয়াতে না পারে
হে আমার কাঁধ, হাসিমুখে তুমি লাঙল বইতে পারো
কিন্তু কিছুতে নিও না স্বার্থলোভীর আজ্ঞা পালনের ভার।

কুঁড়েঘর থেকে ভেসে আসে শোনো চরকা কাটার মধুর শব্দ
দেখ, তাতে কোনো যুদ্ধং-দেহি ডাক নেই
বরং সে দেয় শুধু সান্ত্বনা বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে
যারা দাসত্বে হয়ে আছে আজ উলঙ্গপ্রায়।

পরের দুঃখ সার ক'রে সংসারনির্বাহ
অন্যের শিরদাঁড়ায় বানানো সিংহতোরণ
অন্যের মৃতদেহ গেঁথে গেঁথে গড়া নিজেদের স্বর্গের সিঁড়ি
অহিংসার এ দেশ কখনই নেবে না সে পথ।

কখনও লোলুপ লালসা মেটাতে নয়
সারা দুনিয়াকে শোষণ করার অভিলাষে নয়
পীড়িত আর্ত মানবের সেবাকল্পেই শুধু
এ মহাকর্মক্ষেত্র হাতের বাঁধন খুলতে চায়।

ঐরাবত এ ভারতবর্ষ ভাঙে শৃঙ্খল
পৃথিবীকে মদগর্বিত পায়ে দলিত করতে নয়

বন্ধুরা যারা পড়ে আছে আজও গর্তে
তাদের তুলতে শুভানুধ্যায়ী শুঁড়ে।

এ আর্য দেশ, অবশেষে এই নদী ভাঙে বাঁধ
বয় তার স্রোত পৃথিবী ভাসাতে নয়
বুক ফাটে তাপদগ্ধ যেসব জাতির
যাতে তারা প্রাণ পায় তৃষ্ণার জলে।

দয়ালু বিশ্বস্রষ্টার এই ফসলের ক্ষেতে
মানবপ্রকৃতি যদি কোনোদিন পক্ষপালের পাল্লায় পড়ে
অচিরে সে পাপ বিদায় করতে
প্রাণপণে আগুয়ান হব না কি আমরা?

সুখে থাকে যেন নিখিল বিশ্ব
চিরকাল এই গান গায় নি কি ভারতবর্ষ?

ঠাকুরমার ঝুলি

এ-দুয়োরে যায়: দুর-দুর!
ও-দুয়োরে যায়: ছেই-ছেই!

সুয়োরানী লো সুয়োরানী তোর
রাজ্যে দিল হানা
পাথরচাপা কপাল যার সেই
ঘুঁটেকুড়ুনির ছানা

ঘেন্নায় মরি, ছি!

মন্ত্রী বলল, দেখছি
কোটাল বলল, দেখছি

ঢোল ডগরে পড়ে কাঠি
রক্তে হয় রাঙা মাটি

কাড়ে না কেউ রা
ভালোমানুষের ছাঁ

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
পারুল বোন রইল কাছে

দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার
কলের ডুলি
এই গল্পে ভর্তি ক'রে
ঠাকুরমার ঝুলি ॥

একটু পা চালিয়ে, ভাই

১

সব আরম্ভেরই একটা শেষ আছে, সব শেষেরই একটা আরম্ভ।

শঙ্খ-লাগা সাপ যেমন একটি আরেকটিতে লগ্ন হয়ে থাকে,
যেমন বানের মধ্যে থাকে পলি আর পলির মধ্যে বান।

কথাটা হল, কে কিভাবে দেখে, কখন কোন্‌খানে দাঁড়িয়ে।

ধানের মধ্যে বীজের পরম্পরায় অন্তহীন ধান? নাকি

কাঁধে-তোলা খাটিয়ার আগে আগে ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া
ভাঙানো পয়সার টোপে গাঁথা হরির লুটের খই ?

সামনে মুক্তি, না এখানেই ছেদ ? ফস্ ক'রে জ্বলে-ওঠা, না
দপ্ ক'রে নিভে যাওয়া ?

আগুনের চুম্বন, না হাওয়ার ফুৎকার ?

আমি বলি, যা হচ্ছে হোক, যা চলছে চলুক—
দশ আঙুলের টিপছাপে একদিন জীবন সব বাকিবকেয়া
উশুল করে নেবে।

আসলে ওটা একটা কথার কথা, যারপরনেই ধরতাই বুলি,
এই যেমন এক সময়ে আমাদেরই একজন বলতেন

বড়বাবু বললেন, আমি চললাম,
আমি বললাম, বড়বাবু বললেন,
শেষকথা বলবেন আপনারা।

বলতে বলতে
বলতে বলতে
মুখে ফেনা বেরিয়ে গেল
এখন শুনছি বড়বাবুরও বড়বাবু আছে
আরেকটু না তুললে কিচ্ছু হওয়ার নয়।

২
আমাদের এদিককার রাস্তাঘাটে, মশাই
আর বলবেন না,
বছরে বারোমাস ভোঁচকানি-লাগা ক্ষিধে-
বেরোলেই পা জড়িয়ে ধরে।

আর এমন অবাধ্য, কী বলব।
যাকেই বলি, দাঁড়াও—
সে সটান শুয়ে পড়ে।

আর ওঠে না।

সকালবেলায় জানলার গরাদ ঠেলে ভেতরে আসে
হাসপাতালের রুগীর পোশাকে রোদ্দুর।
পাশ ফিরে দেখি
মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে সকালের কাগজ।
সেকেণ্ডক্লাস ট্রামে কাল আমার হাঁটুর বয়েসী একজনকে দেখে
বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গিয়েছিল।
চোখে একরাশ ঘুম নিয়ে
লোকটা কাজ থেকে ফিরছিল।
তার চোখের কোণ, নাকের ডগা,
লালা-ঝরানো ঠোঁট,
নখের ময়লার নিচে থেকে হাতের চেটো
সমস্তই কাগজের মতন সাদা।

কাগজটা হাত বাড়ালেই পাই।
একটুও ইচ্ছে করছে না—
কেননা বন্যায় ভেসে-যাওয়া
মৃত সন্তান বুকে আঁকড়ানো মৃত মায়ের
পাশেই দেখব

হয়ত

তুইথুলি মুইথুলি করছে
তিনটে ঘাটের মড়া
একজন বলে বৃষ্টি

তো একজন বলে খন্না.
দুজনে এ ওকে টিপছে
তিন নম্বরকে সন্না

নয়ত

মাথায় পট্টি,গলায় লেত্তি
সমানে করে ভাঁড়ামি
কাটে ফোড়ন আপনি মোড়ল
এক ভুঁইফোড় সোয়ামী

যার খায় নুন তার গায় গুণ
নইলে নিমকহারামি
যাকেই দেখে শুধায় তাকে
বলো তো বাবা, কার আমি ?

আমি এখুনি নৌকো বানিয়ে রাস্তায় ভাসিয়ে দিতে পারি
কিংবা জল না থাকলে ধরাতে পারি আগুন।
কিন্তু এরা কেউই তাতে নাকচ হয়ে যাবে না।
মাঝখানে পর্দা পড়বে এই যা, আর তার আড়াল থেকে
একই মানুষ শুধু একটু নামনিশান আর পোশাক বদলে
চুল কাঁচিয়ে, নয় চুল সাদা ক'রে
ঠিক পরের দৃশ্যেই আবার দোর্দণ্ডপ্রতাপে ফিরে আসবে।

হাততালি দিতে গিয়ে মাথার ভেতর হাতকড়াগুলো ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে উঠছে,
দিনের আলোয় কালো দস্তানায় ঢাকা সাদা থাবা
অন্ধকারে বার করে আনছে তার ধারালো নখ
বেকার ছেলেগুলো চোখের মাথা খেয়ে
আর কিছু না পেয়ে
কাজে-না-লাগা হাতগুলোই
আগুনে পোড়াচ্ছে।

আকাশে মেঘ করেছে।

ধ্রুবতারা না দেখতে পেয়ে কেউ কেউ ভরসা করছে না
ঘরের বাইরে পা দিতে।

আমার কাছে আছে অনেকদিনের পুরনো এক দিগ্‌দর্শন যন্ত্র

আমার হৃদয়।

আমি সেটা কোনো আগন্তুককে দেব ব'লে
কেবলি ঘর-বার ঘর-বার করছি।

৩

লেনিনকে আমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছি ধর্মতলায়
ট্রামের গুম্‌টির একপাশে।
আঁস্তাকুড়ের ভাত একদল খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে
ডাস্টবিনে হাত চালিয়ে দিয়ে।

লেনিন দেখছেন।

গ্রামের এক লোক শহরে ডাক্তার দেখিয়ে সর্বস্বান্ত হতে এসেছিল
তার আগেই তাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেল
এক পকেটমার।

লেনিন দেখছেন।

সন্ধের মুখে যে মেয়েটাকে একটা ট্যাক্সি এসে
তুলে নিয়ে গিয়েছিল,
সন্ধে গড়িয়ে গেলে হাই তুলতে তুলতে
সে আবার এসে দাঁড়িয়েছে গাছতলায়।

লেনিন দেখছেন।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে লেনিনেরও খুব হাই পাচ্ছিল।

হঠাৎ দেখলাম একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

যেদিকে তাঁর নজর, সেইদিকে তাকিয়ে দেখলাম
লাল নিশান নিয়ে একদল মজুরের এক বিশাল মিছিল আসছে

আমার মনে হল, লেনিন যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন,

শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে—
একটু পা চালিয়ে, ভাই, একটু পা চালিয়ে ॥

দিক্‌ভুল

আমি সইয়ের
গঙ্গাজল হই

শালুক ফুল
আমার সই

মন কেমন করে, ও ভাই
ফুল গুঁজি খোঁপায়

রাত নিশুত হলে বুঝি
সই আমার ফোঁপায়—

বাড়া ভাতে ছাই দিল
পাকা ধানে মই

সেপাই এসে নিয়ে গেল
বাপদাদা কই

ওদের সাপে যেন ফোঁড়ে
ওদের শকুনে যেন খোঁড়ে

পা ডুবিয়ে রক্তে
ব'সে আছে তখ্‌তে
আগে থেকে তৈরী আছে
ঢুকবে কোন্‌ গর্তে

কেন রে সই কাঁদো
সাহসে বুক বাঁধো—

ধানমণ্ডির মাঠে যেখানে
ডহরপানি
ডুবে ডুবে ঠেকবে হাতে ফুলদানি

তার মধ্যে হয়ে গায়েব
ব'সে আছেন ভাই সায়েব

ভরে গিয়েছে নৌকোয় নৌকোয়
নদীর কিনার

নিশান ওড়ে হাওয়ার তোড়ে
মিছিল এগোয় শহীদ মিনার

ফুলদানিতে ঠিক ফুল
হবে না আর দিক্‌ভুল।

বদ্‌লায়

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে
ডালগুলো সব নাড়িয়ে
নাড়িয়ে

সেয়ানা গাছ বুঝে নিচ্ছে
হাওয়ার গতিবেগ

অন্ধকারে ঢাক পেটাচ্ছে
মেঘ
মাথার ওপর মুষলধারে
বাজাচ্ছে টিন—

বদ্‌লে যায়,
দেখো রে জাদু,
বদ্‌লে যায়
দিন।

বজ্র কানে তালা ধরায়
ধাঁধায় চোখ
হঠাৎ হঠাৎ
বিদ্যুতের চমক

পোহালে রাত
নড়ে সবার টনক—

এ কোন্‌ চুলো,
মোহানা কোথায়?

নৌকোগুলো
ঠেকেছে এসে চড়ায়।

অন্ধকারে চোখ বুঁজে,
হায়,
বেয়েছে তারা উজান

চোখ খুলে তাই নতুন ক'রে
বেঁধে নেয়
পালনিশান।

বুকের মধ্যে পাথর ঠুকে
জ্বালিয়ে নেয় আগুন
দাঁড়ের শব্দে
হাওয়ায় বাজে
চৌদুন।

দিনের আলোয়
দেখায় পথ
দূরবীন—

এ নয় জাদু অন্ধকারে,
বদ্‌লে যায় হাতের চাড়ে
দিনের আলোয়
বদ্‌লে যায়
দিন।

পাতাল রেল

এক বেহিসেবী বেয়াক্কিলে বুড়ো
ঘাটে পা দিচ্ছে ভেবে
রাস্তার উঁচুনিচুতে
হোঁচট খেয়ে
ছিটকে পড়েছিল সপাটে

দামী সিগারেটের খালি প্যাকেট,
রসে-ভেজা শালপাতার ঠোঙা,
পুলিসের পায়ের কাঁটা-মারা বুট,
একটা ঢাউস গাড়ির দুটো নতুন চাকা,
ফুটপাথের কোলের কাছে ময়লা জলে
উল্টে-ধরা একটি মিষ্টি মুখ—

এমনি কত কিছু দু' চোখে গিলতে গিলতে
বুড়োর পকেট থেকে খ'সে-পড়া
ব্যাঙের আধুলিটা
গড়িয়ে গড়িয়ে ঝাঁঝরির মুখে এসে
যখন পিল হয়ে গেল

ছেলের দল তখন
হাততালি থামিয়ে দিয়ে
ভাবতে লাগল

পাতাল রেল চললেই
আধুলিটা হাত করতে হবে।

পাবলো নেরুদার আরো কবিতা

অনুবাদকের কথা

একজন লেখকের পক্ষে তৈরি পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়া যে কতটা দুঃখের ব্যাপার যেকোনো ভুক্তভোগীই তা বুঝবেন। 'পাবলো নেরুদার আরো কবিতা'র বাংলা তর্জমার বাণ্ডিলটি সারা বাড়ি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও যখন পেলাম না, তখন আমি ধরেই নিয়েছিলাম ওটা আমি ভুল ক'রে বিদেশে কোথাও হোটেলে ফেলে-দেওয়া কাগজের ঝুড়িতে সমর্পণ ক'রে এসেছি। সুতরাং পাণ্ডুলিপিটি যে আর উদ্ধার করা যাবে না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। পণ্ডশ্রমের কথা ভেবে মনটা যে কী খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলার নয়। সময় ক'রে তর্জমার কাজে ব'সে আবার পুরোটা কেঁচে গণ্ডুষ করার কথা ভাবতেই পারছিলাম না।

কিছুদিন আগে এবার বাইরে থেকে ফিরে বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র সবাই সমস্বরে যখন বলে উঠল, 'পাওয়া গেছে'—আমার নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে শুনলাম অনিল বিশ্বাস নামে স্টেট ব্যাঙ্কের একজন কর্মী বাসের মধ্যে লেখাসুদ্ধ খামটি কুড়িয়ে পান এবং তাতে 'বিশ্ববাণী'র নামঠিকানা দেখে নিজে কষ্ট ক'রে আমার প্রকাশকের কাছে খামটি পৌঁছে দেন। তাঁর কাছে এজন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

'পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছে'র মতই এই বইতেও মূল কবিতা আর স্প্যানিশ অভিধান পাশে রেখে আমার তর্জমায় ইংরিজি অনুবাদ অনুসরণ করেছি। মূল না পাওয়ায় ব্যতিক্রম শুধু 'পলাতক' কবিতাটি। অনুবাদে আমি প্রাণপণে মূলানুগ থাকার চেষ্টা করেছি।

'নেরুদার জীবন ও কবিতা' লিখতে হেয়ান ফ্রাঙ্কোর একটি নিবন্ধের সাহায্য নিয়েছি।

নেরুদার কবিতার আমার করা বাংলা তর্জমার প্রথম খণ্ডটি যাঁদের ভালো লেগেছে, দ্বিতীয় খণ্ডটিও যদি তাঁদের মনে ধরে তাহলে মনে করব আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

নেরুদার জীবন ও কবিতা

পাবলো নেরুদার আসল নাম রিকার্দো এলিয়েজের নেফ্‌তালি রেয়েজ বোসোয়াল্‌তো। ১৯০৪ সালে পারালে তাঁর জন্ম। ১৯০৬ সালে বাড়ির লোকদের সঙ্গে তিনি চলে যান দক্ষিণ চিলির সীমান্তবর্তী তেমুকো শহরে। সেখানেই অতিবাহিত হয় তাঁর গোটা কৈশোর আর শৈশব।

আরাউকো প্রদেশের ('আরাউ' হল 'মাটি' আর 'কো' হল 'জল') ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার ফলে সেই সময়ে চিলির অনেকেই সে অঞ্চলে বন কেটে বসত করতে শুরু করেছে। নেরুদার বাবা যোগ দেন সেই দলে। তাঁর ছিল নতুন নতুন এলাকায় রেললাইন বসানোর কাজ।

জঙ্গলমহালের সেই অহল্যা মাটিতে তখন শুরু হয়েছে প্রথম চাষবাস আর পশুপালন। নেরুদার ছেলেবেলা কাটে চারদিকের এই বন্য প্রকৃতির মধ্যে আর সমাজের বা ধর্মের অন্ধসংস্কারমুক্ত খোলামনের আবহাওয়ায়। নেরুদার স্মৃতিকথা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা তাঁর জীবনবৃত্তান্তে এর সুগভীর ছাপ খুঁজে পাবেন।

নেরুদা যখন কবিতা লেখা শুরু করেন তখন তাঁর বছর দশেক বয়স। তেমুকো এমন এক জায়গা, যেখানে সাহিত্যসংস্কৃতির বড় একটা চল ছিল না। তাঁর মাথার ওপর কেউ ছিল না যাকে তিনি অনুসরণ করতে পারেন। চারিদিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তুমুল বর্ষণ আর ঝড়তুফান। এরই মধ্যে নেরুদা লিখলেন তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ :

আর আমার প্রাণের গভীরে কী যেন কী ন'ড়ে উঠল,
জ্ব'লে-ওঠা ভাব কিংবা ভুলে-যাওয়া ডানা,
আর সেই আগুনের
সঙ্কেতলিপি প'ড়ে নিয়ে,
আমি কাটলাম আমার নিজের রাস্তা,
আর আমি লিখলাম সেই প্রথম অস্ফুট ছত্র,
অস্ফুট, ধরাছোঁয়ার বাইরে, বিশুদ্ধ
আবোল-তাবোল,

যে কিছুই জানে না
তার অবিমিশ্র প্রজ্ঞা,
আর অকস্মাৎ আমি দেখতে পেলাম
অবারিত
উন্মুক্ত
জ্যোতির্লোক।

ষোল বছর বয়স অবধি নেরুদা ছিলেন তেমুকোতে। এরপর যখন তিনি সান্তিয়াগোতে লেখাপড়া করতে যান তখন তিনি পুরোদস্তুর কবি। তাঁর কবিতা ছাপা হতে আরম্ভ করেছে পিতৃদত্ত নামে নয়, নিজের দেওয়া 'পাবলো নেরুদা'— এই ছদ্মনামে। সে সময়ে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ইয়ান নেরুদা ব'লে একজন নামকরা লেখক ছিলেন। 'নেরুদা' উপাধি সেই সূত্রে।

১৯২৪ সালে বার হয় নেরুদার দ্বিতীয় কবিতার বই 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা'। সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁব বয়স তখন খুব বেশি হলে কুড়ি। ১৯২৬ সালে বার হয় তাঁর একটি উপন্যাস ('নিবাসী ও তার আশা') এবং একগুচ্ছ কবিতা ('অসীম মানুষের, বাজিয়ে দেখা')। ১৯২৭ সালে নেরুদা কূটনৈতিক চাকরি নিয়ে যান বর্মায়। তারপর রেঙ্গুন থেকে কলম্বো এবং তারপর জাভা। পাঁচটা বছর এইভাবে তাঁকে কাটাতে হয় বিচ্ছিন্নের জীবন। এমন সঙ্গী নেই যার সঙ্গে নিজের মাতৃভাষা স্পানিশে কথা বলতে পারেন।

দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে থেকেই তাঁর কবিতায় একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশেষ করে তেমুকো থেকে চলে আসার পর। প্রাচ্যের দেশগুলোতে এসে তিনি আরও বেশি নিজের মধ্যে গুটিয়ে যান। সেখানকার মানুষজন, জলমাটি—কিছুই স্বচ্ছ নয়, কেউ সাড়া দেয় না। এই সময় তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি অনুভব করি, যাবতীয় জিনিস খুঁজে পেয়েছে তার নিজস্ব অভিব্যক্তি অথচ তাতে আমার না আছে কোনো অংশ, না আছে তার মর্মোদ্ধার করার কোনো ক্ষমতা।' তাঁর এই সময়কার লেখা কবিতাগুচ্ছের ('পৃথিবীতে বাসা'*) প্রথম খণ্ডটি স্পেনদেশে বার হয় ১৯৩৩ সালে। এইসব কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে এক পারম্পর্যহীন জগৎকে, যেখানে পলকে দেখা দেওয়া তাদের মিছিলে মৃত্যুর অভিমুখে চলেছে বস্তুনিচয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, নিসর্গ। পরে নেরুদা তাঁর এই সময়কার কবিতাবলীকে অগ্রাহ্য করতে চাইলেও

কারো কারো মতে, এ যুগের মেজাজ সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এইসব কবিতায়।

১৯৩৪ সালের পর নেরুদার কবিতায় দেখা দিল এক নতুন পালাবদল। চিলির কন্সাল হয়ে তখন তিনি বাস করছেন স্পেনদেশে। প্রথমে বার্সিলোনায়। তারপর মাদ্রিদে। এখানে তিনি যে কবিদের সান্নিধ্যে এলেন তাঁদের সঙ্গে ছিল জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগ। তার মধ্যে ছিলেন স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিহত কবি ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকা (১৮৯৯-১৯৩৬)। এঁদের সাহচর্যে আস্তে আস্তে রাজনীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। লরকার হত্যার বিরুদ্ধে তিনি যে আবেগময় প্রতিবাদ জানান, তার ফলে তাঁকে কন্সালের পদ হারাতে হল।

১৯৩৮ সালে বার হয় নেরুদার নতুন কবিতাগুচ্ছ 'স্পেন আমার হৃদয়ে'। এইসব কবিতায় আস্তে আস্তে ফুটে উঠল একটা নতুন স্বর। আর নিভৃতে স্বগতোক্তি নয়, নেরুদা এবার জোর গলায় তার কবিতাকে শ্রোতাদের কানে তুলে দিলেন। শুধু কলম দিয়ে লেখা নয়, মুখ ফুটে বলা—যাতে কানের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে, শ্রোতার মনে যাতে সাড়া জাগে।

এর বারো বছর পর ১৯৫০ সালে বার হয় 'কান্তো হেনেরাল' ('কাণ্ড সর্বময়')। একে বলা হয় চিলির মহাকাব্য। এই বারো বছর নেরুদার জীবনের এক স্মরণীয় পর্ব। শুধু দাঁড়িয়ে দেখা নয়, এবার তিনি কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াইয়ের শরিক। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩—শুধু এই তিন বছর তিনি কন্সাল হিসেবে ছিলেন দেশের বাইরে মেক্সিকোয়।

১৯৪৫ সালে তিনি চিলির আইনসভা সিনেটের সদস্য হন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সময় তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে চিলির প্রেসিডেণ্ট ভিদেলা সাধারণ মানুষের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে পূর্ব ইউরোপের বহু দেশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। নেরুদা প্রকাশ্যে তাঁকে সমালোচনা করলে নেরুদাকে গ্রেপ্তার করার চক্রান্ত হয়। নেরুদা আত্মগোপন করেন। এই সময় সরকারবিরোধী তাঁর বেশ কিছু ছড়া প্রাচীরপত্রে লেখা হয়ে লোকের মুখে মুখে ছড়ায়। 'পলাতক' কবিতায় তাঁর এই আত্মগোপন পর্বের চিত্রটি ধরা আছে।

'কাণ্ড সর্বময়' মহাকাব্যে যেন ঘটেছে নেরুদার কবিসত্তার পুনর্জন্ম। তাঁর বিশ্বভুবনে দেখা দিল আবার কার্য-কারণের শৃঙ্খলা আর তাৎপর্য।

স্পেন থেকে স্বদেশে ফিরে নেরুদা কখনও খনিমজুরদের কাছে গিয়ে, কখনও

রাজনৈতিক জনসভায় তাঁর কবিতা পড়তে শুরু করলেন। তাঁর কবিতা মুষ্টিমেয় পাঠকের বেড়া ডিঙিয়ে সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছে গেল। তাঁর কবিতার ধরনধারণেও অনেক বদল ঘটল। তিনি তাঁর কবিতা লিখলেন উঁচু গলায় কথা বলবার ভাষায়। সে ভাষা নিতান্ত আটপৌরে একঘেয়ে নয়। চিত্র-গুণে বর্ণাঢ্য, সঙ্গীতময়তায় ঝঙ্কৃত। তাঁর কবিতায় উদ্ঘাটিত হল প্রকৃতি আর ইতিহাসের অন্তর্লীন ছন্দোবন্ধ, আমেরিকার প্রকৃত আখ্যান, তার ভৌগোলিক বিন্যাস, বিজেতা আর স্বৈরশাসকদের হাতে দেশবাসীর লাঞ্ছনা আর সেইসঙ্গে কবির আত্মকথা। এই মহাকাব্যে ফুটেছে রসের যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি কবির কণ্ঠে খেলেছে আবেগমুখর নানান স্বর।

এরপর নেরুদা হতে চাইলেন আরও বেশি সহজ। সাহিত্যের বাইরেকার যে মানুষ, তাদের কাছে নেরুদা চাইলেন নিজেকে খুলে ধরতে। ১৯৫৪ সালে বার হল তাঁর 'পঞ্চভূতের স্তোত্র'। কোনো সমারোহ নেই, উচ্চকণ্ঠের ভাষণ নেই—তাঁর কবিতা হল প্রায় গানের মতন স্বতোৎসারিত। কবিতাকে তিনি চাইলেন জীবনের ছাঁদে গড়তে। নেরুদা লিখলেন,

> বই, আমি যাই।
> বহু খণ্ডের পোশাক প'রে
> আমি যাব না,
> রচনাবলী থেকে
> আমি বেরিয়ে আসি না,
> আমার কবিতাগুলো
> কবিতা মুখে দেয় নি,
> তারা গোগ্রাসে গেলে
> মনমাতানো সব ঘটনা।

দৈনন্দিন জীবন, সাধারণ মানুষ আর এটা-ওটা-সেটা—এরই বন্দনা তাঁর এসব কবিতায়। রুটি, কাঠ, টমেটো, জলহাওয়া, কাপড়চোপড় আর প্রাকৃত বস্তু। জাহাজের খালাসী, রাজমিস্ত্রি, খনিমজুর, ছুতোরমিস্ত্রি কিংবা রুটির কারিগর। এই নিয়ে তাঁর 'পঞ্চভূতের স্তোত্র'।

নেরুদার কাছে কবিতা রচনা ছিল আর পাঁচটা সামাজিক কাজেরই মতন। কিন্তু শুধু তার মধ্যেই নিজেকে তিনি বেঁধে রাখেন নি। তাঁর দেখাশোনার জগৎকে এবং নিজের জীবনের টুকরো কথাগুলোকে তিনি সমানে ধ'রে রেখেছেন

তাঁর কবিতায়। সেই সঙ্গে লোককথা আর অতিকথাকেও বাস্তবের গাঁটছড়ায় বেঁধেছেন।

১৯৫৫ সালে নেরুদা বিয়ে করেন মাতিল্দে উরুতিয়াকে। বিয়ের আগে এবং পরে নেরুদা আবার নতুন ক'রে অজস্র প্রেমের কবিতা লেখেন। নেপ্‌ল্‌স্‌ থেকে ১৯৫২ সালে বেনামে বার হয় 'কাপ্তানের কবিতাবলী' (কবিতাগুলো যে নেরুদার লেখা তা প্রকাশ পায় ১৯৬২ সালে) এবং ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় 'প্রেমবিষয়ক সনেটশতক'।

পঞ্চাশোত্তর হওয়ার পর থেকেই নেরুদার কবিতা আবার নতুন বাঁক নেয়। এবার তাঁর কবিতায় আবার তীব্র হয়ে দেখা দেয় নিসর্গ, সমুদ্র আর কৃষ্ণদ্বীপে নির্মিত তাঁর নিজের বাড়ি। প্রকৃতির রহস্যের দিকে তিনি চোখ ফেরান পরম বিস্ময় নিয়ে। রাজনীতি আর ইতিহাস তখনও তাঁর কবিতায় রীতিমতভাবে উপস্থিত কিন্তু সেখানেও তিনি বার বার ফিরে যান সারাৎসারে, তাঁর উৎসের দিকে। জীবনের শেষ বছরগুলোতে তাঁর চোখে থেকে থেকে ঝিলিক দেয় মৃত্যুর পারাবার। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত কবিতার বইয়ের নাম দেন 'ভাটিয়ালি'। এইসব কবিতায় তিনি তাঁর জীবনের হিসেবনিকেশ করেন, দেশে দেশে ভ্রমণ, রাজনীতিতে অংশ নেওয়া এবং ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা বলেন। এই সময়ে তাঁর একটি গীতিনাট্যও ('হোয়াকিম মুরিয়েতার মহিমা ও মৃত্যু') বেরিয়েছিল। ১৯৭০ সালে মানব প্রগতির সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে নেরুদা অতিকথামূলক একটি কবিতা লেখেন। তার নাম, 'জাজ্বল্যমান তরবারি'।

১৯৭০ সালে চিলির প্রেসিডেন্ট হলেন সালভাদর আলেন্দে। (চিলির কমিউনিস্ট পার্টি গোড়ায় প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে নেরুদার নাম ঘোষণা করেছিল; কিন্তু কয়েকটি দল সম্মিলিতভাবে আলেন্দেকে মনোনয়ন করতে রাজী হলে কমিউনিস্ট পার্টি আলেন্দের সমর্থনে নিজেদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয়।) নেরুদা যে কী খুশী হলেন বলার নয়। এতদিন পর স্বদেশ চিলিতে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হতে চলেছে।

নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই নেরুদাকে কৃষ্ণদ্বীপে তাঁর শান্তির নীড় ছাড়তে হল। পারীতে তাঁকে চিলির রাষ্ট্রদূত ক'রে পাঠানো হল। পারীতে থাকার সময়ই ১৯৭১ সালে নেরুদা নোবেল পুরস্কার পেলেন।

১৯৭২ সালে বার হল তাঁর 'ফরাসী কবিতা চতুষ্টয়' এবং তারপর 'নিষ্ফল ভূগোল'। নোবেল পুরস্কার হাতে পাওয়ার অল্প কিছুকাল পরেই নেরুদা অবসর

নিয়ে ফিরে গেলেন কৃষ্ণদ্বীপে তাঁর জীবনসন্ধ্যার নীড়ে। তার আগেই তাঁকে আক্রমণ করেছে কালব্যাধি।

কিন্তু চিলিতে তখন ঘোর অশান্তি। দেশীবিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীরা চিলিকে তখন গৃহযুদ্ধের কিনারায় এনে ফেলেছে।

১৯৭৩ সালের অগস্ট মাসে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে নেরুদা তাঁর বহুদিনের বন্ধু এবং জীবনীকার মার্গারিতা আগিরেকে বলেন, 'চিলির পক্ষে এ এক হৃদয়বিদারক সময়। আমার পড়ার ঘরে এসে তা চড়াও হয়েছে, এই মহা-সংগ্রামে যোগ দেওয়া ছাড়া আজ আর কোনো উপায় নেই।'

এই সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বললেন, 'ভিয়েতনামেরই দশা, শুধু বোমা আর গোলাগুলি ফাটার শব্দ নেই এই যা।...নইলে চিলির বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে সম্ভবপর সব অস্ত্রই প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা আজ ঠিক এই মুহূর্তে এক অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত।'

নেরুদা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন ১১ই সেপ্টেম্বর প্রথমে নৌবাহিনী, তারপর সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করল। আক্রান্ত লা মোনেদা প্রাসাদে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন প্রেসিডেন্ট আলেন্দে। তার বারোদিন পরে ২৩শে মারা গেলেন পাবলো নেরুদা। তাঁর শবযাত্রাই হল চিলির নতুন জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর প্রথম বিক্ষোভ মিছিল। তার জবাবে ভাড়া করা গুণ্ডার দল নেরুদার সান্তিয়াগোর বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁর বই আর কাগজপত্র নষ্ট করে।

মৃত্যুশয্যাতেও নেরুদার কলম কখনও থামে নি। কবিতায় তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সমানে ছুঁড়েছেন মর্মঘাতী বাণ।

শেষ নিশ্বাস ফেলার আগেও তিনি লিখে গেছেন স্মরণীয় কবিতা :

আর আজ হৃত অরণ্যের গভীরে
তার কানে আসে শত্রুর আওয়াজ, সে তখন পালায়
দলছুট হয়ে নয়, আদতে নিজের কাছ থেকে
সেই অন্তহীন কথোপকথন থেকে

সমস্তক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকা ঐকতান থেকে
আর জীবনের অভিপ্রায় থেকে।

যেহেতু এই একবার, যেহেতু শুধু একবার, যেহেতু
একটি একস্বর শব্দ অথবা নৈঃশব্দ্যের একটি বিরতি
অথবা একটি তরঙ্গের অনবরুদ্ধ কলরব
আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয় সত্যের মুখোমুখি
সেখানে খোলসা করার আর কিছু থাকে না,
বাড়তি বলারও কিছু থাকে না ; সেই সবকিছু
রুদ্ধ ছিল অরণ্যদ্বার।
সূর্য প্রদক্ষিণ ক'রে পত্রাবলীকে উন্মীলিত ক'রে
শ্বেত ফলের মত আবির্ভূত হয় চাঁদ
আর মানুষ তার নিয়তির কাছে নতশির হয়।

উৎসর্গ

গড়বেতার মাটির মানুষ

সরোজ রায়

বন্ধুবরেষু

আর কিছু নয়

আমি সত্যের সঙ্গে কড়ার করেছিলাম
দুনিয়ায় আবার এনে দেব রোশনাই।

আমি হতে চেয়েছিলাম অন্নের মতন।
সংগ্রামে আমি নেই এমন কখনও হয়নি।

আর যা ভালবাসতাম আমি এখন তার ঠাঁইতে,
আমার হারানো নির্জনতার মাঝখানে।
এই পাথরের কোলে আমার ঘুম নেই।

আমার নীরবতার মধ্যে সমানে খেটে চলেছে সমুদ্র ॥

মৎস্যকন্যা আর একদল মাতালের উপাখ্যান

এই মহাশয়েরা সবাই তখন ভেতরে
মেয়েটি ঢুকল, একদম উদোম।
এতক্ষণ মদ গিলছিল, মেয়েটিকে দেখেই শুরু ক'রে দিল খেউড়।
নদী থেকে সদ্য আনকোরা ব'লে এদের কথার একবর্ণও সে বোঝেনি।
ও এক মৎস্যকন্যা, এসেছিল পথ ভুলে।
ওর ঝকঝকে গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল এদের মস্করা,
ওর সোনালী স্তনযুগে চড়াও হচ্ছিল এদের অশ্লীলতা।
চোখের জল তার অজানা ব'লে সে কাঁদেনি।
পোশাক অজানা ব'লে কিছু পরেনি।
সিগারেট আর দগ্ধ ছিপিতে ওকে ক্ষতচিহ্নিত ক'রে
এরা খিলখিল ক'রে হেসে সরাইখানার মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়েছে।
কথা কী তা সে জানত না ব'লে একটি কথাও বলেনি।

ওর ছুনয়নে ছিল সুদূরের ভালবাসার রং,
স্ফটিকতুল্য ছুটি বাহু।
প্রবালের আলোয় ওর ঠোঁটছুটো নিঃশব্দে নড়ছিল
আর শেষকালে, ঐ দরজাটা দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে গেল।
জলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেল তার সমস্ত গ্লানি
বৃষ্টিতে ধোয়া শ্বেতপাথরের মতই সে আবার ঝকমকিয়ে উঠল ;
পেছনে আর একবারও না তাকিয়ে আবার সে সাঁতরাতে লাগল,
সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলল যেদিকে খাঁ খাঁ করছে শূন্যতা,
যেখানে তার মরণ॥

আমরা বিস্তর

আমি বলতে, আমরা বলতে বিস্তর লোক—
কোনো একজনকে আমি ঠাহর করতে পারি না।
গায়েবী পোশাকে ওরা এখন আমার হাতের বাইরে।
অন্য কোনো শহরে ফেরার।

যখন ভেবেছি সব ঠিকঠাক
এবার একহাত দেখিয়ে দেব আমার কী এলেম,
সেইসময় আমার ভেতর লুকোনো আহাম্মকটা বেরিয়ে এসে
আমার জিভের ডগায় ভর করে।

অন্যান্য সময়ে, আমি কেউকেটাদের মাঝখানে
ব'সে ব'সে ঢুলছি,
আর যখন আমি আমার সাহসী আত্মপুরুষকে ডাকি
আমার সম্পূর্ণ অচেনা এক কাপুরুষ এসে
হাজারটা টুকটাক ভয়ভাবনায়
আমার অস্থিপঞ্জরটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে।

যখন কোনো রাজসিক ভবনে আগুন লাগে
আমার খবর দেওয়া অগ্নিনির্বাপকের বদলে
ঘটনাস্থলে দুম্ ক'রে এসে হাজির হয় এক ঘর-জ্বালানে
আর সে হল আমি। আমার করার কিছু নেই।
কী ক'রে এ থেকে নিজেকে আমি বেছে নেব?
কেমন ক'রে আবার আমি পুরনো ঠাঁই ফিরে পাব?

যত বই পড়ি
সমস্তই চোখ-ধাঁধানো নায়কদের ফোলায় ফাঁপায়,
সব সময় ওরা আত্মবিশ্বাসে ডগমগ।
দেখে হিংসেয় আমার বুক ফাটে;
আর যেসা ছায়াছবিতে হাওয়ায় সাঁ সাঁ ক'রে ছুটছে বুলেট,
ঘোড়সওয়ারদের দেখে হিংসে হয়,
এমন কি ঘোড়াগুলোকে দেখেও হাঁ হয়ে যাই।

কিন্তু যখন আমি আমার ভেতরকার ডাকাবুকোটাকে তলব করি,
বেরিয়ে আসে আবার সেই সাবেকের গেঁতো আমি,
আর তাই কখনও জানতে পারি না আমি কে
কিংবা আমি বলতে ক'জন, বা আমরা অতঃপর কে হব।
আমি চাইব একটা বেল্ টিপে
আমার আদত সত্তাকে, আমার প্রকৃত আমিকে ডেকে হাজির করতে,
কেননা যদি তাকে নিতান্তই আমার দরকার থাকে
তাহলে আমাকে উধাও হলে চলবে না।

আমি যখন লিখি, তখন আমি এখানে থাকি না,
আর যখন ফিরে আসি, তার আগেই আমার প্রস্থান।
আমাকে একবার দেখতে হবে ঠিক এই জিনিস
আমার যেমন তেমনি অন্যদের বেলাতেও ঘটে কিনা,
দেখতে হবে এত লোক ঠিক আমারই মতন কিনা,
আর তাদের নিজেদের কাছেও নিজেদের তেমনি মনে হয় কিনা।

এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে খুঁটিয়ে দেখবার পর
জিনিসগুলো আমার এত সুন্দরভাবে রপ্ত হয়ে যাবে যে,
আমার সমস্যাগুলো খোলসা করতে গিয়ে
আমি নিজের কথা না এনে
ভূগোলের কথা বলব ॥

বড় বেশি নাম

সোমবারগুলো মঙ্গলবারের সঙ্গে
সপ্তাহটা সম্বৎসরের সঙ্গে লটকে আছে।
তোমার ক্লিশিত কাঁচি দিয়ে
সময়কে ছেদ করা যাবে না
আর দিনের যত নাম
সমস্তই ধুয়ে মুছে যায় রাত্রির জলধারায়।

পেদ্রো নামটার কেউ হকদার নয়,
কেউ রোজা নয় মারিয়াও নয়,
আমরা সবাই ধুলোবালি,
বৃষ্টির পরতে বৃষ্টি।
ওরা আমাকে ভেনেজুয়েলা-টুয়েলা,
চিলি-টিলি, প্যারাগুয়ে-টুয়ের কথা বলেছে;
ওরা কী বলে আমার মাথায় ঢোকে না।
আমি শুধু ভূত্বকের কথাই জানি
আর এও জানি যে তার কোনো নাম নেই।

যখন আমার বাস ছিল শিকড়গুলোর মধ্যে
ফুলের চেয়েও তারা আমাকে ঢের বেশি আনন্দ দিত,
কোনো পাথরকে আমি কিছু বললে
ঠুনঠুন ক'রে বেজে উঠত।

সারাটা শীত জুড়ে
কী দীর্ঘবিলম্বিত বসন্ত।
সময় হারিয়ে ফেলেছিল জুতো।
একটা বছর চার-চার শতাব্দী।

রোজ রাত্তিরে আমি যখন ঘুমোই
কী নামে আমাকে ডাকা হয় বা হয় না?
যখন জেগে উঠি, কে আমি
যদি ঘুমের মধ্যে আমাতে আমি না থাকি?

এর মানে তাহলে এই যে
জীবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে
আমরা আসি নবজাতকের মত;
এতসব অনির্দেশ্য নাম,
এতসব ভারাক্রান্ত শিষ্টাচার,
এতসব ধুমধাড়াক্কা চিঠি,
এতসব দলিলদস্তাবেজে সই
—এই দিয়ে আমাদের মুখগুলো আমরা যেন ঠেসে না দিই।

আমার মন যায় সবকিছু একাকার করতে,
একত্র করতে, হওয়াতে,
মেলাতে মেশাতে, সব সাজ খুলে দিতে
যে পর্যন্ত না পৃথিবীর আলো
সমুদ্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়,
যতক্ষণ না ফুটে ওঠে
এক উদার, বিশাল পূর্ণতা,
এক মুচমুচে সৌরভ॥

আমি চাই স্তব্ধতা

এখন আর ওরা আমাকে ঘাঁটায় না।
আমার না থাকাটা এখন ওদের সয়ে গিয়েছে।

আমি বন্ধ করতে চলেছি আমার চোখ।

আমার শুধু পাঁচটা জিনিসের বাসনা,
পাঁচটা বাছা-বাছা কষ্টিপাথর।

এক হল নিরবধি ভালোবাসা।

দুই হল শরৎকালকে দুচোখ ভ'রে দেখা,
উড়ে উড়ে মাটিতে পড়া পতা
না দেখে আমি থাকতে পারি না।

তিন হল থমথমে শীত,
আমার ভালো-লাগা বৃষ্টি,
বিটকেল ঠাণ্ডায় আগুন-পোহানোর আরাম।

চারের জায়গায় গ্রীষ্ম,
তরমুজের মত গোলগাল।

আর তোমার দুনয়ন হল পঞ্চম।
মাতিল্দা, প্রেয়সী আমার,
তোমার চোখ ছাড়া আমার ঘুম আসবে না।
তোমার চাহনিতে ছাড়া আমার অস্তিত্ব থাকবে না।
বসন্তকে আমি এমনভাবে বদলাই
যাতে তুমি চোখ দিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে পারো।

বন্ধুগণ, এই হল সাকুল্যে বাসনা।
বলতে গেলে কিছু নয়, আবার বলতে গেলে সবকিছু।

এখন ওরা ইচ্ছে করলে যেতে পারে।

আমি এত বেশি বেঁচেছি যে একদিন
ওরা বাধ্য হয়ে আমাকে ভুলে যাবে,
ঘষে ঘষে তুলে দেবে খড়ির দাগ।
আমার অন্তঃকরণ ছিল অফুরন্ত।

কিন্তু আমি স্তব্ধতা চাইছি ব'লে
যেন কখনও ভেবো না আমি মরতে চলেছি।
ঠিক উল্টোটা।
আদতে আমি বাঁচতে চলেছি—

আমি আছি আমি থেকে যাব।

আমি থাকব না, অবশ্যই, যদি আমার অন্তস্তলে
ফসল বেড়ে উঠতে না থাকে,
প্রথমে মাটি ফুঁড়ে আলোয় চোখ মেলবে অঙ্কুর ;
কিন্তু মা বসুমতী অন্ধকার ;
আর আমার অন্তর্দেশেও অন্ধকার।
আমি যেন এক পাতকুয়ো, যার জলে
রাত্রি তার তারাগুলোকে রেখে
একা একা মাঠের ভেতর দিয়ে চলে যায়।

ব্যাপার হল, এত বেশি বাঁচবার পরেও
আমি আরও সেই পরিমাণ বেশি বাঁচতে চাই।

আগে কখনও মনে হয়নি আমার এত সুরেলা গলা,
কখনও আমি পাইনি এত বেশি চুম্বন।

বরাবরের মতই এখন এটা অসময়।
ঠিকরানো আলো যেন মৌমাছির ঝাঁক।

দিনটার সঙ্গে আমি একা থাকতে চাই।
আমাকে জন্মাবার অনুমতি দাও॥

ভয়

সবাই আমাকে খোঁচাচ্ছে। বলছে, লাফাও—
হৈচৈ করো, ফুটবল পেটো,
ছুড়দাড়িয়ে ছোটো, সাঁতরাও আর ওড়ো।
বেশ কথা।

সবাই আমাকে খোঁচাচ্ছে। বলছে,
একদম নড়াচড়া নয়।
সবাই ডাক্তার ঠিক করছে,
কেমন একটা ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে।
এসব কী হচ্ছে?

সবাই আমাকে খোঁচাচ্ছে। বলছে, বাইরে যাও—
ভেতরে এসো, বেরিয়ে যাও, বাইরে যেও না।
আমাকে বলছে মরতে, আবার বলছে ম'রো না।
তাতে কিছু যায় আসে না।

সবাই বলছে আসলে গোলমালটা
আমার অস্ত্রে।
এক্স-রের ছবিতে তাদের চোখ উঠেছে কপালে
আমি ওদের সঙ্গে একমত নই।

দুর্দান্ত কাঁটা দিয়ে
সবাই আমার কবিতাকে খুঁড়ছে,
নিঃসন্দেহে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা মাছি।
আমার ভয় করছে।

আমার ভয় করছে সারা পৃথিবীকে,
আমার ভয় কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলের, ভয় মৃত্যুর।
মরণ আছে এমন প্রত্যেকেরই মতন
আমাকেও কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না।

কাজেই এই সংক্ষিপ্ত দিনগুলোতে
আমি আর ওসব গণনার মধ্যে আনব না,
আমার সবচেয়ে বেইমান দুশমন
পাবলো নেরুদা—
তাকে নিয়ে এবার আমি
আমার আপনাকে খুলব আর বন্ধ করব॥

পাথরের মুখ

ও হ্যাঁ, চিনতাম বৈকি কত বছর একসঙ্গে থেকেছি
আদতে সোনা আর পাথরে গড়া তার চরিত্র
লোকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—
প্যারাগুয়েতে ফেলে রেখে আসতে হয়েছিল মা-বাবা,

ছেলেদের, ভাইপো-ভাগ্নেদের
শেষবারের সম্বন্ধীদের ;
ঘরদুয়োর, মুরগিগুলোকে,
আর কিছু আধ-খোলা বই ।
দরজায় ওরা তাকে নাম ধ'রে ডেকেছিল
খুলতেই পুলিশ ধ'রে নিয়ে চলে যায়,
এমন পেটায় যে,
ফ্রান্সে, ডেনমার্কে, স্পেনে, ইতালিতে
ঘুরতে ঘুরতে মুখ দিয়ে তার রক্ত উঠতে থাকে,
ফলে, মারা যায়, আমিও আর তাকে দেখিনি,
তার গুরুগম্ভীর নৈঃশব্দ্য আমার কানে আসেওনি,
তারপর একদিন ঝড়ের রাত্রে
তুষার যখন পাহাড়ে পাহাড়ে
বুনে চলেছিল শুচিশুভ্র পোশাক,
তাকাতেই দেখি ঐ অনেক দূরে
ঘোড়ার পিঠে আমার সেই বন্ধু—
পাথরে গড়া তার মুখচ্ছবি
দুর্যোগ উপেক্ষা ক'রে পাশ ফিরে আছে,
তার নাকে এসে ঝ'ড়ো হাওয়া
চুপ করিয়ে দিচ্ছে তাড়া-খাওয়া মানুষের গোঙানি
নির্বাসিত মানুষটার ঐখানে জায়গা হল
পাথরে রূপান্তরিত, সে এখন বাস করছে স্বদেশে ॥

স্মৃতি

সব কিছুই আমাকে মনে রাখতে হয়,
কুড়িয়ে রাখতে হয় ঘাসের পাতা,
ফেঁসে-যাওয়া ঘটনার সুতো,

ইঞ্চি মেপে মেপে প্রত্যেকটা বাড়ি
রেলের লম্বা লাইন ;
বেদনার মুখচ্ছবি।

একটিও গোলাপঝাড় যদি খোয়া যায়,
রাতের সঙ্গে একটা খরগোশও যদি তালগোল পাকায়,
কিংবা যদি একটি দেয়ালও
আমার স্মৃতিতে ভেঙে পড়ে,
আমাকে নতুন ক'রে আবার গড়ে নিতে হবে
হাওয়া, বাস্প, পৃথিবী, পাতা,
চুন থেকে ইঁট অবধি,
আমাকে যা বিদ্ধ করেছিল সেইসব কাঁটা
নিষ্ক্রমণের গতিবেগ।

কবির জন্যে তোমাদের মনে একটু দুঃখ হোক।

আমি ছিলাম সারাক্ষণ ভুলতে ব্যস্ত
আর আমার ঐ হাতদুটোতে ধরা ছিল
শুধুমাত্র যা ধরাছোঁয়ার বাইরে
আর যতসব অবান্তর জিনিস,
যার সঙ্গে একমাত্র না থাকারই
তুলনা চলতে পারে।

ধোঁয়া ছিল ঠিক একটা গন্ধের মত,
গন্ধের মত ছিল ধোঁয়া,
ঘুমন্ত একটি শরীরের ত্বকের মত,
যা আমার চুম্বনে জেগে উঠেছিল,
দোহাই, আমাকে জিগ্যেস ক'রো না কবে
কিংবা আমার দেখা সেই স্বপ্নের নাম—
আমি রাস্তা ঠিক করতে পারি না,

হয়ত সে রাস্তার কোনো দেশ নেই,
অথবা সেই সত্যটা বদ্‌লে গেছে,
অন্ধকারে জোনাকির মত
ভবঘুরে আলো করার জন্যে
দিন যাকে চেপে দিয়েছে ॥

হে পৃথিবী দাঁড়াও

হে সূর্য আমাকে রেখে এসো
আমার সেই প্রাকৃত বিধির নির্বন্ধে
সনাতন অরণ্যের বৃষ্টিতে,
আকাশ থেকে পড়া সৌরভ আর অসিগুলো,
গোচারণ আর পাথরের চাঁইয়ের নির্জন প্রশান্তি
নদীপ্রান্তিক আর্দ্রতা
ঝাউয়ের গন্ধ,
বুকের কল্‌জের মত সজীব যে হাওয়া
প্রাংশু পাইনের ভিড়ক্লিষ্ট ছটফটানির মধ্যে
স্পন্দমান
—সব আমাকে ফিরিয়ে দাও।

তাদের শিকড়গুলোর গুরুগম্ভীর থেকে ওঠা
নৈঃশব্দ্যের মিনার,
আমাকে ফিরিয়ে দাও, হে পৃথিবী, তোমার শুচিশুদ্ধ উপহার।
আমি ফিরে যেতে চাই সেই হওয়ার মধ্যে
যা আমি হই নি।
আর তেমনি গভীর থেকে ফিরে যেতে যেতে শিশুর
তাবৎ প্রাকৃতিক জিনিসের মাঝখানে
আমার বাঁচা সম্ভব কি সম্ভব নয়,

নদীবাহিত বাড়তি আরেকটি পাথর, কেলেকিষ্টি পাথর,
নির্ভেজাল পাথর হলে
কিছু আসে যায় না ॥

প্রাচ্যদেশে ধর্ম

রেঙ্গুনে গিয়ে আমি উপলব্ধি করলাম
ঠাকুরদেব্‌তারা, ঠিক ঈশ্বরের মতই,
গরিবগুর্‌বোদের শত্রু।
ঠাকুরদেব্‌তারা
সাদা সাদা তিমিমাছের মত
গা ঢেলে দিয়েছে স্ফটিকে,
ধানের মঞ্জরীর মত সোনায় মোড়া দেব্‌তারা।
সর্পদেব্‌তারা পেঁচিয়ে রয়েছে
জন্মানোর পাপকে,
দিগম্বর আর মার্জিত বুদ্ধেরা
বিকট ক্রুশকাষ্ঠে আরূঢ় খ্রীস্টের মতন
অসার অমরত্বের
মাইফেলে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে,
ওরা সকলেই সব পারে,
আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে ওদের স্বর্গ,
স্রেফ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কিংবা পিস্তলের নলে
কিনতে পারে ভক্তি আর পোড়াতে পারে রক্ত,
নিজেদের ক্লীবতা ঢাকার জন্যে
মানুষেরই তৈরি সব ভয়ঙ্কর দেবতা,
ওখানে আগাগোড়াই তাই,
সারা মাটিতে গন্ধ ছাড়ছে স্বর্গ
আর স্বর্গাদি বিষয়ের যাবতীয় সওদা ॥

কবিতার ব্যাপার

আর এটা ঘটল সেই বয়সে···কবিতা এল
আমার সন্ধানে। আমি জানি না কোথা থেকে এসেছিল
জানি না শীতঋতু থেকে, না নদী থেকে,
কখন কেমন ক'রে কিছুই জানি না
না, কোনো কণ্ঠস্বর নয়, কোনো শব্দ নয়,
নৈঃশব্দ্যও নয়,
তবে আমাকে ডেকে আনা হয়েছিল রাস্তা থেকে,
রাতের ডালপালা থেকে,
অন্যদের মাঝখান থেকে হঠাৎ,
চারপাশের ক্ষিপ্ত আগুনের মাঝখানে
কিংবা একার প্রত্যাবর্তনে,
যেখানে আমার কোনো চেহারা ছিল না
আর এটা আমার কী ভালো যে লেগেছিল।

আমি কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আমার মুখের
জানা ছিল না
নাম,
আমার চোখ ছিল অন্ধ,
আর কী যেন আমার অন্তরাত্মায় ঘা দিচ্ছিল,
জ্বর কিংবা হারিয়ে-যাওয়া ডানা,
আর আমাকে নিজে নিজেই পথ করতে হচ্ছিল,
জ্বলদগ্নির
রহস্য উন্মোচন ক'রে,
আর আমি ধ'রে ধ'রে লিখেছিলাম প্রথম অস্পষ্ট পঙ্‌ক্তি,
ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা নিরবয়ব, আগাপাছতলা
অর্থহীন,
ডাহা প্রাজ্ঞতা
এমন একজনের যার কোনো জ্ঞানগম্যি নেই,

আর আমি দেখলাম তৎক্ষণাৎ
আকাশ
অনাবৃত হয়ে
নিজেকে খুলে ধরেছে,
গ্রহতারা,
স্পন্দমান বাগিচা-বাগান,
শায়কে বিদ্ধ
ঝাঁঝরা ছায়া, আগুন আর ফুল,
কুণ্ডলিত রজনী, সারা বিশ্ব।

আর আমি, এক অণুরও অণু,
এই বিশাল তারকাখচিত শূন্যে
মাতোয়ারা,
রহস্যের সঙ্গে
যার মিল, যার আদল,
মনে হল আমি যেন
ধরণীগর্ভের এক নিখাদ অংশ,
আমি ঘুরতে লাগলাম তারাদের সঙ্গে,
হাওয়ায় নিজেকে ছেড়ে দিল আমার হৃদয়॥

আস্তেরিও

একটু যেন ছিটগ্রস্ত বন্দর
এই ভাল্‌পারাইজো,
ছায়া আর নক্ষত্র দিয়ে,
চাঁদের আঁশ
আর মাছের ল্যাজা দিয়ে চেনা যায়।
শুয়োরের লোমের মত খাড়া পাহাড়ে

নড়বড়ে সিঁড়ির ধারে
উঠতে হৃৎকম্প হয়।
সেখানে কুয়াশার ভেতর নাচে
বিষম দৈন্য আর চোখের কালি,
আর জানলায় জানলায় উত্তোলন করে
এ রাজ্যের নিশান
তালি-মারা বিছানার চাদর,
মান্ধাতার আমলের অন্তর্বাস,
লটর পটর করা জাঙিয়া,
সমুদ্রের সূর্য এইসব প্রতীককে অভিবাদন জানায়
আর তার মধ্যে ধোয়া ধবধবে কাপড়গুলো হাত নেড়ে নেড়ে
জাহাজসুদ্ধ যাত্রীদের বিদায় দেয়।

দরিয়া আর দমকা হাওয়ার,
বায়ু আর তরঙ্গে মোড়া দামাল দিনের মড়কগুলো,
গলিঘুঁজিগুলো শামুকের খোলের মত পাক দিয়ে দিয়ে
গাইতে গাইতে ওপরে ওঠে
সওদাগরী বিকেলের কোনো রাখঢাক নেই,
সূর্যদেব সমস্ত মাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন,
দোকানগুলো গছাবার জন্যে মুখ হাসি হাসি ক'রে
মেলে ধরে শো-কেস আর দাঁতের পাটি,
জুতো আর থার্মোমিটার,
বোতলভর্তি সবুজ বিভাবরী,
অপ্রাপ্য পোশাক, স্বর্ণবস্ত্র,
মারাত্মক মোজা, নিরাস্বাদ পনীর,
আর তাহলে এবার এই কবিতার
আসল কথায় আসা যাক।

এক দোকানের বাইরেটা
কাঁচে ঢাকা

আর ভেতরে,
চারদিকে ছড়ানো কালনিরূপক যন্ত্রের মধ্যে
ঘড়ির কারিগর দোন আস্তেরিও আলারকন।
জলে-পুড়ে আর ঘা খেয়ে
রাস্তাটা হাঁসফাস করে আর পাক খায়,
কিন্তু কাঁচের ওপিঠে
যোগাসনে স্থির
টিক্‌টিক্‌ যন্ত্রের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা
সুপ্রাচীন সেই ঘড়িওয়ালা,
তার এক চোখে দূরাভিসারী দৃষ্টি,
অন্য চোখে আঁচ করে অতলান্ত রহস্য,
ঘড়ির অন্তরের অন্তস্তল,
আর এক চোখ লাগিয়ে
তন্নতন্ন ক'রে খোঁজে
যতক্ষণ না ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা
সময় নিরূপণের প্রজাপতিটাকে
মাথার মধ্যে সে ধ'রে ফেলতে পারে,
যতক্ষণ না ঘড়ির ডানাগুলো সচল হয়।

দোন আস্তেরিও আলারকন হল
দণ্ডপলের সেকেলে নায়ক,
নৌকোর ঢেউ কাটে
তার হাতের মানদণ্ডে
ঘড়ির কাঁটায় তুলে দিয়েছে সে
ঠিকঠিক স্পন্দিত হওয়ার
গুরুভার।
জাহাজী হৃদয়ের নীলে
সযত্নে স্নেহ ঢেলে
দোন আস্তেরিও তার জলাধারে
সমুদ্রের সময়-মাপার যন্ত্রগুলো পরখ ক'রে দেখে।

পঞ্চাশটা বছর ধ'রে,
তার মানে আঠারো হাজার দিন,
ছেলেমেয়ে আর
স্ত্রীপুরুষের একটা জনস্রোত সমানে
বয়ে গেছে কখনও বন্ধুর পাহাড়ে, কখনও সমুদ্রের দিকে,
তখন ঘড়ির দঙ্গলের মধ্যে
সেই ঘড়িওয়ালা
কালস্রোতে বন্দী থেকে
একটানা স্রোতের বিপরীতে
অবিচল জাহাজের মত
তরতরিয়ে গেছে,
ঘষে ঘষে সমান করেছে কাঠ,
আর একটু একটু ক'রে
কারিগর হয়ে উঠেছে ওস্তাগর।
বিবর্ধক কাঁচ আর তেল দিয়ে
কাজ করতে করতে
মুছে গেল মাৎসর্য, ঘুচে গেল ভয়,
সার্থক তার কাজ আর তার ভবিতব্য,
আজ এই পর্যন্ত, যেখানে সময়,
সেই ভয়ঙ্কর অতিবাহন,
তার সঙ্গে, দোন আস্তেরিওর সঙ্গে বোঝাপড়ায় এল,
আর সে এখন ঘড়ির কাঁটায় প্রহর গুনছে।

সেই অসাব্যস্ত রাস্তা দিয়ে
যখনই আমি যাই,
ভাল্‌পারাইজোর কৃষ্ণবর্ণ সেই নদী,
অনেক শব্দের মধ্যে একটি মাত্র শব্দ,
আমার কানে আসে
রাজ্যের ঘড়ির মধ্যে শুধু একটির টিক্‌ টিক্‌ :
ক্লান্ত, মার্জিত, অস্ফুট ফিস্‌ফাস

আর এক নিখুঁত প্রকাণ্ড হৃদয়ের
সাবেকী চলন :
দোন আন্তেরিওর বহুবিশ্রুত
আর বিনম্র টিক্ টিক্ ॥

টগবগিয়ে দক্ষিণে

ঘোড়ার পিঠে একশো কুড়ি মাইল,
মালেকো পাহাড় সমানে ওঠে নামে :
দুপাশে ক্ষেত সদ্য জলে-ধোয়া,
গায়ে সতেজ প্রাণজুড়ানো হাওয়া ।

এ তল্লাটে পাথর আর গোধুম,
কোথাও পাখি সহসা ডেকে ওঠে
কিংবা জল গড়িয়ে গড়িয়ে লেখে
এই পৃথিবীর লুপ্ত কোনো লিপি ।

বৃষ্টি পড়ে, সমানে টিপ টিপ,
আকাশে স্থচিস্থক্ষ্ম জলধারা
কখন জলবৃষ্টিতে যায় মুছে
জোর কদমে ছুটন্ত সেই ঘোড়া

বৃষ্টি যেই সজোরে মাটি খোঁড়ে
চোখে আবার স্পষ্ট তার আকার,
আমি ছুটছি টগবগিয়ে হাওয়ায়
বৃষ্টির সেই ঘোড়ার পিঠে চেপে ।

বৃষ্টির সেই ঘোড়ার পিঠে চেপে
পেছনে ফেলে চলেছি এসব দিক,
বিরাট এই বিজন আর্দ্রতা,
পাথরে ঘেরা মালেকো মালভূমি ॥

নড়ছি না

তারার রাজ্যে সমানে টহল দেবে
ধাতব এইসব জিনিস,
নিরীহ চাঁদের গায়ে হাত তোলার জন্যে
খিন্ন মানুষেরা ঊর্ধ্বে চড়াও হবে।
আর সেখানেই বসাবে তারা তাদের ওষুধের দোকান।

আঙুরগুলোর ফুলে ফেঁপে ওঠার এই সময়টাতে
সমুদ্র আর পাহাড়ের মাঝখানে
জীবনের সাড়া জাগে মদিরায়।

চিলিতে এখন নাচতে লেগেছে চেরীফুল,
শামলা মেয়েরা গাইছে,
আর গীটারে গীটারে জলের ঝিকিমিকি।

সব দরজাতেই হাত ছোঁয়াচ্ছে রোদ্দুর
আর গমের মধ্যে দেখাচ্ছে তার হাতযশ।

পয়লা মদ হয় গোলাপী
ছোট্ট মা-মণির মত মিষ্টি
দোস্‌রা মদ
নাবিকের কণ্ঠস্বরের মত জোরালো,
আর পোখরাজ আর আফিমফুল আর আগুন
সব এক ক'রে হয় তেস্‌রা মদ।

আমার বাড়িটার সমুদ্রও আছে ডাঙাও আছে
আমার গৃহিণীর আছে
বাদামী রঙের বড় বড় জংলা চোখ,
যখন রাত আসে

সমুদ্র পরে সবুজ আর শুচিশুভ্র সাজ,
আর ঠিক সেই সময় ফেনপুঞ্জে শুয়ে
চাঁদ স্বপ্ন দেখে সমুদ্রকূলের নববধূর মত।

আমি চাই না গ্রহ বদল করতে ॥

পতাকা

আমার পতাকাটি নীল, তাতে আড় ক'রে ধরা একটা মাছ, তাকে বেড়ি পরাচ্ছে আর খুলছে দুটি বাজুবন্ধ। শীতের সময়, যখন জোর হাওয়া দেয়, এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গাগুলোতে কেউ যখন থাকে না, তখন সপাং-সপাং-করা চাবুকের মতো পতাকার আওয়াজটা বেশ লাগে, আর মাছটা আকাশে এমনভাবে সাঁতার দিতে থাকে যেন একেবারে জীয়ন্ত।

লোকে জিগ্যেস করে, তো মাছ কেন? তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার নাকি! আমি বলি, আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা হল মীনতন্ত্রের মন্ত্র, প্রাক্‌বৈদিক, জ্যোতিরাঙ্গিক, ভর্জিত, স্বভাবী, কাবাবিক, ভাজা মাছ।

—তো ব্যস!

—ব্যস।

কিন্তু চড়া শীতে, মাছটা নিয়ে সেই পতাকাটা দাপাতে দাপাতে উঠে গিয়ে ঠাণ্ডায়, হাওয়ায়, আকাশে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে থাকে।

টমেটোর ভজন

টমেটোয়
টইটম্বুর রাস্তা
ভরদুপুর,
গ্রীষ্ম,
রোদ
ভেঙে পড়ে
দু-
আধখানা
টমেটোয়,
রাস্তা দিয়ে
ছুটে যায়
রস।
ডিসেম্বরে
টমেটোরা
বাঁধন ছেঁড়ে,
এসে চড়াও হয়
রান্নাঘরে,
প্রাতরাশ, কব্‌জা করে,
তাকগুলোতে
গা
ঢেলে দেয়,
বাটি গেলাস
মাখনের পাত্র
নীল লবণদানির সঙ্গে
গা ঘষে।
টমেটোর আছে
নিজস্ব চেকনাই,
বেশ একটা রাজকীয়-ভাব।

কি যে বিচ্ছিরি
খুন আমাদের করতেই হবে
ওর জ্যান্ত কোমল অঙ্গে
ঢুকে যায়
একটা ছুরি,
লাল
আঁতড়ি,
এক তরতাজা
অতল
অফুরন্ত সূর্য
চিলি-র
আনাজ ভ'রে দেয়,
রাঙা টুকটুকে পেঁয়াজকে
হাসিমুখে পাত্রস্থ করে,
আর ভোজের জন্যে
জলপাই গাছের
নির্যাস
অপত্য স্নেহ
হাঁ-করা দুই গোলার্ধে
দু-হাতে
ঢেলে দেয়,
তাতে যোগ হয়
মশলার সুঘ্রাণ,
মন মজায় নুন,
বেজে উঠল, শোনো—
দিনের বিয়ে বাড়ি :
ধনেপাতা
তুলে ধরছে টুকটুকে নিশান,
টগবগ টগবগ করছে আলু,
কাবাবগুলো ম' ম' ক'রে

গন্ধ নিয়ে গিয়ে
দরজায়
ঘা দিচ্ছে :
সময় হয়েছে !
চলো ব'সে পড়ি ।
আর টেবিলের
ওপর,
গ্রীষ্মের মেখলায়,
টমেটোগুলো,
পৃথিবীর জ্যোতিষ্ক,
বহুগণিত
আর উর্বর তারাগুলো
তাদের সংবর্তন,
আর পরিপূর্ণতার
আর প্রাচুর্যের
খেল্ দেখাচ্ছে
হাতছাড়া,
খোলা,
বা আঁশ বা কাঁটা বিনা
আমাদের দিচ্ছে
গরগরে
আর বিলকুল গরম গরম
ভুরিভোজ ॥

কুঁড়ের বাদ্‌শা

ইস্পাতের এই জিনিসগুলো তারাদের পাড়ায়
তখন টহল দিয়ে ফিরবে,
গোবেচারা চাঁদকে পিটিয়ে দুরমুশ করতে

নাজেহাল মানুষেরা ওপরে উঠে যাবে
আর সেখানে বসাবে তাদের ভুষিমালের দোকান।

দ্রাক্ষাফল রসে ভরপুর হওয়ার এই হল সময়
সমুদ্র আর একসার পাহাড়ের মাঝখানে
শরাবে জাগছে জীবনের সাড়া।

চিলিতে এখন চেরীফুল নাচছে,
শ্যাম্‌লা রঙের মেয়েরা গাইছে
আর গীটারে গীটারে চিক চিক করছে জল।

প্রত্যেকটি দুয়োর স্পর্শ করছে রোদ্দুর
আর গমের শিষে দেখাচ্ছে যেন ভানুমতীর খেল।

পয়লা শরাব গোলাপী
কচি শিশুর মত মিষ্টিমধুর।
দোসরা শরাব সাজোয়ান
খালাসীর গলার স্বরের মতন জোরালো।
তেস্‌রা শরাব হিরণ্ময়,
একাধারে আফিমফুল আর আগুন।

আমার বাড়িটার সমুদ্র আছে মাটিও আছে
আমার ঘরনীর আছে
হালকা বাদামী রঙের দুর্দান্ত চোখ,
যখন রাত নেমে আসে
সমুদ্র প'রে নেয় শ্বেতহরিৎ সাজ
আর তারপর জ্যোৎস্নায় ফেনপুঞ্জ দেখে
সমুদ্রশায়ী নববধূর মত স্বপ্ন।

আমার কোনো বাসনাই নেই এ গ্রহ বদল করবার॥

পলাতক

১

চোখের জল থেকে লেখার কাগজ, এক সাজপোশাক ছেড়ে অন্য সাজপোশাক
ঢ্যাঙা রাত্তির বেয়ে, তাবৎ জীবনের ভেতর দিয়ে,
সেই দম-আটকানো দিনগুলোতে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি।
বাইরে যখন ফুটফুটে আলো, নির্জন নক্ষত্রের ঠাসবুনানি,
পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে,
আমি পেরিয়ে গিয়েছি শহরের পর শহর,
জঙ্গলের পর জঙ্গল, ছোট ছোট খামারবাড়ি, ঘাটবন্দর,
কোনো একজনের ঘরদুয়োর থেকে
আরেক জনের ঘরদুয়োরে, কোনো একজনের হাত থেকে
আরেক জনের হাতে, তারপর আরেক জনের।
ঘনকালো রাত্রি, মানুষ তবু ভাইকে দেয়
পথের দিশা ;
রাস্তা দিয়ে অন্ধকারে আমাকে অন্ধের মত হাত ধ'রে
পৌঁছে দিয়েছিল আলো কত দেহলিতে, এই ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দুতে
যা ছিল আমার,
জঙ্গলে রুটির সেই টুকরোর কাছে
নেকড়ের দল তখনও যা খেয়ে ফেলে নি।

এক রাত্রে আমি এসে পড়লাম
চারিদিকে ফাঁকা মাঠের মধ্যে এক আস্তানায়,
এর আগে ঐসব জীবনযাত্রা কারো চোখে পড়ে নি
কিংবা কেউ আঁচ করতেও পারে নি।
তাদের যাবতীয় কাজ, তাদের সময়সূচী,
আমার এই নতুন জানা হল।
আমি ঘরে ঢুকলাম, সংসারে ওরা পাঁচজন প্রাণী
রাতদুপুরে যেন হঠাৎ আগুন লাগায়
ধড়মড় ক'রে ওরা সব উঠে পড়েছে।

আমি হাত ধরলাম
একজনের পর একজনের, মুখের দিকে তাকালাম
একজনের পর একজনের, ওরা আমাকে
কিছু বলল না : ওরা সেইসব ঘরদুয়োর
রাস্তা দিয়ে যেতে যাদের দিকে আমি কখনও তাকাই নি,
আমার মুখের আদল যাদের অচেনা সেইসব চোখ, আর
আমার দেশের শিয়রে বহুকষ্টে জেগে বসে থাকার জন্যে
সেই নিশুত, নবাগত রাত্রে
আমি টান টান ক'রে বিছিয়ে দিয়েছিলাম আমার ক্লান্তি।

ঘুমের অপেক্ষায়,
পৃথিবী তার বিস্তর প্রতিধ্বনি, তার
গলাফাটানো চিৎকার আর নির্জনতার লতাতন্তু নিয়ে
বহাল রেখেছিল রাত্রি,
আর আমি ভেবেছিলাম : 'আমি কোথায় ?
ওরা কারা ? কেন ওরা নিয়েছে
আজ আমার ভালমন্দের ভার ?
যারা এর আগে জীবনেও আমাকে দেখে নি,
কেন তারা আমার জন্যে অবারিত করে দ্বার,
রক্ষা করে আমার গান ?'
কেউ উত্তর দেয় নি,
শুধু মর্মরিত হয়েছিল পাতা-খসা রাত্রি,
শুধু ঝিঁঝিঁদের জাল বোনা ;
সারাটা রাত যেন তার পত্রলেখায়
তিরতিরিয়ে কেঁপেছিল।
আমার বাতায়নবর্তী নৈশ পৃথিবী
তুমি তোমার ওষ্ঠাধর আমার কাছে এনেছিলে
যাতে আমি সুখে নিদ্রা যেতে পারি,
যেন হাজার হাজার পাতায় দেহভার এলিয়ে দিয়ে,
মরশুম থেকে মরশুমে, নীড় থেকে নীড়ে,

এক তরুশাখা থেকে অন্য তরুশাখায়
যতক্ষণ না অচিরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি,
তোমার শিকড়ে শিকড়ে মৃতের মতন পরম শান্তিতে।

২

আঙুরক্ষেতে তখন ছিল শরৎকাল।
তিরতির ক'রে কেঁপেছিল অগুনতি দ্রাক্ষালতা।
মাথায়-ঘোমটা-টানা তাদের অমলধবল গুচ্ছ
মিষ্টিমধুর আঙুলে জড়িয়েছিল তুষার,
আর কালো আঙুরগুলো
কোনো নিহিত চক্রাকার নদী থেকে
ভ'রে নিয়েছিল তাদের টুকটুকে টান-টান স্তনবৃন্ত।
বাড়ির যিনি কর্তা, সেই
হ্যাংলামুখো কারিগর
এই আলো-আঁধারির পাংশু মৃন্ময় বইটি আমাকে প'ড়ে শোনালেন।
তাঁর মায়ামমতার নখদর্পণে ছিল প্রত্যেকটি ফল
গাছের প্রত্যেকটা কাণ্ড, তিনি জানতেন
কেমন ক'রে ডালপালা ছেঁটে
গাছকে দিতে হয় নিছক পানপাত্রের আকার।
তাঁর ঘোড়াগুলোর সঙ্গে তিনি কথা বললেন এমনভাবে
যেন তারা সব দশাসই ছেলেপুলে,
তাঁর পায়ে আঠার মত লেগে রইল কুত্তাগুলো
আর বাড়ির পাঁচটা বেড়াল,
কারো ছিলা-টানা গয়ংগচ্ছ ভাব,
কেউবা পীচগাছের স্নিগ্ধ ছায়ায়
উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটছিল।
তাঁর জানা ছিল গাছের প্রত্যেকটা ডাল,
প্রত্যেকটা ক্ষতচিহ্ন,
আর ঘোড়াগুলোর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে
মুনিঋষিদের মত গলায় আমাকে তিনি সদুপদেশ দিলেন।

৩

আবারও আমি চুঁড়তে থাকলাম অন্ধকার।
নগর পেরিয়ে, আন্দেজ্-এর পার্বত্য রজনী,
উড়নচণ্ডে রাত্রি আমি নাছোড়বান্দা হওয়ায়
উন্মীলিত ক'রেছিল তার গোলাপ।
দক্ষিণে তখন শীতের মরশুম।
তার উঁচু পাদপীঠে আরূঢ় হয়েছিল তুষারপুঞ্জ,
হাজার হিমশলাকা নিয়ে
জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল ঠাণ্ডা।
মাপোচো নদী তখন জমে-যাওয়া কালো ররফ।
আর আমি তখন দুঃশাসন-কলঙ্কিত শহরে
নির্বাক এ-রাস্তা ও-রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছি,
হায়, আমি যেন স্বয়ং সেই নৈঃশব্দ্য,
ঠায় দেখছি আমার চোখ থেকে
বুকের মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসা।
এ-রাস্তা আর ও-রাস্তা,
রাতের বরফে-মোড়া চৌকাট,
মানুষের নৈশ নির্জনতা,
আর ফৌত-হওয়াদের মাটকোঠায়
তলিয়ে-যাওয়া শ্যামলারঙের আমার আপনজন,
সবকিছুই, কৃত্রিম আলোর
ছোট্ট কচি ডাল লাগানো সর্বশেষ গবাক্ষ,
বাসাবাড়ির গায়ে বাসাবাড়ির
থেঁতলানো কালো প্রবালকীট,
আমার দেশের ক্লান্তিজুড়ানো বাতাস,
সব কিছুই ছিল আমার, সব কিছু
নিঃশব্দে আমার দিকে তুলে ধরেছিল
এক অফুরন্ত ভালবাসার হাঁ-মুখ।

৪

এক তরুণ দম্পতি খুলে দিয়েছিল আরও একটি দুয়ার
সেও ছিল আমার অজানা।

মেয়েটির ছিল কাঁচা সোনার রং

ঠিক জুন মাসের মত। ছেলেটি
ঢ্যাঙা ইঞ্জিনিয়ার। তখন থেকেই
আমি ভাগ বসাতে লাগলাম তাদের রুটিতে আর মদে,

একটু একটু ক'রে

আমি নাগাল পেলাম ওদের অজ্ঞাত নৈকট্যের।
ওরা আমাকে বলল : 'আমরা একসঙ্গে নেই
অনেকদিন,
আমাদের বিরোধ বরাবরের ;
আজ আমরা দুজনে একসঙ্গে হয়েছি আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে,
আজ আমরা দুজনে একসঙ্গে থেকেছি আপনারই অপেক্ষায়।'
সেই ছোট্ট বাড়িটাতে
আমরা একত্রে মিলেছিলাম
একটি নিঃশব্দ দুর্গ বানাতে।
এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও, আমি বজায় রেখেছি
নৈঃশব্দ্য।
আমি ছিলাম একেবারেই
নগরীর করতলের মধ্যে, আমার প্রায় কর্ণগোচর হচ্ছিল
বেইমানের পায়ের শব্দ ; মাঝখানে দেয়াল
আর ঠিক তার ওপাশেই
কারাপালদের জঘন্য কণ্ঠস্বর,
তাদের ডাকাতে অট্টহাসি,
আমার দেশের শরীরে বেঁধানো বুলেটের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল
তাদের মত্তাবস্থার স্খলিত কথাগুলো।
হল্‌গের্স আর পব্‌লেতের * হেঁচ্‌কির চোটে
আমার নিঃশব্দ গায়ের চামড়া প্রায় ছড়ে গিয়েছিল,

* চিলির ফ্যাশিস্ট একনায়ক গোন্সালেথ ভিদেলার দুই শাগরেদ

ওদের ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে চলা পদক্ষেপ আরেকটু হলেই
ছুঁয়ে ফেলত আমার হৃদয় আর তার আগুন :
ওরা আমার দেশের মানুষদের পাঠাচ্ছে যমযন্ত্রণার মধ্যে,
আমি চোখের মণির মত আগলাচ্ছি আমার স্বাস্থ্যের তরবারি।
তারপর রাত্রে আবার সেই, 'বিদায় আইরিন,
বিদায় আঁদ্রে, বিদায় নবীন বন্ধু,'
বিদায় বাঁশের ভারা, নক্ষত্রমণ্ডলী,
হয়ত বিদায় আমার জানলার সামনেকার
সেই অসমাপ্ত বাড়ি
যেখানে থাকত ব'লে মনে হয় কাঠিকাঠি সুতোলি ভূতের দল
বিদায় উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ
রোজ অপরাহ্ণে যা আমার নজর কেড়ে নিত,
বিদায় সবুজ নিয়ন চিহ্ন
প্রত্যেকটি নতুন রাত্রি বিজ্ঞাপিত হত
যার বিদ্যুল্লেখায়।

৫

অন্য এক সময়ে, অন্য এক রাত্রে, আমি গিয়েছিলাম
আরও এগিয়ে ; উপকূলের পাহাড় পর্বত বেয়ে,
প্রশান্ত মহাসাগরের কাছ বরাবর বিস্তৃত কিনারায়,
তারপর সেখান থেকে পাক-খাওয়া রাস্তায়,
সরু সরু অলিগলিতে : ভাল্‌পারাইজো বন্দরে।
আমি গিয়ে উঠেছিলাম এক জাহাজীর ঘরে।
আমার পথ চেয়ে বসেছিলেন তার মা।
বলেছিলেন, 'কাল তো সবে শুনলাম।
আমার ছেলে আমাকে বলল। আপনার নাম শুনে
আমার ভেতরটা ঝিলিক দিয়ে গেল নিস্তাপ আগুন।
বললাম, কিন্তু আমাদের এখানে
কীইবা ওঁকে আমরা দেব ? ওঁর তো কষ্ট হবে।
আমার ছেলে বলল, উনি আমাদের লোক,

গরিবের পক্ষের।
আমাদের হতচ্ছাড়া জীবনকে ঘৃণা বা
উপহাস করার লোক নন উনি। শুনে বললাম, তাহলে ঠিক আছে-
আজ থেকে উনি হবেন আমাদের ঘরের লোক।'
বাড়ির আর যারা, কেউ আমাকে চিনত না।
পরিষ্কার ধবধবে টেবিলঢাকা,
নিগূঢ়তম রাত্রি থেকে উঠে
স্ফটিকের ডানায় ভর ক'রে আমার কাছে উড়ে আসা
ঐসব জীবনের মতই স্বচ্ছ জলের সোরাই
আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।
আমি জানলার ধারে যাই। ভাল্‌পারাইজো
উন্মীলিত করে তার ভয়চকিত সহস্র চোখের পাতা,
সমুদ্রের নৈশ হাওয়া বয়ে যায়
আমার মুখের মধ্যে,
পাহাড়গুলোর গায়ে আলো,
জলের ওপর বারদরিয়ার চাঁদের
ঝিকিমিকি, অন্ধকার
যেন সবুজ হীরায়
জ্বলজ্বলন্ত কোনো রাজ্যপাট,
জীবন আমার করপুটে ভ'রে দেয়
এইসব নতুনতর প্রশান্তি।
আমি চারপাশে তাকাই : টেবিলে
থরে থরে সাজানো ; রুটি, ন্যাপকিন, মদ, খাবার জল,
আর মাটির গন্ধ আর কোমলতা
আমার জঙ্গী দুচোখ বাষ্পাকুল ক'রে তোলে।
ভাল্‌পারাইজোর সেই জানলার ধারে
রাতের পর রাত আর দিনের পর দিন আমি কাটিয়েছি।
আমার নতুন আশ্রয়দাতা সেই জাহাজীর দল
রোজ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াত কোনো জাহাজ
যা তাদের নিয়ে যাবে।

বার বার গেছে আর
বার বারই তারা ঠকেছে।
আতোমেনা জাহাজে
তাদের জায়গা হয় নি, স্থলতানাতেও নয়।
খোলসা ক'রে ওরা আমাকে বলেছিল :
অফিসারদের একে ওকে যদিবা ওরা ঘুষ দেয়
অন্যেরা দেয় আরো বেশি।
সব কিছুই পচা-গলা
সান্তিয়াগোর রাজভবনেরই মতন।
এখানে একজন নায়েক
কিংবা মুন্সির পকেট তত বেশি ফুলে ঢোল হয় না বটে
যতটা হয় প্রেসিডেন্টের পকেট,
তবু অস্থিসার গরিবদের
কুরে খাওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট।
অসুখী প্রজাতন্ত্র, কুকুরকে লাঠিপেটা করে
চোরের দল,
পুলিশের হাতে বেত্রাহত
রাস্তায় রাস্তায় বুকফাটা শুধু চিৎকার।
ভিদেলা-গ্রস্ত, অসুখী দেশ,
ইতর জুয়াড়ির দল
তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে গুপ্তচরদের বমির মধ্যে,
তাকে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাঙাচোরা রাস্তার মোড়ে,
বিজাতীয় নিলামে খসিয়ে ফেলা হয়েছে তার সর্বাঙ্গ।
এমন একজনের কব্জায় দুর্ভাগা প্রজাতন্ত্র
যে বেচে দিয়েছে তার নিজের মেয়েকে,
আর পরের হাতে তুলে দিয়েছে
ক্ষতবিক্ষত, কণ্ঠরুদ্ধ, হাতকড়ি-পরানো তার দেশকে।
জাহাজী দুজন এসে তারপর আবার বেরিয়ে গেল,
তারা টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যাবে বস্তা, কলার কাঁদি, খাবার জিনিস,
আর সারাক্ষণ বুভুক্ষু হয়ে থাকবে ঢেউয়ের লবণের জন্যে,

দরিয়ার রুটির জন্যে, ঢ্যাঙা আকাশের জন্যে।

আমার নিঃসঙ্গ দিনেদুপুরে
পেছনে স'রে গিয়েছিল সমুদ্র ; আমাকে অগত্যা
ছেড়ে চলে যেতে হল পাহাড়ে,
যেখানে মাথার ওপর ঝুলন্ত সব বাড়ি,
ভাল্‌পারাইজোর প্রাণচাঞ্চল্যে স্পন্দমান সেই ধমনীতে
জ্যান্ত মানুষে উপ্‌চে-পড়া
উঁচু উঁচু পাহাড়, দরজায় দরজায়
আশমানী, ঘোর রক্তবর্ণ আর ফিকে লাল রং-করা,
ওপরে ওঠার ফোকলা সিঁড়ি,
ঝাঁক-বাঁধা দীনহীন বারদুয়ার,
জরাজীর্ণ ঝুপড়ি,
সেইসঙ্গে সব কিছুর ওপর
লবণাক্ত বাষ্পের জাল ফেলা কুয়াশা,
খাড়া পাহাড়ের গায়ে
পড়ি-মরি ক'রে আঁকড়ে থাকা গাছ,
অমানুষিক বাড়িগুলোর বাহুলগ্ন হয়ে ঝুলে থাকা
শুকোতে-দেওয়া জামাকাপড়,
হঠাৎ হঠাৎ সিটি বাজার কর্কশ আওয়াজ :
যাত্রী ওঠার ফলস্বরূপ,
হুড়মুড় ক'রে পড়া আর ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজের সঙ্গে
পিণ্ডিপাকানো নাবিকদের কণ্ঠস্বর
নতুন পার্থিব পরিচ্ছদের মতন
আমার শরীরটাকে ঢেকে দিয়েছিল এইসব জিনিস,
দীনদরিদ্রের মাথা-উঁচু-করা শহরে,
উত্তুঙ্গ কুহেলির রাজত্বে যখন আমি বাস করছিলাম।

৬

পাহাড় এলাকার জানলা, ঠাণ্ডা কন্‌কনে
টিন-আকরিক ভাল্‌পারাইজো, ইঁটপাথরে
আর মানুষের চিৎকারে বিধ্বস্ত !
আমার গোপন ডেরা থেকে দেখ—
জাহাজে জাহাজে অলঙ্কৃত ধূসর পোতাশ্রয়,
প্রায় নিথর নিস্তরঙ্গ
চন্দ্রালোকিত জলরাশি,
রুদ্ধগতি স্তূপাকার লৌহ।

দূর অতীতের এক প্রহরে
ভাল্‌পারাইজো, তোমার সমুদ্রে গিজগিজ করত
পালতোলা কৃশতনু ক্ষিপ্রগতি জাহাজ,
শোরা খালাস ক'রে গোধূমে-ঠাসা
পাঁচ মাস্তলের গর্বিত বহর,
তারা তোমার কাছে আসত গাঁটছড়াবাঁধা সমুদ্র থেকে,
ভ'রে দিয়ে যেত তোমার সমস্ত গুদামঘর।
সমুদ্রবক্ষের ঠিকদুপুরে ঢ্যাঙা বাদামতোলা জলযান,
সওদাগরী নৌকো, সামুদ্রিক রাত এলে
হাওয়ায় ফুলে উঠত তার ধ্বজানিশান,
তারা বইত আবলুস্‌ কাঠ আর গজদন্তের
মসৃণ স্বচ্ছতা, কফির সুবাস
আর অপরাপর চাঁদের নিচেকার রাত্রি,
ভাল্‌পারাইজো, তারা পা বাড়িয়েছিল
তোমার অরক্ষিত শান্তির দিকে, তোমাকে সুগন্ধিতে
ঢেকে দিয়ে। সমুদ্রে এগোতে এগোতে
শোরায় ভরপুর পোতোসি
থরহরি কম্পমান হয় :
মাছ আর ধনুর্বাণ ; নীল মন্থন,

অপরূপ তিমি, তারপর
পৃথিবীর অন্যান্য অন্ধকার বন্দরের দিকে যাত্রা।
তখন গোটানো পালবাদামের মাথায়,
গলুইয়ের পুংকেশর-স্তনাগ্রের ওপরে
তাবৎ দক্ষিণের রাত্রি,
যখন নৌকোর গায়ে খোদাই-করা মাতৃকা
আর ঝাঁপুই-খেলা গলুইয়ের মুখমণ্ডলের ওপর দিয়ে
নেমে এল গোটা ভাল্‌পারাইজো-চিহ্নিত রাত্রি,
পৃথিবীর কুমেরুবৃত্তের রাত্রি।

৭

তরুবৃক্ষহীন প্রান্তরে সেটা ছিল যবক্ষারের উষাকাল,
শোরাঘটিত গ্রহলোক কেঁপে উঠেছিল
যতক্ষণ না জাহাজের বোঝাই-করা খোলের মতন
চিলিকে বেশ ক'রে ঠেসে দেওয়া হয়েছিল।
প্রশান্ত মহাসাগরের বালুকাবেলায়
কোনো পদচিহ্ন না রেখে যারা চলে গিয়েছিল
আজ আমি দেখেছি তাদের কতটুকু কী পড়ে আছে।
আমার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখ,
দেখবে আমার দেশের গলায় ঝোলানো
পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ,
পূযরক্তের যেন কণ্ঠহার, যেন সোনা-ঝরানো বৃষ্টি।
হে পথিক, ভাল্‌পারাইজোর আকাশ থেকে
অচ্ছেদ্য, আমার গতিরুদ্ধ চাহনি
তোমার সঙ্গ নিক।
জঞ্জাল আর কুমেরুর ঝড়বাতাসের মাঝখানে থাকে-
রুক্ষ দেহাতের শ্যাম্‌লা ছেলে
চিলির মানুষ।
পাহাড়ের ফিনফিনে
ঢালজমি আঁকড়ে

চিড়-ধরা জানলার শার্সি, ভাঙা ছাদ,
ধসে-যাওয়া দেয়াল, নুয়ে-পড়া দরজা।
গলাখসা চুনকাম, মাটির কাঁচা মেঝে।
ভাল্‌পারাইজো, অশুচি গোলাপ,
ভাপ্‌সানো নাবিকের শবাধার !
তোমার কণ্টকিত পথঘাট দিয়ে,
তোমার অম্লকটু কানাগলির মণিমুকুট দিয়ে
আমাকে তুমি ক্ষতবিক্ষত ক'রো না,
তোমার সাংঘাতিক জলাভূমিতে
দৈন্যদশায় পিষে-যাওয়া শিশুটিকে
আমাকে দেখিও না !
তোমাতে আমি বরণ করি দুঃখক্লেশ
আমার দেশবাসীর জন্যে,
আমার সমগ্র মার্কিন পিতৃভূমির জন্যে,
তোমার হাড়গোড় থেকে চেঁছে নেওয়া সেই সব কিছুর জন্যে
যা তোমাকে ঢেকে দেয় গাঁজলায়,
তলিয়ে-যাওয়া এক সব-খোয়ানো দেবী তুমি,
যার লুণ্ঠিত মিষ্টি বুকের ওপর
হিংস্র কুকুরের দল প্রস্রাব করে।

৮

ভাল্‌পারাইজো, তুমি যা কিছু বেষ্টন করো,
এমন কি তোমার শান্ত জলদ মেঘের ওপারেও, হে সমুদ্র-বধূ,
তোমার সমস্ত রশ্মিচ্ছটাকে আমি ভালবাসি।
নৈশ-সমুদ্রের নাবিকের জন্যে
তুমি যে প্রচণ্ড আলো ফেলো আমি তা ভালবাসি,
তখন তুমি দ্যুতিমান, দিগম্বর,
অগ্নিশিখা আর কুহেলিকা, গোলাপের আকার নিয়ে
লেবুর মঞ্জরী।
কাউকে তোমার আত্মরক্ষায় ডেকো না, কিংবা

যা আমার প্রিয় তার দিকে
কাউকে দিও না মারমুখো মুষল হাতে এগোতে ;
তোমার নিহিত যা কিছু তার জন্যে শুধু আমি।
তোমার দুগ্ধধবল হিমঝুরির জন্যে,
যেখানে সাগরের লবণ মাতৃকা তোমাকে চুম্বন করে
সেই জীর্ণ পৈঠাগুলোর জন্যে একা আমি,
আমার সিন্ধুনন্দিত প্রিয়া, ভাল্‌পারাইজো,
তোমার শিখরচূড়ার আবহে উদ্ধত
তোমার হিমশীতল সমুদ্রপরীর কিরীটে ছোঁয়ানো
একা আমারই ওষ্ঠাধর।
পৃথিবীর সমুদ্রোপকূলের রাণী,
জাহাজ আর তরঙ্গমালার চক্রনাভি,
তুমি আমার অভ্যন্তরে চাঁদের মত,
অথবা তরুকুঞ্জের ভেতর দিয়ে নির্গলিত হাওয়ার কুটিলতা।
আমি ভালবাসি তোমার অপরাধপ্রবণ অলিগলি,
পাহাড়ের মাথার ওপর চাঁদের ফলা,
আর তোমার সেইসব বাজারপট্টি
ডাঙার নাবিকেরা যেখানে বসন্তকে নীলরঙে ঢেলে সাজায়।
হে আমার বন্দর, দয়া ক'রে তুমি বোঝো
সু আর কু সম্বন্ধে তোমাকে লেখার
আমার অধিকার আছে,
কেননা আমি এক নির্দয় বাতির মতন
ভাঙা বোতলগুলোকে ভাস্বর করে তুলছি।

৯

আমি ঘুরে বেড়িয়েছি নামী নামী সাগরে,
বরমাল্যের মতন বহুতর দ্বীপে,
সাগরবিহারী কবি আমি,
সফরে সফরে আমি স্পর্শ করেছি
দূরতম ফেনরাশি,

কিন্তু, সর্বময়ী হে সাগরিকা, তুমি ছাড়া
আর কেউই আমার হৃদয়ে নোঙর ফেলে নি।
বিপুল সমুদ্রের
পর্বতাকীর্ণ রাজধানী তুমি,
তোমার সেণ্টরের* আসমানী কোল বরাবর
খেলনার দোকানের
লাল নীল রং বুকে নিয়ে
তোমার উপকণ্ঠগুলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।
বলিষ্ঠতম সাগরের উন্মত্ত ঝড়
হিমবাহী হাওয়ার
সবুজ তুফান
তোমার মিশ্‌মার ভূখণ্ডের যন্ত্রণা,
তোমার নিহিত পাতালের বিভীষিকা,
তোমার উঁচু ক'রে ধরা মশালের গায়ে
সারা সাগরের ফেনপুঞ্জ যদি আছড়ে প'ড়ে
তোমাকে ছায়াবৃত পাহাড়ের পরিমাপ,
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে
ঝড়ঝঞ্ঝায় তৈরি মঠমন্দিরের গড়ন না দিত,
তাহলে তোমার ছোটখাটো ঘরবাড়ি আর
একপ্রস্থ চাদরে চাপানো ইস্ত্রির মতন
রণতরী লাতোরে সুদ্ধ
তোমাকে স্বচ্ছন্দে একটি নৌ-বোতলে ভরে দেওয়া যেত।
আমি তোমাকে আমার ভালবাসা জানাতে চাই, ভাল্‌পারইজো,
পরে আবার আমাদের দুজনেরই বন্ধন ঘুচলে
তোমার সন্ধিস্থলে আমি ফিরে আসব থাকতে।
তুমি থাকবে তোমার হাওয়া আর ঢেউয়ের সিংহাসনে,
আমি আমার আর্দ্র, অন্তর্দর্শনের মাটিতে।
সমুদ্র আর হিমরেখার মাঝখানে
আমরা দেখব স্বাধীনতার উত্তরণ।

* মানুষের উত্তমাঙ্গের সঙ্গে ঘোড়ার অধমাঙ্গ যুক্ত গ্রীক পুরাবর্ণিত দানব

ভাল্‌পারাইজো, হে রাজেন্দ্রাণী।
একচ্ছত্র দখিনা সাগরের
নিভৃত নির্জনতায় তুমি একা।
তোমার প্রত্যেকটি হল্‌দে খাড়াই
আমি ঠাহর করে দেখেছি,
আমি অনুভব করেছি মুষলধারে তোমার নাড়ির স্পন্দন,
রাত্তিরে যখন আমার মন কেমন করছিল
তখন ডকমজুরের হাত দিয়ে
আমাকে তুমি বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলে,
তোমার আমলের ফুলঝুরিতে
ছড়ানো ছিটানো নীল আগুনের জেল্লায়
তখ্‌তে বসা তোমাকে আমার মনে পড়ছে।
জলের রাণী, হে দক্ষিণী আল্‌বাকুরা,*
বেলাভূমিতে তোমার মত আর কেউ নেই।

১০

এমনি ক'রে রাতের পর রাত
সমুদ্রোপকূলশায়ী সমগ্র চিলিকে ছায়াচ্ছন্ন করা
সেই অন্ধকার প্রহরে,
দুয়োরে দুয়োরে গিয়েছি আমি
এক পলাতক।
আমাদের দেশের প্রতিটি খানাখন্দে
অন্যসব মাথা-নত-করা বাড়ি, অন্য সব হাতে থেকেছে
আমার পদশব্দের অপেক্ষায়।
হাজার বার
তুমি ঐ আঙিনা দিয়ে গেছ, ঘুণাক্ষরে একটি কথাও
তোমাকে বলে নি, রং-না-করা ঐ দেয়াল,
গলায় শুকনো ফুলের মালা দেওয়া ঐসব জানলা।
আমারই জন্যে ছিল এই রহস্য;

---

* ম্যাকারেল জাতের এক রকমের বড় সামুদ্রিক মাছ।

আমারই অপেক্ষায় প্রাণচঞ্চল ;
সে ছিল আত্মবলিদানে ভরা
কয়লা-খনির অঞ্চলে ;
ছিল কুমেরুর দ্বীপবহুল সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ
উপকূলভাগের বন্দরে বন্দরে ;
শোনো : হয়ত সে ছিল
কোলাহলময় রাস্তা বরাবর,
রাস্তার আওয়াজের দ্বিপ্রাহরিক সঙ্গীতের মাঝখানে,
কিংবা অন্যান্য জানলার সঙ্গে কোনো প্রভেদ না থাকা
পার্কের ঠিক পাশের সেই জানলায়,
টেবিলের ওপর ছাঁকা এক বাটি স্থরুয়া
আর মনপ্রাণ ঢেলে
সে কিন্তু থেকেছে আমারই অপেক্ষায়।
সব ঘরদুয়োরই ছিল আমার,
সবাই বলেছে : 'উনি আমার ভাই,
ওঁকে নিয়ে এসো এই দীনের কুটিরে'
আমার দেশ যখন
এক বিকট যাঁতাকলের মত,
যখন অসম্ভব দমনপীড়নে কলঙ্ককলুষিত।
এসেছিল ক্ষুদে টিনমিস্ত্রি,
কমবয়সী মেয়েগুলোর মা,
অলবড্যে খেতাল,
সাবানের কারিগর, সভ্য-ভব্য
মেয়ে ঔপন্যাসিক, আপিসের মাছি-মারা
কনিষ্ঠ কেরানি, ওরা সবাই এসেছিল,
আর ওদের দরজায় দরজায় আঁটা থাকত
এক গোপন সংকেত, যেন দুর্ভেদ্য দুর্গের মত
পাহারায় থাকত একটা চাবি,
যাতে রাত্রে, দিনে বা অপরাহ্নে
আমি সহসা ঢুকে যেতে পারি

এবং অচেনা হলেও যে কাউকে বলতে পারি :
"ভাই তুমি জানো আমি কে,
বোধহয় তুমি আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলে।"

১১

হাওয়ার বিরুদ্ধে, বেইমান, কী তুমি করতে পারো ?
বেইমান, কী তুমি করতে পারো সেই সব কিছুর বিরুদ্ধে
যা মুকুলিত হয় আর শ্রীমন্ত হয়,
যা সুস্থির আর সজাগ,
যা আমার দিকে হাত বাড়ায়
আর তোমাকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে ?
বেইমান, যাদের তুমি ছলনা দিয়ে কিনেছ
তাদের দিকে তোমাকে অনবরত ছুঁড়ে দিতে হবে চাঁদির টুকরো।
বেচবার পর কেউ অনুতপ্ত হওয়ার আগেই,
বেইমান, তাকে তোমাকে কয়েদ, নির্বাসন আব যন্ত্রনা দিতে হবে
আর শোধ তুলতে হবে তড়িঘড়ি ;
কিন্তু ঘুষ-খাওয়া রাইফেলের চক্রব্যূহে
তোমার পক্ষে ঘুমুনোই দায়,
সেখানে আমি থাকি আমার জননী-জন্মভূমির কোলে
রাতনিশীথের এক পলক !
কী শোচনীয় তোমার ক্ষণভঙ্গুর আর
পতনোন্মুখ বিজয় !
যেখানে আমার পাশে আরাগঁ, এরেনবুর্গ,
এলুয়ার, পারীর কবিরা,
ভেনেজুয়েলার বীর লেখকেরা,
এবং আরও সব অনেকে ;
বেইমান, তোমার চারপাশে শুধু।
এস্‌কানিলা, কেভাস, পেলুশোনা আর পব্‌লেতে !*
আমার দেশের মানুষ মই তুলেছে উঁচুতে,

---

* ভিদেলার শাগরেদ

আমার দেশের মানুষ লুকিয়ে রেখেছে মাটির নীচে গুপ্তঘর,
আমার জননী-জন্মভূমির কোলে উঠে আর তার ডানায় ভর দিয়ে
আমি ঘুমোই, স্বপ্ন দেখি আর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই তোমার সীমান্ত।

১২

নীরব রাত-প্রাণীরা, যারা ছায়ার মধ্যে
আমার হাত ধরেছিলে,
তোমাকে, তোমাদের সবাইকে ;
অমর আলোর বাতিদান, নক্ষত্রের নক্সীকাঁথা,
প্রাণধারণের রুটি, আমার গোপন ভাইরা,
সবাইকে তোমাদের, সবাইকে আমি বলি :
শুধু কৃতজ্ঞতা কেন,
এমন কিছুই নেই যা ভ'রে দিতে পারে
তোমাদের শুদ্ধতার পানপাত্রগুলো,
কিংবা যা পারে তোমাদের নিরুদ্বিগ্ন মর্যাদার মতন
অপরাজেয় বসন্তের ধ্বজায়
সূর্যকে ফুটিয়ে তুলতে।
আমি শুধু ধ'রে নিতে পারি
হয়ত আমার স্বোপার্জিত
এই সহজ সরলতা, এক অপাপবিদ্ধ ফুল,
হয়ত তোমরা আর আমি অভিন্ন, একেবারে এক,
মাটি, ময়দা আর গানের সেই কণা,
সেই স্বাভাবিক তাল, যে জানে
কোথা থেকে সে এসেছে,
কোথায় তার স্থান।
আমি তেমন দূরের ঘণ্টাধ্বনি নই,
কিংবা নই তেমন গভীরে প্রোথিত সূর্যকান্তমণি
যে, তুমি আমার পাঠোদ্ধার করতে পারবে না,
আমি নিছক দেশের মানুষ, গুপ্ত গৃহদ্বার,
কালো রুটি, আর তুমি যখন আমাকে স্বাগত জানাও

আমি জনসাধারণ, অগণন জনসাধারণ,
স্তব্ধতাকে পাড়ি দেওয়ার আর
অন্ধকারে অঙ্কুর জাগানোর
সুস্পষ্ট ক্ষমতা ধরে আমার কণ্ঠস্বর।
মৃত্যু, দুর্ভোগ, ছায়া, বরফ
অতর্কিতে বীজের ওপর নেমে আসে।
আর লোকে যেন মাটিচাপা পড়ে।
শস্য তবু পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে।
তার লাল অপ্রশস্য হাত
সে চালিয়ে দেয় স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে।
মৃত্যু থেকে এসে যায় আমাদের পুনর্জীবন॥

জল সইতে

শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়কে

বোবা কোকিল

কথা চাপিয়ে
        কথার পৃষ্ঠে
            কাটছিল দিন
                কষ্টেসৃষ্টে

এখন যে কী মুশকিল !

হয়ত কেউ
        পঞ্চাশোর্ধ্বে
            ঠাট্টা ক'রে
                খাঁচার মধ্যে

বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে এক কোকিল।

ভালো ছিলাম
        ভুলে ছিলাম
            মনে পড়ে না
                কার যে কী নাম

সে-কোন্ পাহাড় ? সে-কোন্ নদী ?

খুলে বুকের
        সমস্ত খিল
            খাঁচায় বন্ধ
                বোবা কোকিল

হঠাৎ ডেকে ওঠে যদি...

হটাবাহার

দেখ, কলকাতা ?

দেখ, বিনয়-বাদল-দীনেশ !

চোখের জল মুছতে মুছতে...

তোমাদের সব্বাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, দেখ—

ঠ্যালাগাড়িতে চ্যাংদোলা ক'রে তোলা,

দড়িদড়ায় বাঁধা

এই শহর থেকে হটাবাহার

একসার

উঠবন্দী সংসার...

পায়া-ভাঙা নড়বড়ে তক্তাপোশের কোলে, দেখ—

ডালার ওপর গোলাপের গায়ে 'সুখে থাকো' লেখা

কব্‌জাহীন রং-চটা মরচে-পড়া কবেকার এক

বিয়েয়-পাওয়া টিনের তোড়ং

লালখেরোয় বাঁধানো

পোকায় কাটা

তিনপুরুষে জমানো পুরনো পাঁজি

মাটির কাঁধ-ভাঙা তোলা-উনুনের পাশে কয়লা-মাখা তালপাতার

ছেঁড়া হাতপাখা

শিয়রে প্রিয়জন, ফুলের তোড়া

চোখে তুলসীপাতা
বুকে গীতা নিয়ে
শ্মশানের ফস্‌-করা আলোয় তোলা
হল্‌দে হয়ে যাওয়া
মা বাবার জীবনের একমাত্র ফটো
আর তেল-সিঁদুরে তোলা গুরুদেবের পায়ের ছাপ

ছেঁড়া নামাবলীতে জড়ানো লক্ষ্মীর পাঁচালী
অষ্টোত্তর শতনাম
আর মলাট-খসা রেডবুক

ছানি-কাটা চোখের পুরু কাঁচের খাপছাড়া চশমা
ঝাঁকানি খেয়ে তার গায়ে এসে পড়া
লোহার কাজল-লতা
আর হামানদিস্তার ঠুংঠাং
ঠুংঠাং

আরশোলা-ভর্তি লালবাজারে তৈরি রীড-খসা বেলো-খোলা
হারমোনিয়ামের ওপর
কাঁচের ফ্রেমে-বাঁধানো রামকৃষ্ণ পরমহংস,
ঘোড়ায় চড়া নেতাজী,
গালে হাত দেওয়া সুকান্ত
আর মাছের আঁশ জোড়া দেওয়া রাজহাঁস

ন্যাকড়ায় জড়ানো আঁশবঁটির পাশে শিলনোড়া
চটের ওপর লালনীল সুতোয় ফুলতোলা আসনের ওপর
সাদা শাঁখ আর শ্বেতপাথরের খলনুড়ি

টিয়াপাখির শূন্য জং-ধরা খাঁচার পাশে
মরা তুলসীর টবে,

লোহার ফুটো বালতির মধ্যে
পুরনো শিশিবোতলের ভিড়ে

মুখ-লুকোনো ভীরু কবিতার খাতায়
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শ্বাস ফেলছে
হাওয়া...

কেননা ঘুড়িগুলোকে হটিয়ে দিয়ে
আকাশে মাথা তুলছে ভুঁইফোঁড় উঁচু উঁচু বাড়ি

ফুটপাথগুলোকে কোণঠাসা ক'রে
দুনিয়ার পায়ে দেশ বাঁধা দিয়ে
দুপাশে হাতপা ছড়াচ্ছে গাড়ির রাস্তা

মা-বাবাকে দূরে হটাচ্ছে মামিড্যাডি

দেয়ালে আশার বাণীগুলো মুছে
ফটকে নিয়নের আলোয় লেখা হচ্ছে
'শুভ লাভ' ॥

তো

রাস্তাগুলো খোঁড়া হ'চ্ছে
রাস্তাগুলো খোঁড়া করছে
কারণ, রাস্তা বড় হ'চ্ছে
হবেই তো—

কতদিন আর থাকবে বাচ্চা ?

চাকায় হাড় মড়মড়িয়ে

গাড়ি যাবে গড়গড়িয়ে
তবেই তো।

তালি বাজান,
ও মেরি জান—
বহুৎ আচ্ছা।
বহুৎ আচ্ছা।

উঁচু উঁচু পেল্লায় বাড়ি
আহা-হা তা
উঠবেই তো!
আমাদেরও ওঠার পালা
এল এবার ;
যা করবার
তাড়াতাড়ি।
তাড়াতাড়ি!

যার নেই চাল, যার নেই চুলো
তাদের চোখে
বাড়িগুলো
তা একটু ফুটবেই তো!
আসল কথা, চাই প্রতিভা—
পরের কষ্টে যাদের রেস্ত

তারাই লাভ করে কেষ্ট।
আহা, কেষ্টর জীব
করলই বা!

যত সুবিধে, ভাড়াও তত
লাফিয়ে লাফিয়ে
বাড়বেই তো!

দিন দিন যা
ট্যাক্সোর বহর
মশাইয়ের নাড়ি
ছাড়বেই তো।

তার চেয়ে, আমি বলছিলাম কী,
(বক্তা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী)

ক'রে হাঁটি-হাঁটি পা-পা
যান চ'লে
এইবেলা ধাপা।
দিনের আলোয়
ভালোয় ভালোয়
ছাড়ুন শহর।

গুছিয়ে গাছিয়ে যাদের থাকার
থাকবেই তো।
যারা ওঠে ফেঁপে ফুলে
মধু লোটে ফুলে ফুলে
তারাই আজ উড়ে উড়ে
এসে বসছে শহর জুড়ে।

নিচের লোককে পাতালে ফেলে, হাঁ জী
রাখবেই তো।
তৈরি হচ্ছে ফুর্তির ফোয়ারা
নদীর ধারে,
পার্কে পার্কে।

চোপ্‌, বাঙালী, হেঁজিপাজী,
তোরা সব কলকাতার কে?

'বোনটি

বাপ গিয়েছে স্বর্গে ;
দাদার লাশ
মর্গে।
ভালো চাস তো, যা এইবেলা
ধর গে
ঐ অমুককে—

কী ক'রে যাই,
আজ্ঞা।
ওঁরই ক্ষেতে বর্গা।
ধরনা দেবার একটাই জায়গা
বড় পীরের দর্গা।

ইস্কুলের মাঠে সারি সারি
গোঁ গোঁ করে
কালো গাড়ি।
ঐ অমুকের বাড়ি থেকে যায়
বড় বড় চাঙারি।

ব'লে লাভ নেই
মোড়লকে।
বোবা-কালা হ'লে মেলে
উঁচুমহলে কল্কে।
আসলে বোন, দেখ্ কার ধন
ক'রে রেখেছে দখল কে ?

কিড়িং কিড়িং
সাইকেলের ঘণ্টি ;

পিঠে বন্দুক, গলায় কণ্ঠী।
ঝোপের মধ্যে জল্‌দি জল্‌দি
গা ঢাকা দে, বোনটি।
আমার আছে লঙ্কার গুঁড়ো
তোর রয়েছে সড়্‌কি।
আমাদের ভয়ডর কী?

জীবনে প্রথম

রামপুরহাট লোকালে
চলেছি
বিকেলে

সামনে আকাশ মোড়ানো
রোদের
নিকেলে

সঙ্গে ক'জন
হাঁটুর বয়সী
জাপানী

আদার গন্ধে
জল আনে জিভে
চা-পানি

স্টেশনে ট্রেন।
ছিন্নভিন্ন
বাংলা

বনবাসে যায়।
দ্রুত ফেলে দিই
জানলা

ডেকে ডেকে কাছে বসাই।
কথায়
ভোলাই

হাতে ঢেলে দিই
জমানো যা ছিল
ঝোলায়

ঘুরে যায় ট্রেন
যেদিক দেখায়
কম্পাস

খুলেছি জানলা।
আঁধারে গা ঢেকে
বনপাশ

হারুমি হঠাৎ
লাফিয়ে উঠল।
ও নাকি—

নিশ্ছিদ্র এ আঁধারে দেখেছে
জীবনে প্রথম
জোনাকি॥

ব'সে আছি

বড়্‌শিটা সইবহরে ফেলে
হাত-টাত ধুয়ে
বসে আছি

ডোবালেই টানব।

হাজারটা চোখ লাগিয়ে রেখেছি
ফাৎনায়—

তারা যে যার বাটখারায়
অধরা মাছটার
ওজন নিচ্ছে।

কোথাও বুড়বুড়ি কাটছে

কোথাও ঘাই দিচ্ছে

ছোট
　　বা বড়—

সব অস্তিত্বই যেভাবে জানান দেয়

মানুষের চোখগুলোর দিকে
আমি
ঠায় চেয়ে রয়েছি

চোখগুলোর ভেতরেই
আমি দেখতে পাচ্ছি

জল।

ফাৎনাটা সেখানে
ডুবলে
সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেয়ে যাব।

তাই আমি
হাত-টাত ধুয়ে—

গ্যাঁট হয়ে ব'সে আছি

ফাৎনাটা ডুবলেই
টানব॥

হাওয়া

পরে এসে
আগে চলে যাওয়া

এখন
উঠেছে কী যে হাওয়া

টিকি বাঁধা রয়েছে
পুরাণে

জন্মসূত্রে
কাজ করি ফুরানে

সন্ধ্যে হোক
কচ্‌লে হাত ধোবো

তারপর, আঃ
লম্বা হয়ে শোবো

অমনি শিয়রে
বসবে কাজী

থুথু দিয়ে
বলবে, মর্ পাজী

এখন উঠেছে তাই
হাওয়া

পরে এসে
আগে চলে যাওয়া ॥

শেষ বাজি

লোকটাকে আমি শেষবার দেখি
লেক-মার্কেটের সামনে।

বিশ্বদুনিয়াকে যেন ট্যাঁকে পুরে ফেলেছে—

এমনি একটা ভাব ক'রে
সে
লটারির টিকিট কিনছিল।

অথচ একটু আগে

খাবে ব'লে
আমার কাছ থেকেই

টাকাটা
সে চেয়ে এনেছিল।

একবার ভাবলাম
ওর হাত মুচ্‌ড়ে

টাকাটা

কেড়ে নিয়ে আসি।

কিন্তু ওর মাথা উঁচু ক'রে সদর্পে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে
আমি কেমন যেন
চুপ্‌সে গেলাম।

সেইসঙ্গে মনে হল

আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখাই যাক

লোকটা
এরপর কী করে।

আমার দিকে যখন সে ফিরল

তার
চোখমুখের চেহারাই আলাদা।

পাশেই দামী দামী সব জিনিসের দোকান,
শো-কেসের সামনে গিয়ে
সে দাঁড়াল।

তাকে দেখে মনে হচ্ছিল
ইচ্ছে করলে
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সে কিনে নিতে পারে।

তারপর গটগট ক'রে সে যখন রাস্তা পার হচ্ছিল

মাঝখানে ট্রাম এসে পড়ায়
আমার দৃষ্টিপথ থেকে
হঠাৎ সে হারিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে ঠিকই করেছিলাম
এরপর যখন সে আসবে
তার মুখের ওপর আমি দরজা বন্ধ ক'রে দেব।

লোকটা আসে নি॥

তুঘলক লেনে

বাড়ি করেছি রাজধানীতে।
সুরকি-চুনে
হৃদয় গাঁথা।
ধরানো রং
বুকের খুনে।

পায়ের নিচে জমি পেয়েছে
ভবিষ্যৎ।
সামনে আশা,
বলিষ্ঠ হাত
টানছে রথ।

অন্ধকারে জ্বলছে আলো
নিদ্রাহারা।
ফটক খুলে
পাহারা দেয়
ফুলের চারা।

বাড়ি করেছি।
নীল আকাশে তুলেছি ছাদ।
লাল নিশানে
ধরছি সূর্য
ধরছি চাঁদ॥

আগুন লাগলে

শেষ কিভাবে হবে
এই নিয়ে আমার তখন দারুণ কৌতূহল

পিঁপড়ের মতন
সার দিয়ে
অক্ষরগুলো মুখ বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে

আমাকে নিয়ে চলেছে

গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
এমন এক
জায়গায়

যেখানে
আসল যে খুনী
সে ঠিক ধরা প'ড়ে যাবে।

আমার সমস্ত চেতনা জুড়ে
যখন
টান-টান হয়ে আছে

একটা কী-হয় কী-হয় ভাব—

তখন
যেন একটু নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে
জলের তলা থেকে
হাঁকুপাঁকু ক'রে ভেসে উঠল—

মাথার ওপর
চলতে চলতে হঠাৎ-থেমে-যাওয়া
পাখা।

আর
জানলা দিয়ে ঘরের মেঝেয় লাফিয়ে-পড়া
রোদ্দুরে

দেয়ালে চম্‌কে উঠল
সেই কবেকার হল্‌দে-হ'য়ে-যাওয়া
ফটো।

আর ঠিক সেই সময়
আমার নাকের ডগাদুটো একটু ফুলে উঠল—

কিসের একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ

হাওয়ায়
কিসের যেন একটা হল্কা।

আমি লাফ দিয়ে উঠে প'ড়ে চেঁচালাম : আগুন
দৌড়ে এসো,
আগুন!

মনে প'ড়ে গেল, বাড়িতে আমি একা।
চাবির ঘরে
অঘোরে ঘুমোচ্ছে আমার নাতনী।

আর কেউ আসার আগে
একাই একশো হয়ে
আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি সেই আগুনে॥

খালি হাত

ঝিঁঝিঁ ধ'রে
পা দুটো অসাড় হয়ে আছে ;
কেউ ডাকলে

উঠে দরজা খুলতে আমার একটু সময় লাগবে।

কথা দিয়ে
কথা না রাখার কী জ্বালা
আমি হাড়ে হাড়ে জানি।

আমাকে কে কী মনে করাবে ?

আঙুলগুলো মুঠো ক'রে রেখেছি
খিল ধরার ভয়ে।

প্রতিশ্রুত কয়েকটা রেখা ছাড়া
এখন আমার হাতে,
সত্যি বলতে,
আর কিছুই নেই॥

ছেলেধরা

আমাদের পাড়ায় সেদিন হৈ-হৈ কাণ্ড, রৈ-রৈ ব্যাপার।
হঠাৎ শোরগোল উঠল : 'ছেলেধরা!' 'ছেলেধরা!' শুনেই
তো আমরা লাঠিসোঁটা নিয়ে, আস্তিনের হাত গুটিয়ে,
হুড়মুড় ক'রে সব বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

লাফ দিয়ে আলিপুরের ট্রামে ওঠার আগে কালোকোট-পরা
এক বিলক্ষণ ভদ্দরলোক, চোখের চশমা ঠেলে
কপালে তুলে, বললেন, 'বিশ্বাস না হয়, এই দেখুন
কাগজে লিখেছে!'

কাগজটা ছোঁ মেরে নিয়ে আমরা কিছু গোলা লোক তখন,
ঠোঁটে জিভ ভিজিয়ে ভিজিয়ে, বানান ক'রে ক'রে সেটা
পড়লাম। হ্যাঁ, ঠিক। একদম ঠিক। ছাপার অক্ষরে,
এই দ্যাখ্, দেখছিস না—পরিষ্কার লিখে দিয়েছে…

লিখেছে? লিখে দিয়েছে? তবে আর যায় কোথায়! আমরা
তদ্দণ্ডে পড়লাম রে রে ক'রে। চুলের মুঠি ধরতেই
হাতের মুঠোয় উঠে এল শণনুড়ির মত মাথার জট।

আর আলখাল্লার নিচে থেকে বেরিয়ে এল ছেলেধরার
সেই ঝুলি।

হা সব্বোনাশ! তার ভেতর থেকে কী পাওয়া গেল, জানেন?
না দেখলে পেত্যয় হবে না আপনাদের। পাওয়া
গেল একটা মড়ার মাথার খুলি, বাচ্চাদের পায়ের
দু পাটি জুতো, কোমরে বাঁধার ঘুন্‌সি, রবারের বল,
মহিলাঘটিত দু-একটা টুকিটাকি, আর কী জানেন?
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা বর্ণপরিচয়।

ন্যাড়া লোকটাকে পিটিয়ে মারার পর সরেজমিন নিরপেক্ষ
তদন্তে যা জানা গেল তা এই—

ছেলেধরা না হলেও, লোকটা ছিল অতিশয় ঠক। সাধু সেজে
ভড়ং ক'রে বেড়ালে কি হবে, তার ছিল এক মেয়ে-
মানুষ। একটি ছেলেও ছিল তার ঔরসের। কিন্তু হাটে
হাঁড়ি ভাঙার ভয়ে গুখেকোর ব্যাটা প'ড়ে প'ড়ে মার
খেয়েছে, তথাপি ঘুণাক্ষরে কিছু ভাঙে নি।

আমরা যারা সেদিন চুটিয়ে হাতের সুখ করেছিলাম, সেই
কয়েকজন মস্তান বাদে, আর সকলের কাছেই,
বুঝতে ভুল হওয়ায়, ব্যাপারটা হয়েছিল সাতিশয়
দুঃখের। তাছাড়া একটু ভয়েরও—

কেননা, যারা কালি মাখিয়ে মাখিয়ে লোকের
মগজে দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ কাগজ পুরে দেয়, তারা তো,
কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, আর যাই হোক সব
ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়!

দাঁড়াও পথিকবর

পিঠ পেতে আছে
দেয়াল
হাত পেতে আছে
ভিখিরি—

কে ঘোচাবে বলো
এ হাল ?
দেখা নেই কারো
টিকিরই !

র'সো বাপু, ছানা
পোনারা !
কালবেলা দাও
কাটতে

দাঁড়াবার আগে
ওনারা
শিখছেন সবে
হাঁটতে—

দেখো, ঠিক বুলি
ফুটবে
বেরোলে মাথার
পোকাটা ।

কেউ সুতো ছেড়ে
লুটবে
অন্যেরা হ'লে
ভোঁ-কাঁটা ॥

এক ঢিলে

মাটিতে পড়ে না
পা ব'লে—

গদি থেকে গোদ
তাহলে ?

এগোনো যায় না
দু-পা কি

মেরে এক ঢিলে
দু পাখি ?

বত্রিশ সিংহাসন

আগে ছিল মাটির তলায়,
সে একরকম ভালো ;
এখন ভাসছে চোখের ওপর—
বড্ডই জ্বালালো !

বত্রিশটা বছর গেছে
তাকাতে তাকাতে—
কখনও ডান কাতে, হরি হে,
কখনও বাঁ-কাতে।

এই কারণে ভোজ রাজার
মনটা করে হু হু—

বসতে গেলেই সিংহনাদে
আওয়াজ যে হয়, 'উঁহুঁ'।

খাড়া পায়ে বত্রিশ পুতুল
গলাগুলো কী ভয়ানক!
খিঁচিয়ে দাঁত বত্রিশ পাটি,
বার করেছে ধারালো নখ।

বত্রিশ পুতুলের
একটাই গোঁ—
বসুক এসে
রাখালের পো॥

এজেন্ট আবশ্যক

আপনি দাঁড়াবেন? আপনি দাঁড়াতে চান?
আপনি দাঁড়াতে পারেন?

তাহলে চোখ বুঁজে এখুনি কিনে নিন
একজোড়া
পদ্মলোচন চশমা।

এ চশমা পরামাত্র
সমস্ত চক্ষুলজ্জা
দূর হ'য়ে যায়।

দলীয় বা নির্দল, যাই হোন,
মনের খুঁতখুঁতুনি কাটিয়ে দিয়ে

এই পদ্মলোচন চশমা

আপনাকে শতদলে

বিকশিত করবে।

এ চশমা চোখে থাকলে

আগে বা পরে,

দিনের আলোয় বা রাতের অন্ধকারে,

সামনাসামনি বা পিছন ফিরে

যেকোনো সময়ে

স্বচ্ছন্দে দল বদল করতে পারবেন।

কিংবা হেসেখেলে

যে কোনো ভারী দলে ভিড়ে যেতে পারবেন।

জগৎশ্রেষ্ঠ এক এবং অদ্বিতীয়

সোহং লেন্সের গুণে

এতে সর্বত্র এবং সর্বদাই শুধু নিজেকে দেখবেন।

ফলে, কামাবার সময়

আদর্শের বা

আরশির দরকার হবে না।

একাত্মপীঠে একান্তে

বত্রিশ বছরের নিগূঢ় সাধনায়

জনৈক বাক্‌সিদ্ধ গণতন্ত্রাচার্যের

সদ্য-আবিষ্কৃত

স্বপ্নলব্ধ

পদ্মলোচন চশমার জন্য

ভারতের সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।

এখনই আবেদন করুন॥

বিফলে মূল্য ফেরত

পার্সেলে
বাড়িতে ব'সে পাবেন

বিংশ শতাব্দীর
শেষতম বিস্ময়—

বেদম হাতঘড়ি।

ভদ্রলোকের এককথার মতই
এর সময়ের
কোনো নড়চড় হয় না।

এ ঘড়ি হাতে দিলে
সমস্তক্ষণ
সময় আপনার মুঠোয়
চিরদিন
আপনারই মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকবে।

আপিসে লেট হবে না,
যখন খুশি
আসা
এবং যাওয়া যাবে।

যেমন চলছে
দিব্যি চালিয়ে যেতে পারবেন
তেল না দিয়ে
এবং বিনা দমে।

মেরামতি বা সারাইয়ের
খরচ নেই।

এর বাড়তি সুবিধে—
যখন তখন
যে কারো চোখের ওপর
বারোটা বাজিয়ে দিতে পারবেন।

অতএব, মহাশয়—
মিছিমিছি সময়ের পেছনে না ছুটে,
বরং
আপনিই সময়কে জোড়হস্তে
পেছনে দাঁড় করিয়ে রাখুন।

আইন্‌সাইন্‌জীর বিখ্যাত
অপেক্ষার তত্ত্ব অনুযায়ী
সর্বাধুনিক যন্ত্রে প্রস্তুত (হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে)

বেদম হাতঘড়ি

ব্যবহারে হাতে হাতে ফল ;
বিফলে মূল্য ফেরত।
সরকারী অর্ডার অগ্রগণ্য।
রেলমন্ত্রকের জন্যে বিশেষ কমিশন।

লিখুন :
জলন্ধর ৪২০৪২০

সুলভে গৃহশিক্ষক

পরীক্ষার আগে
খুব সুবিধাজনক শর্তে
ভাড়া পাওয়া যায়

মুখস্থবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকধারীদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে
বিশেষ তালিমপ্রাপ্ত

টিয়া ময়না কাকাতুয়া

অভিভাবকেরা বাড়ি নিয়ে গেলে

ছেলেমেয়েদের হাতে হারিকেন ধরানো,
বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখা,
ফেরারী ডিউপার্টস্বদ্ধ, নোট বই কিনে দেওয়া—
এসবের আর কোনো ঝামেলা থাকে না

হালফ্যাশানের ট্র্যানজিস্টরের মত
শুয়ে,
ব'সে
হাঁটতে হাঁটতে,
এমন কি ঘুমোতে ঘুমোতেও

এর সুদৃশ্য
প্ল্যাস্টিকের তৈরি খাঁচাটি
কানের কাছে ঝুলিয়ে রাখলেই

অব্যর্থ কাজ হবে

গ্রামে কেরোসিন
আর শহরে ইলেকট্রিক

দুইয়েরই পাশ কাটিয়ে
ছেলেমেয়েদের
পরীক্ষাপাশ গ্যারাণ্টি করুন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : একমাত্র পরীক্ষার হলে ছাড়া
আর সর্বত্র
বিনা অনুমতিতে
সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে ॥

রক্ষাকবচ

ওঁ হ্রীং ফটাস।
দেখি কে কাকে হটাস ॥

যেমন গুরু তেমনি চেলা।
এ মারে বাণ তো ও মারে ঢেলা ॥

ধর্ম্মপুত্তুর দারোগা।
বাগে পেলে বারো ঘা ॥

লাখ হচ্ছে বেলাক।
ঢাক রে বাপু ঝাঁপি ঢাক ॥

এতল বেতল শেতল।
যা উড়ে আমাপেতল ॥

হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা।
ওটা তো আবাগীর ব্যাটা॥

নিচের লোক থাক নিচে।
পিছের লোক থাক পিছে॥

কার আজ্ঞা।
ঝেঁটু সিংয়ের আজ্ঞা॥

কার আজ্ঞা।
জগু বাবুর আজ্ঞা॥

কার আজ্ঞা।
মা-ঠাকরুনের আজ্ঞা॥

আমার এই ফুলপড়া যে লঙ্ঘে
সে যেন যায় ঐ ওয়াঁদের সঙ্গে॥

ওঁ হ্রীং ফটাস।
কার খেলা কে চটাস॥

চিৎ

বুড়োর কানের কাছে এনে মুখ
বললাম হেঁকে,
'ওহে, বেলা গেল।'
বুড়ো হেসে বলে, 'ওরে উজবুক,
তবে তো এখনই
কনে-দেখা-আলো।'

বললাম, 'বুড়ো, বেঁচে করবে কি ?
চোখেও দেখ না,
কানেও শোনো না।'
বুড়ো হেসে বলে,
'আর সব মেকি
জীবনের সোনা আসলে রসনা।'

ডানা-কাটা এক পরী এল ঘরে
ভরল পাত্র
মদ ও মাংসে।
বুড়োকে ডাকতে গিয়ে
চাপা স্বরে
দেখি চোখ তুলে চিৎপটাং সে॥

রবার্ত রোজদেস্তভেনস্কি-র তিনটি কবিতা

এইটুকু

নিষ্করুণভাবে ছোট্ট
এইটুকু
পৃথিবীতে

বাস করত
এক ছোট্ট এইটুকু মানুষ।

তার ছিল একটা ছোট্ট
এইটুকু
কাজ।

আর খুবই ছোট্ট
এইটুকু
থলি।

মাস গেলে পেত এইটুকু
একটু মাইনে…

কিন্তু একদিন
এক ফুটফুটে সকালে

তার জানলায়
টোকা পড়ল।

তাকে ডেকে নিয়ে গেল একটা ছোট্ট
এইটুকু
যুদ্ধ…

কিংবা
হয়ত সেই রকমই তার মনে হয়ে থাকবে।

তাকে দেওয়া হ'ল একটা ছোট্ট
এইটুকু
কামান

একজোড়া ছোট্ট
এইটুকু
বুট।

মাথায় পরবার একটা ছোট্ট
এইটুকু
টুপি।

গায়ে দেবার একটা ছোট্ট

এইটুকু মাপের

ওভারকোট।···

···আর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল

বিচ্ছিরিভাবে, অন্যায়ভাবে

আক্রমণের রণধ্বনিতে

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে

টলটলে শিশিরের মাথা চাড়িয়ে

জ্বলজ্বল করতে থাকল তার মুখচ্ছবি···

কিন্তু সারা পৃথিবী ঢুঁড়েও

তার জন্যে

এমন পাথর খুঁজে পাওয়া গেল না

যা দিয়ে

জীবনের মত বড়

তার কোনো প্রমাণসই মূর্তি খাড়া করা যায়॥

একজন মানুষের খুব বেশি কিছু চাই না

তার চাই

একজন বন্ধু

আর

একজন শত্রু।

একজন মানুষের চাই

অনেক দূরে যাওয়ার

একটা পায়ে-চলার পথ।

তার চাই

একজন মা

যিনি অনেকদিন বাঁচবেন ;

যাঁর খুব দয়ার শরীর।

একজন মানুষের চাই
সকালবেলার একটা কাগজ,
চাই একটি গ্রহ
পৃথিবী,
মহাশূন্যে যাওয়ার একটি পথ
আর দ্রুতগতির একটা স্বপ্ন।

এ সব এমন বেশি কিছু নয়
বলতে গেলে,
কিছুই নয়।

একজন মানুষের খুব বেশি চাই না।

তার চাই
শুধু একটিমাত্র বর :

কেউ তার প্রতীক্ষায় থাকবে ॥

একটি সংলাপ

তুমি চাও আমার ভালবাসা ?
হ্যাঁ, চাই ॥
গায়ে কিন্তু তার কাদা মাখা !
যেমন তেমনিভাবেই চাই ॥

আমার আখেরে কী হবে বলা হোক।
বেশ ॥
আর আমি জিগ্যেস করতে চাই।
করো ॥
ধরো, আমি কড়া নাড়লাম।
আমি হাত ধ'রে ভেতরে নিয়ে যাব ॥
ধরো, তোমাকে আমি তলব করলাম।
আমি হুজুরে হাজির হব ॥
তাতে যদি বিপদ ঘটে ?
আমি সে বিপদে ঝাঁপ দেব ॥
যদি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করি ?
আমি ক্ষমা ক'রে দেব ॥
তোমাকে তর্জনী তুলে বলব, গান গাও।
আমি গাইব ॥
বলব, কোনো বন্ধু এলে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দাও।
বন্ধ ক'রে দেব ॥
তোমাকে বলব, প্রাণ নাও।
আমি নেব ॥
বলব, প্রাণ দাও।
দেব ॥
যদি তলিয়ে যাই ?
আমি টেনে তুলব ॥
তাতে যদি ব্যথা লাগে ?
সহ্য করব ॥
আর যদি থাকে বাধার দেয়াল ?
ভেঙে ফেলব ॥
যদি থাকে দড়ির ফাঁস ?
কেটে ফেলব ॥
যদি থাকে একশো গিঁঠ ?
তাহলেও ॥

তুমি চাও আমার ভালবাসা ?
হ্যাঁ, তোমার ভালবাসা ॥
তুমি কখনই পাবে না ।
কিন্তু কেন ?

কারণ, যারা ক্রীতদাস
আমি তাদের কখনই ভালবাসি না ॥

নাজিম হিকমত-এর নিজের কবিতা প্রসঙ্গে

আমার নেই ঘোড়া ।
নরম জিনে
বাহারে ফুলকারি
নেইকো পিঠজোড়া ।

আমার নেই
জমি অথবা বাড়ি

পাই না খাজনা
পাই না বাড়িভাড়াও
কানাকড়ি ।
দেখ, একা একেশ্বরী
আছে আমার একমাত্র
টকটকে লাল মধুর পাত্র—

হার মেনে যায় আগুন তার কাছে ।
নিজের বলতে
ঐটুকুই তো আছে ।

যত্ন ক'রে আগ্‌লে রাখি
খেয়ে না ফেলে পশুপাখি,
পোকামাকড়,
রামশ্যাম বা যদু।

জমি বলতে বাড়ি বলতে
আমার শুধু একপাত্র মধু।

দাঁড়াও ভাই, দেখ।
যতক্ষণ থাকছে মধু
অটুট এই পত্রপুটে

আসবে ছুটে
মৌমাছিদের ঝাঁকও।

হবে না বরবাদ
এমন কি বাগদাদ ॥

জল সইতে

১

দেখে যাতে তোমাদের কষ্ট না হয়,
চোখে যাতে ভালো লাগে

তার জন্যে

আমার বুকে-বেঁধানো সমস্ত কাঁটায়
আমি গুঁজে দিয়েছি
একটি ক'রে ফুল—

তোমরা হাসো।

শুনে যাতে তোমাদের দুঃখ না হয়,
কানে যাতে ভালো ঠেকে

তার জন্যে

আমার বুক-ভাসানো সমস্ত কান্নায়
আমি জুড়ে দিয়েছি
একটি ক'রে স্বর—

তোমরা হাসো গো,
আনন্দ করো।

আগুনে তো অনেক পুড়েছি
এবার যাব জল সইতে।

নঙর তুলে ফেলেছি

গাঙ থেকে দরিয়ার দিকে
ফেরানো আছে
আমার গলুইয়ের মুখ।

তোমরা এবার
আমার মনপবনের নাওটাকে
পায়ের ডগা দিয়ে একটু ঠেলে দিলেই—
হৈ হৈ ক'রে পালে বাতাস লাগবে॥

চালের বাতায় গুঁজে রেখে এসেছি
গাজীর পট

শিকের ওপর তোলা রইল
গুপীযন্ত্র

কালের হাত সেখানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে
আমি ফিরে আসব।

সঙ্গে নিয়েছি চালচিঁড়ে
হুঁকোতামাক
আব মাছ ধরার জাল

আপাতক ওতেই চলুক।

ফুলছে ফুঁসছে ঢেউ—

একবার তুলছে মাথায়
একবার ফেলছে পায়ে।
ও মাঝির পো
দরিয়া আর কতদূর?

ঘর-বার সমান রে বন্ধু
আমার ঘর-বার সমান
পায়ের নিচে একটুকু মাটি
পেলাম না তার সন্ধান
আমার সেই পোষা পাখি
আকাশের নীল রঙে আঁকি
যত্নে বুকে ক'রে রাখি
তবু কেন সে করে আনচান
আমার ঘর-বার সমান

দিন আসে রাত আসে এইভাবেই যায়
দিন আসে রাত আসে এইভাবেই যায়

জল সইতে যাই
একবার এ-চরে
একবার ও-চরে।

একটু ক'রে ঘটে ভরি
আর কাপড়ের খুঁটে গেরো দিই।

পিটুলিতে গড়া সুখসোহাগের ছিরিছাঁদে
সব-পেয়েছির নয়
সবাই-পেয়েছির দেশ গো!

মোহানার ঠিক মুখে
বিদ্যুতের বাঘনখে
আশমানে চেরাই হচ্ছে যখন আবলুশ কাঠ
ভয়ে চোখ বন্ধ ক'রে আছে যখন তারার দল

ঠিক তখনই ধেয়ে এল বান—

ও মাঝির পো
ভাটি ছেড়ে নাও কি যায়
উজানে?
তবে তাই সই
দরিয়া থেকে গাঙে ফিরে
এবার পট নাচিয়ে
চৌদুনে
কি রকম চক্কর বাধিয়ে দিই দেখ॥

যাচ্ছি

ও মেঘ
ও হাওয়া
ও রোদ
ও ছায়া

যাচ্ছি

ও ফুলের সাজি
ও নদী, ও মাঝি
বনের জোনাকি
ও নীড়, ও পাখি

যাচ্ছি

ও ছুঁচ
ও সুতো
ও ছিটের জামা
ফিতে-বাঁধা জুতো

যাচ্ছি

ও ছবি
ও পান
মমতা
ও টান

যাচ্ছি

ও চোখের চাওয়া
ও ছাদ, ও সিঁড়ি
ও মাটির দাওয়া
ও কাঠের পিঁড়ি

যাচ্ছি

ও স্মৃতি, ও আশা
ও ঝিঁঝিঁ, ও ঝাউ,
ধোঁয়া ও কুয়াশা
বউনি ও ফাউ

যাচ্ছি

উনুনের মাটি
ও হাঁস, ও ডিম
ও তাপ, ও হিম
ও শীতলপাটি

যাচ্ছি

ও চুনী
পান্না
ও হাসি
কান্না

যাচ্ছি

ও গরু মহিষ
ও ধানের শিষ
জানলাদুয়োর
ও সাঁঝ, ও ভোর

যাচ্ছি

ও জল, ও ঝড়
ও ইঁট পাথর
ও ব্যাং, ও সাপ
পুণ্যি ও পাপ

যাচ্ছি

ও কাজললতা
ও পুরনো কথা
পর্দা, পাপোশ
লড়াই, আপোশ

যাচ্ছি

ও উঁচু, ও নিচু
ও আম, ও লিচু
মুখচুম্বন
বাহুবন্ধন

যাচ্ছি

ও শিলাবৃষ্টি,
ঝাল ও মিষ্টি
যাত্রা তরজা
ভয় ও লজ্জা

যাচ্ছি

ও কাঁচালঙ্কা
ওজন, সংখ্যা
বোমা, বন্দুক
পিছন সুমুখ

যাচ্ছি

ও বাংলাভাষা
ও রবিঠাকুর
নিকট ও দূর
ও ক্ষুৎপিপাসা

যাচ্ছি

শীত বসন্ত
আদি ও
অন্ত

যাচ্ছি

ও দিন
দুপুর
পুণ্যিপুকুর

যাচ্ছি

ও খড়
ও কুটো
সাচ্চা ও ঝুটো

যাচ্ছি

ও লেপ
ও কাঁথা
ও বই, ও খাতা

যাচ্ছি

ও আঁকা, ও লেখা
ও কুহু
ও কেকা

যাচ্ছি

মোহানা
গোমুখী
ও জলচৌকি

যাচ্ছি

চিরুনি, আয়না
ও চিতা,
হায়না

যাচ্ছি

ও গালগল্প
অনেক
অল্প

যাচ্ছি

আষাঢ়
শ্রাবণ
হৃতযৌবন

যাচ্ছি

নাকের নোলক
দুঃখ
ও শোক

যাচ্ছি

ও চীনেবাদাম
পোস্টকার্ড
খাম

যাচ্ছি

ও কাজ, ও ছুটি
ও ভাত
ও রুটি

যাচ্ছি

ও মিল, ছন্দ
খোলা
ও বন্ধ

যাচ্ছি

ও ভালো, ও পাজী
ও পুঁথি
ও পাঁজি

যাচ্ছি

ও কুল, তেঁতুল
ও ঠিক
ও ভুল

যাচ্ছি

ও শুরু, ও শেষ
সমকাল
দেশ

যাচ্ছি

ও মটরশুঁটি
ও হারানো ঘুঁটি

যাচ্ছি

চশমার খাপ
ও পায়ের ছাপ

যাচ্ছি

ও আমের বোল
ও পুজো, ও দোল

যাচ্ছি

ও নামঠিকানা
ও কচুরিপানা

যাচ্ছি

ও ঈদের চাঁদ
সাধআহ্লাদ

যাচ্ছি

ও গাড়ির চাকা
মিছিল, পতাকা

যাচ্ছি

ও পানের খিলি
ভিড়, নিরিবিলি

যাচ্ছি

জল্‌দি, আস্তে
হাতুড়ি, কাস্তে

যাচ্ছি

ও মশা, ও মাছি

যাচ্ছি

ও সর, ও চাঁছি

যাচ্ছি

ও দেহ, ও প্রাণ

যাচ্ছি

ও ধ্যান, ও জ্ঞান

যাচ্ছি

ও আড়ি, ও ভাব

যাচ্ছি

প্রণাম, আদাব

যাচ্ছি

ও ফুল

যাচ্ছি

ও পথ

যাচ্ছি

পুতুল

যাচ্ছি

শপথ

যাচ্ছি

ও ছায়া

যাচ্ছি

ও মায়া

আসছি

ও মিউ···

চইচই-চইচই

কবিতা জমলে তবেই বই হয়।

এবার জমবার আগেই হাতছাড়া করতে হল। তার কারণ, অবিলম্বে কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়ের হাতে পড়ার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

তবে সান্ত্বনা এই যে, এ এমন একটা লোভ যাতে পাপের ভয় নেই।

কবিতার বই বার করায় বিরামবাবুর যা হাতযশ, তাতে লোকে খোশমেজাজে এ বই হাতে নেবে—কবিতগুলোর পক্ষে সেটাই বড় ভরসা।

ছাপার পর কবিতা চলে যায় পরের ঘরে। তবু মায়া জিনিসটা যাবার নয়।

তারপর কে কী বলল সেটা কানে এলে সুখের হলে সুখ, দুঃখের হলে দুঃখ হয়।

কবিতা কী ভাগ্যিস কবিকে চিরকাল ধ'রে বসে থাকে না।

শৈবাল মিত্র বলামাত্র এ বইয়ের জন্যে এঁকে দিয়েছে তার জীবনের প্রথম প্রচ্ছদচিত্র। এটাও মনে রাখার মতো।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে 'নাভানা'র সুখ্যাত প্রকাশক কুনাল কুমার রায়ের তৎপরতা আর প্রুফ-সংশোধনে শ্রীমতী মমতা চাকীর মনোযোগ উল্লেখযোগ্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
২৪।১।৮৩

পুপে তোতা পাপু
আমার আর গীতার
এই তিনকন্যাকে

দেয়ালে লেখার জন্যে

আপিসে কাজ না ক'রে—
মেলে তন্‌খা শহরে ॥

গ্রামের জন্য—
'খাটলে অন্ন' ॥

ডান হাত থামায় ।
বাঁ-হাত কামায় ॥

না যদি বলিস 'হাঁ-জী'—
তুই ব্যাটা মহা পাজী ॥

যখন বিধি স্বয়ং বাম ।
বন্ধ সকল কাজকাম ॥

ছাতের বদলে ছাতা ।
ভাতের বদলে ভাতা ॥

ভোটের আগে কী যে সজ্জন ।
ভোটের পর কী যে গর্জন ॥

এদিকে পাণ্ডা সর্বহারার ।
কুড়োন টাকা বাড়িভাড়ার ॥

সুখটান

বাঁচার গর্বে
মাটিতে তার পা পড়ছিল না ব'লে

গান গাইতে গাইতে
আমরা তাকে সপাটে তুলে দিয়ে এলাম
আগুনের দোরগোড়ায়

লোকটার জানা ছিল কায়কল্পের জাদু
ধুলোকে সোনা করার
ছুঁ-মন্তর

তার ঝুলিতে থাকত
যত রাজ্যের ফেলে-দেওয়া
রকমারি পুরনো জিনিস
যখন হাত ঢুকিয়ে বার করত
কী আশ্চর্য
একেবারে ঝকঝকে নতুন

লোকটা ছিল নিদারুণ রসিক
পাড়-ভাঙা নদীর মতন রাস্তায়
বরবেশে যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল
ফুলশয্যার গাড়িতে
তখনও ঠোঁটের কোণে লাগিয়ে রেখেছিল
জীবনের সুখটান

যাবার সময় আমরা ঢেকে দিয়েছিলাম
তার হাতের শেকল-ভাঙার দাগ
সারা গায়ের হাজারটা কালশিটে

মালায় টান পড়ায়
ঢাকা যায়নি শুধু
ক'দিন আগে মার খাওয়ার
একটা দগ্‌দগে চিহ্ন

সেটা ঢাকবার জন্যে মালা একটা এসেছিল বটে
কিন্তু আগুনের আবার ফুল সয় না ব'লে
সব মালাই তখন খুলে ফেলা হয়েছিল

মালা একটা এসেছিল বটে
কিন্তু
খুব দেরিতে

মালা এসেছিল
কিন্তু
মানুষ আসেনি

মানুষটা নাকি অন্ধকারে কলম ডুবিয়ে
'বাঙালীর ইতিহাস : অন্তিম পর্ব'
লেখায় অসম্ভব ব্যস্ত ছিল ॥

মাঝরাস্তায়

তোমার কাছে
যাব ব'লে বেরিয়েছিলাম

বাইরে পা দিতেই
বুনো শুয়োরের মতন

তেড়ে এসেছিল
দাঁত-বার-করা
ইটপাথর

হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে ব'লে
বিকট হাঁ ক'রে
সামনে ওৎ পেতে বসেছিল
রসাতলে যাওয়ার
গর্ত

হাঁটুর ওপর ছোবল মারার ভয় দেখিয়ে
সমানে ফণা তুলে
সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল
রাজ্যের নোংরা
জল

শ্বাসরোধ-করা ভিড়ে
আমাকে পা-দানি থেকে
একটি ধাক্কায়
ঠেলে ফেলে দিয়েছিল
রাস্তা

পড়ি-মরি ক'রে ছুটে
যখন মোড়টা ঘুরলেই
দোরগোড়ায়
পৌঁছে যাওয়ার কথা

কে যেন আড়াল থেকে
হঠাৎ ফুঁ দিয়ে
শহরের সমস্ত আলো
নিভিয়ে দিল

এখন আমি মাঝরাস্তায় একা
দীর্ঘমেয়াদী অন্ধকারে
বন্দী ॥

অন্ধকার গিলে খাচ্ছে

চলচ্ছক্তিহীন পাখা
মাথার ওপরে
পড়ো-পড়ো !
গরমে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে—
পেঁজানো তুলোর মতো ওড়ে
ছিন্নভিন্ন গান
মূর্তি
ছবি।
কেবল ভ্রূমধ্যে থেকে থেকে
নেচে যায়
সাহারা ও গোবি।
যখনই তাকাই বাইরে
দেখি ফুটপাথে
সময় দাঁড়িয়ে আছে
ভর দিয়ে ক্রাচে।

এদিকে আমার আশপাশে
ঘর জুড়ে অন্ধকার
গিলে খাচ্ছে
সবকিছু গোগ্রাসে—
টেবিল চেয়ার আয়না
বইয়ের আলমারি

জুতোজামা
হালকা আর ভারী
সব ভাবনা—

অন্ধকার গিলে খাচ্ছে, চেয়ে দেখ
আমাদের ভূতভবিষ্যৎ সব
এবং দেশকে ভালোবাসার গৌরব ॥

গুরুভাই

পৃথিবী, মানুষ, এই-অন্ধকার-দূর-করা-আলো
যারা বাসো ভালো
চতুর্দিকে
চোখ রাখো, সবাই—

শুধু তো কম্বোজে নয়,
গঙ্গাজলে
একই মন্ত্র-জপ-করা
পল্-পতের
আছে গুরুভাই

ড্রাগনের মতো
দাঁতে তার বিষ
আর
জিহ্বাগ্রে আগুন

মাথায় সমস্তক্ষণ
খুন শুধু,

শুধুমাত্র খুন,

শুধু খুন

ভূতভবিষ্যৎ মিথ্যে তার কাছে

বই পোড়ায়, ভাঙে সৌধ,

রুদ্ধ করে গান

ক্রমে ক্রমে তার হাতে

নিউট্রন বোমার দায়ভাগ

যোগায় রেগান ॥

এই যে

এই যে এইখানে আছি

আমি আজ্ঞে,

হেঁ হেঁ—

তাড়াতে পারি না মাছি

জোড় ক'রে রয়েছি দুটো হাত।

দিয়ে যাচ্ছি সমানে জানান—

তবু কেউ দাঁড়াচ্ছে না

মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে

গন্তব্যে সটান।

কানে আসছে শুধুমাত্র ঘেউ-ঘেউ কেঁউ-কেঁউ

কোন্ চুলোয় গেল সেই শুভরাত্রি

কোথায় সেসব সুপ্রভাত?

দেখুন কারবার।

চোখ তুলে তো তাকাবে একবার
একটু তো জিগ্যেস করবে :
বসে আছ কে হে?
তা নয়।
আমিই একা ডেকে যাচ্ছি আকারে ইঙ্গিতে
টান পড়িয়ে গলার শিরায়।

ষাঁড়ের মতন তাড়া করে ফিরছে
পেছনে সময়।
সারাক্ষণ ছুটছে লোক।
একেবারে গ্রাহ্য নেই
বয়ে গেছে কারো কোনো কথায় কান দিতে।

রাস্তা দিয়ে যেই যায়
দেখি
আপাদমস্তক
আঠা দিয়ে আঁটা—
যেন বন্ধ খাম।
তার ওপর সমস্তই অন্য নামধাম।

অথবা এমনও হতে পারে
আদতে আমারই সব ভুল।
বড হলে লোকে যাকে ফেলে চলে যায়
আমি যেন
খেলাঘরে পড়ে থাকা
বালখিল্য

সেই এক কাঠের পুতুল॥

অন্ধকারে

আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে,
হাতগুলো ঠুঁটো ক'রে
তার চলে যাওয়া
আর আসার মাঝখানে—

একবার ক'রে গেলে,
একবার ক'রে উগ্‌রে দেয়
এক রাক্ষুসী সময়।

যার যার নির্জন কুঠুরিতে
তখন সবাই আমরা বন্দী,
সমস্ত সুন্দর মুখ তখন
কালো বোরখায়
ঢাকা প'ড়ে যায়।

সমস্ত অক্ষর আড়াল ক'রে
দাঁড়িয়ে থাকে—

মুণ্ডগ্রীবাহীন এক নির্বোধ কবন্ধ,
উদরে যার মুখ,
আর সেই মুখমণ্ডলে বসানো
অগ্নিবর্ষী একটিমাত্র চোখ।

ঘরের মধ্যে তখন হামাগুড়ি দেয়,
হাত্‌ড়ে ফেরে
এক চাপা কণ্ঠস্বর—

ক'টা বাজল?
কখন আসবে?

খেলা

খেলনাগুলো প'ড়ে রইল
ছড়িয়ে ছিটিয়ে

দেশলাইয়ের বাক্স জোড়া দিয়ে
তৈরি করা রেল

উনুন কড়াই খুন্তি
চালডাল ভাঁড়ার হেঁশেল

হাত-খসা পা-খসা
মুণ্ডুহীন
কয়েকটা পুতুল

চেয়ার টেবিল টুল

মুখোসে ফোটানো
রাক্ষসখোক্কস দৈত্যদানো

এর পর চোখ বুঁজলে
শুরু হবে সত্যিকার পালা

এসব তো খেলা ॥

ভানুমতীর খেল

সাদার গায়ে ছিটানো কিছু কালি ;
বিষয়আশয় বলতে সেই বুড়োর
আর আছে কী ?

এই নিয়েই তো খালি
যত রাজ্যের চাপান আর উতোর।

ইহকালের কাছে তো সেই বুড়ো
পাতেনি হাত ;
আপনি মিলেছে যা
তাতেই খুশি, হোক না খুদকুঁড়ো
হোক কিছু তার চোখের জলে ভেজা।

ইহকালের ভয় নেই আর বুড়োর
ভয়টা শুধু পরকালের এখন
পড়েছে দাঁত, গেছে চোখের নজর
মানে না দেহ আগের কড়া শাসন।

স্বর্গনরক পাপপুণ্য ওসব
দেয় না তাকে টান কিংবা ঠেলা
বেঁচে থাকার প্রত্যহই পরব
যা দেখে তাই ভানুমতীর খেলা॥

মুখরোচক

ফুলঝাড়ু তার হাতের থাবায়,
বগলদাবায়
পাপোশ

ধুলোময়লার সঙ্গে কখনও
করে না সে কোনো
আপোস

তার ধারণায়, ঘরকন্নায়
যারপরনাই
ঝানু সে

একা সেই পারে করে দিতে সাফ
যত করে পাপ
মানুষে

হল একদিন সে চিৎপটাং
খেয়েছিল ল্যাং
জবর

ছাপা হল ঢেউ-খেলানো বক্সে
মুখরোচক সে
খবর ॥

গৃহস্থ হও

চালচুলোহীন, ওরে ও হা-ঘরে
বর্বর !
কেন তুমি সম্বৎসর
শুধু ঘুরে ঘুরে
ক্ষয়ং করো ছয় ঋতু ?

কথা জুড়ে জুড়ে
তোমারই জন্যে,
দেখ —

কী সৌজন্যে

সাজিয়ে রেখেছি

উঠোন ও ঘর,

চাষের যোগ্য ভূমি।

কই কোথায় হে, পা রাখো।

বর্বর তুমি,

হও এইখানে স্থিতু।

কী ভয় ?

কী ডর ?

কবর তো নয়

ঘর।

এমন তো নয়, তুলেছি মাটিতে

নিরেট কথার দেয়াল

জানলাদরজা ফুটিয়েছি সার সার

বেঁধেছি যেমন

দিয়েছি তেমনি ছাড়।

ছুটে এসে দেখ,

মশালের মুখে

কথা-দিয়ে-কথা-জোড়া

টগবগে লাল ঘোড়া।

ঘরে ঢুকলেই

ছটফটে আলো

উঠে যাবে বুকেপিঠে

হাওয়াটা দামালো

ডাকাবুকো

ডানপিটে।

শোনো কথা, বর্বর !
কবর তো নয়,
তোমারই জন্যে
আমি কথা দিয়ে
        বানিয়েছি এই ঘর ॥

জল নেমে গেলে পলি

দেবতার থানে ধ'রে দিয়ে পাঁচসিকে
কিনে নেব ত্রাণ—
            আমরা নই সে চিজ

হানা দিলে বান
            ডেকে তুলে পড়শিকে
চলে আমাদের তদন্ত তজবিজ

পেটে পড়ে টান,
            পড়ুক—
উঁচুতে টাঙাই শিকে
পদ্মপাতায় ভালো ক'রে মুড়ে
মাটির হাঁড়ির মুখ
      হাতের নাগাল থেকে ঢের দূরে
            তুলে রেখে দিই বীজ

এ দুর্দৈবে
অপূর্ণ সব সাধনা ও সাধ যদি
      হয় অন্তর্জলি

যদি যায় নিবে

ফুৎকারে দীপাবলী—

ঝেড়ে ফেলে সব স্বখাতে ফিরবে নদী

জল নেমে গেলে পলি

সে ভার বইবে—

ঘটাবে ভাঙা ও গড়ার সপ্তপদী ॥

চইচই-চইচই

১

ফুটপাথে গাছের নিচে

আঁস্তাকুড়ে

যেন সাপ খেলাচ্ছে সাপুড়ে

পড়ন্ত বেলায় যেই

হঠাৎ হারিয়ে খেই

এ গলিতে হাওয়া বয়

না, সাদা নিশান নয়

গা দোলায়, নাড়ে মাথা

জঞ্জালের স্তূপে গাঁথা

কিসের পালক ?

কোমরে রেখেছি হাত,

নিচু হলে লাগে।

তাছাড়া কী জানো—

এমনই বরাত

আপিস ছুটির পর
রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক।

চারদিকে চর্‌কির মতো
যেন ঘুরছে চোখ।
'নমস্কার'
'কী খবর'
'কেমন'
'ভালো তো'—

সমস্তই টায়-টায়। সব কিছুই ফাঁপা।
এমন কি ঠোঁটের কোণে হাসিটাও
ফিতে দিয়ে মাপা।

আমি কিছু মাখি না কো গায়।
কার মন
কে জানে কোথায় আছে প'ড়ে—

আমার যেমন।
যখন ফেরাই চোখ
তখনও মনের মধ্যে ঘোরে.

বলতে পারো,
কিসের পালক?

আমি ছাড়া
সকলেরই রয়েছে কিছু না কিছু কাজ
কোথাও না কোথাও সকলেরই
পৌঁছুবার তাড়া।

হাত খালি ব'লে
রাস্তায় আমারই একা
হয়ে যায় দেরি।

চোখে যা দেখি না, তাও এঁদো এ গলিতে
বুঝে নিতে হয়
আকারে ইঙ্গিতে।
করতে হয় আমাকে আন্দাজ
আছে এক নভশ্চক্র
মাথার ওপর

সেইখানে রোজ
পালা ক'রে সূর্য ওঠে
তারপর ডোবে।

এখনও গাছের নিচে
হাত নাড়ছে সমানে
কিসের পালক ?

এ রাস্তায় আগে সব ছিল হাতে গোনা
হোস্‌পাইপে জল না দিলে
না জ্বললে একসঙ্গে সব আলো
সন্ধেই হত না

আমি রাখি খোঁজ
কিভাবে ছায়ারা
অন্যদের হাত থেকে
ছাড়িয়ে নিজেকে

দগ্ধ পিচে

পা-ঘ'ষে পা-ঘ'ষে

ঝাঁপ দেয় কোন্ অন্ধকারে

ভালো কথা, মনে পড়ে গেল

ফুটপাথে গাছের নিচে

আঁস্তাকুড়ে ব'সে

কাকে দেখে হাত নাড়ে

কিসের পালক ?

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে

একদা গ্রামের এক

ফেরারী বালক

ছুটতে ছুটতে চলে যায়

সব কিছু ভুলে

সমস্ত মুখোশ, সব ছদ্মবেশ খুলে

তারপর জলের ধারে শোনা যায়

বহু সাধ্যসাধনার ডাক :

আয় হাঁস, চইচই

আয় হাঁস,

চইচই-চইচই ।

২

এবার পুজোয় খুব মজা করা যাবে । বেশ

চুটিয়ে হইচই—

বাড়িতে বন্ধুরা আসবে, তেলমাখা মুড়িতে

পুরনো কথার পিঠে কথাগুলো হবে রীতিমতন জম্পেশ

মোড়ের দোকান থেকে ঘড়িঘড়ি চা আসবে খুরিতে ।

ক'টা দিন, দেখে নিও, পাড়া ছেড়ে এক পা-ও নড়ছি না
দূরে আমি যাব না কোথাও
তেমন জরুরি ডাক, সমন বা সপিনা
যদি আসে, তাও
কায়দা ক'রে এড়াব সম্ভব—
ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো শরীরটা দেখিয়ে।

আমি চার্বাকের চেলা ; মাছ খাই ক'রে ধারদেনা
ধর্মে আমার নেই মতি, নেই ঈশ্বরে বিশ্বাস
এসব ছাইপাঁশ
যুক্তি দিয়ে এবারেও রাখবে যে ঠেকিয়ে
তা হবে না—
আমাকে দিতেই হবে নতুন কাপড়।

আমাদের ছেলেবেলা, আজকে যা তার চেয়েও বেশি,
কেটেছে অভাবে।
বছরে একবার, তাও বোধনের বাজনা বেজে গেলে,
যখন চোখ ফেটে জল গড়াচ্ছে দু'গালে,
হয় প্যাণ্ট, নয় জামা, নয় ফিতেবাঁধা বুটজুতো।

কোনোবার একেবারে কিছুই না পেলে,
পুরনো স্মৃতির ঝুলি ঝাড়লে দেখা যাবে—
ছোটদের মুখে হাসি ফোটাতে শেষকালে
বাড়িয়ে দিতেন হাত হয়তো প্রতিবেশী।

পেলে কী আনন্দ হতো, না পেলে যে কী হতো মন খারাপ।
তবুও অস্বস্তি ছিল। গুরুজনদের যাতে মুখরক্ষা হয়
তারি জন্যে আমাদের বড় হতে হয়েছিল দ্রুত।
সেই থেকে খোলা মাঠে, খুলে ফেলে আকাঙ্ক্ষার রঙিন মেরাপ।

তারপর তো কেটে গেছে একরকম লাফিয়ে সময়
নদীনালা টপ্‌কে টপ্‌কে, পার হয়ে সমুদ্র পাহাড়
যত না হয়েছে জিৎ, তার চেয়ে ঢের বেশি হার।
কত কী যে করা হয়নি, যা করেছি তাও কিছু নয়।
মুশকিল আসান হব ছিল সাধ
হতে হল ভগ্নমনোরথ মুসাফির।

এ ভারি অদ্ভুত বটে
মনের ভেতরে মন, শরীরের ভেতরে শরীর
কিভাবে যে বসে যায় ঠিক খাপে খাপে।
সব বাদ-বিসম্বাদ
গতির বুনটে
খুঁজে পায় স্বচ্ছন্দে অন্বয়।
থেকে যায় জীবনের চিহ্ন পাঁচ আঙুলের ছাপে।

দিনের বেশির ভাগ কেটে গেল
এর কুর্তা, ওর টুপি, তার জুতো চেয়েচিন্তে প'রে
সেও কিছু মন্দ নয়। ভালো।
পরকে আপন করা সেই সূত্র ধ'রে।
তবুও কথার মধ্যে থেকে যায় কথা।
তুমি বুঝবে, তোমার যা নাক—
পুরনোর যত গুণই থাক
নতুনের মতো নেই তার মৃতসঞ্জীবনী গন্ধের উষ্ণতা।

এখন হয়েছে ভালো জ্বালা,
যারা এসেছিল পরে সেইসব কনিষ্ঠ অনুজ
নেহাৎ অবজ্ঞাভরে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে আগে।
কিছু আছে অক্ষম অবুঝ
কেবলি পেছন থেকে তারা দিচ্ছে ঠেলা।
পড়ে গেলে ফের উঠে আমি যাতে ধরতে পারি খেই

তাই পা রেখেছি ঠিক দাগে।
হাতে কিছু থেকে গেছে এখনও সময়।

সাবধানের, জানোই তো, মার নেই
না নিয়ে ছাড়ব না আমি, যে যাই বলুক,
টাটকা আনকোরা গন্ধে গন্ধময়
শুচিশুভ্র পাটভাঙা উৎসবের নতুন কাপড।
আমি চাই ফিরে পেতে শৈশবের হারানো সে সুখ!

যখন অনেক ভোর,
বাতি নেভাবার আগে রাস্তায় বেরিয়ে,
যখন ট্রামের তারে মুছে যায়নি রাতের শিশির,
পাখিরা যখন সবে যাবে কি যাবে না এই দ্বিধা নিয়ে
ছেড়ে যাচ্ছে নীড়,
আমি যাব জুতো খুলে খালি পায়
যেখানে গাছের নিচে টুপটাপ টুপটাপ
শিশির পড়ার শব্দে শিউলি ঝরে যায়।

যখনই সময় পাব, গিয়ে বসব পুজোর প্যাণ্ডেলে
এককোণে যদি ব'সে থাকি চুপচাপ
মজার মজার দৃশ্য চোখে পড়বে, কানে আসবে কথা
মুখটা ফেরানো থাকবে প্রতিমার দিকে,
নইলে কী আক্কেলে
ব'সে থাকব, বাঁচিয়ে ভব্যতা!

আলোয় সাজিয়ে লরীটিকে
পাড়ার সমস্ত ছেলে সঙ্গে যাবে নেচে নেচে
নেবে না তোমাকে।
তুমি একা ব'সে থেকো অন্ধকার নির্জন প্যাণ্ডেলে,
আমি যাব, আমি যাব ব'লে
যতই ডাক দাও মা-কে—

তোমাকে পেছনে ঠেলে ফেলে
সবাই ভাসানে যাবে, পাছে তুমি যাও বেঁচে
মা তোমাকে যাত্রাপথে তুলে নিলে কোলে ॥

অগত্যা

তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা বুড়ো
সব পাতা ঝরে গেলে শীতে
ফুঁ দিয়ে স্মৃতিতে

একা সে আঁটকুড়ো
ব'সে ব'সে সারাক্ষণ ফোলায় ফাঁপায়
রঙিন বুদ্বুদ

যেখানে যা পায়
মাটিতে লাগিয়ে মুখ খুঁটে খায় খুদ
পাখিদের মতন হুবহু

এক থেকে
সেও হতে চেয়েছিল বহু
একা তাকে ফেলে রেখে গিয়েছে প্রত্যেকে

দাঁতে আরো জোর কমবে চোখে কমবে জ্যোতি
জিভ আরো বেশি ক'রে চাইতে থাকবে নুন-ঝাল-টক
তখনই ফিরিয়ে নেবে বস্তু তার দেহ থেকে গতি

ভারী মোটা কম্বলের মতন কুয়াশা
ঢেকে দেবে আপাদমস্তক—
তার খুব আশা ॥

পেঁয়াজি

শক্তি বেশ বলে—
পদ্য।
কবিতার কচকচি থেকে
গা বাঁচাবার
এর চেয়ে ভালো উপায় নেই।

কবিতাকে পেঁয়াজ বললে
অনেকেরই শুচিবাইতে লাগবে
কেননা ওর সঙ্গে প্রায়ই জড়ানো থাকে
রক্তমাংসের
একটা আঁশ্‌টে গন্ধ।

অথচ ছাড়াতে ছাড়াতে
ছাড়াতে ছাড়াতে
শেষ পর্যন্ত দেখবেন
কবিতারও কিছু থাকে না।

কবিতা কী?
দাঁড়ান, ভেবে দেখি—

প্রেমে-পড়া ভীরু হাতের গোলাপ
বনের গায় ফিনিক-দেওয়া জোনাকি
মিছিলে গলা মিলিয়ে গান
দূর থেকে কমরেড ব'লে চেঁচিয়ে ওঠা
ফুৎকারে নিজেকে উড়িয়ে দেওয়া

কিন্তু তার আগে
আমাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে
বলুন তো—

কবিতা কী নয়?

ছবির মতো

(সাগরময় ঘোষ-কে)

পা দিয়ে আল্‌তো ক'রে নৌকোটা ঠেলে দিতে দিতে
কেউ যেন বলল,
আর দুটো দিন থেকে গেলে হ'ত না ?

আগে বললে অবশ্যই থাকতাম ।
এত আদর, এত অভ্যর্থনা—
এসব ছেড়ে যেতে
কারই বা মন চায় ?

কিন্তু কী জানেন,
সাত ঘাটে জল খেয়ে বেড়ানো যার কাজ—
এক জায়গায়
বাঁধা পড়লে কি তার চলে ?
আর সেটা দেখায়ই বা কেমন ?

হৈ হৈ ক'রে পালে হাওয়া এসে লাগায়,
আমার বিশ্বাস,
আমার কথাগুলো ঘাটে উঠতে পারেনি ।
কেননা দূর থেকে দেখছিলাম
আমার বন্ধুরা
পাড়ের ওপর ছবির মতন দাঁড়িয়ে
তখনও সমানে হাত নেড়ে যাচ্ছে ॥

তোমার যদি কম হয়

একা কিংবা লোকের ভিড়ে
ঘরে এবং
ঘরের বাইরে
বুলিয়ে রং
কথার গায়

যে যখন চায়
যত ইচ্ছে
হাত বাড়িয়ে সবাই নিচ্ছে

অনাদ্যন্ত
অফুরন্ত

সময়
আমার সময়।

দরাজ হৃদয়
দয়ার শরীর
দূরের বন, ভোরের শিশির
কীটপতঙ্গ
পশুপক্ষী

যে বেদনার্ত, যে নিঃসঙ্গ—
কাছে এলে
হাতের লক্ষ্মী
পায়ে ঠেলে
যার যেমন ঠাঁই
যার যেমন খাঁই

নানান মাপে
রঙিন খাপে
সবাইকে দিই আনন্দময়
পাতলা কিংবা গাঢ়

সময়
আমাব সময়

অনায়াসে নিতে পারো
তোমার যদি কম হয় ॥

কেল্লা

কোন্‌টা ভাঁটি আর কোন্‌টা উজান
ঠাহর করতে না পেরে
লোকটা
চিরটা কাল তটস্থ হয়েই রয়ে গেল ।

ওর দরকার ছিল
পেছন থেকে এক মোক্ষম ধাক্কা ।
কোনোরকমে ঢেউয়ের মুখে ওর নৌকোটাকে
ফেলে দিতে পারলেই—

কেল্লা সে ফতে ক'রে দিতে পারত ।

'নয়-ছয়' নাটকের গান

হরদম

দিয়ে দম

গাঁজার কল্কেয়

হর হর

বম বম

বোম্বাই বোল্‌কে

দাও টান আরো টান মারো টান

হরদম ভবদম

টুকটাক ঠিকঠাক

ও পাড়ার শিবেন গঙ্গো

দেখালেন কিবা রঙ্গ

গা রে···

দাও টান মারো টান

গায়ে দিয়ে না-মা-ব-লী

দিতে যা-চ্ছি-লে-ন বলি

রোখ্‌কে বোখ্‌কে

বলতে বক্ষে

পেল মেয়েটা শেষটায়

অনেক চেষ্টায় ··

হরদম ভরদম

টুকটাক ঠিকঠাক

গা রে···

দাও টান মারো টান ॥

লাতভিয়ায় লোকমুখে

১

মৌমাছিতে পৌঁছিয়ে দেয়
আমার কথা প্রিয়ার কাছে।
লোকমারফত পাঠাই না তা
অপবাদের ভয় যে আছে॥

২

কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ
দেখ তো মা, এসেছে কেউ।
ঘাঘরা কোথায়?
পরি কী!
আখার আড়ায়।
করি কী!

৩

পরের বাড়ি পাতে ব'সে
খোলে দিদির হাত দুটো।
নিজের বাড়ি পড়লে পাত
দিদির দেখ হাত মুঠো॥

৪

দুই স্বজনে দেখা হলে
আমার নামে নিন্দে এ-ত।
হতাম যদি ফুল্‌কো লুচি
ওরা আমায় গিলে খেত॥

৫

জলে হাঁস সাঁতার কাটে
আমার ঠাঁই কাদায় পাঁকে।

হাঁসের গায়ে জল লাগে না
আমার গায়ে কাদা থাকে না ॥

৬

মানুষ ক'রে ছেলেকে মা
সুখের দিন গোনে।
বিয়ে ক'রে এনে খোকা
মাকে পাঠায় বনে।
ঘর করবে সুখে
মাকে বনে রেখে ॥

৭

রূপসী বউ, সাদা ঘোড়া
জানবে তাব কপাল পোড়া।
ঘোড়ার চাই নিত্যি সাফাই
বউয়ের ওপর নজর কড়া ॥

৮

ছোট-বড়োয় ভাব নেই
কড়া নরমে নেই মিল।
বড়োর কাছে ছোট তুচ্ছ
কড়ার চাপে নরম কাহিল ॥

যুদ্ধের পর : অন্ধ শিল্পীর ছবি দেখানো

মারিস চাকলাইস

…দেখুন, আমার এই 'প্রাতরাশ' নামের ছবিটা।
এই যে মাঠের ধারে দেখছেন লোকগুলো—

মুখের ওপর এত পড়েছিল রোদ
মনে হয়েছিল যেন তাও
নিজেদেরই গতরে ফলানো।
আজ সে মানুষগুলো কোথায় কে জানে!
কোথায় রয়েছে কোন্ খেতের কিনারে?
ইহলোকে, নাকি পরলোকে?
না, ওরা ভালোই আছে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, এখানেই
বেঁচেবর্তে আছে সব 'প্রাতরাশে',
আমার ছবিতে।

দু'হাতে কাঁটায় টিক দিয়ে দিয়ে দেয়াল ঘড়িটা
মাপজোক ক'রে
সমানে বাজিয়ে দেখে নিচ্ছিল সময়।
সমবেত দর্শকেরা
এ ওর মুখের দিকে চাইছিল কেবলি।

...আর এই 'ভর দুপুরে' ছবিটা দেখুন।
শুধুই বাগান, শুধু বাগিচা, উদ্যান
এমন কি সে বাগানের
নেই ছায়া
ফেলবারও সময়:
কেবল বাগান। তবু এককোণে বেপথু
অবক্ষিত পপিফুল, আমিও জানি না
সে কেন অমন ক'রে দেখায় নিজেকে:
চারিদিকে জমকালো বাগান—
পাঁপড়ির ঘাঘরায় পপিফুল বেচারা
একেবারে একা।

দেয়ালঘড়ির শব্দে এতক্ষণে মনে হল
দরোজায় কড়া নাড়ছে

কী একটা খবর নিয়ে যেন কোনো পাড়াপড়শি কেউ
তখন শিল্পীর স্ত্রীর চোখে জল কানায় কানায়।

…এবার দেখুন চেয়ে 'অস্তাচলে সূর্য' ছবিখানা।
বিরাট আকাশ একটা, আমি জানি, এহ বাহ্য :
বিজন অরণ্য শীতে
কুঁচকে আছে একটি রেখায় ;
বাল্যে দেখা সব মেঘ,
সমস্ত দানব,
মানুষের বুকে যারা আতঙ্ক জাগায়,
সন্ধ্যার মালঞ্চে সব প্রস্ফুটিত,
তোমাদের যাবতীয় কাংস্যযুগ, স্বর্ণযুগ ; না, না,
এ ছাড়া সম্ভব নয়
অন্য কোনো কল্পরাজ্য।

এবং শিল্পীর স্ত্রীর গালে নেই অশ্রু এককোঁটা ;
নিঃসঙ্গ ঘড়িতে সপ্তগ্রামে চড়া কোকিলের গলা,
এবং দেয়াল সাদা,
সেখানে ছবির কোনো নামগন্ধ নেই ॥

১ পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। বিশ্ববাণী প্রকাশনী॥ কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ, ১৩৮০; দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফাল্গুন, ১৩৮৪। প্রচ্ছদশিল্পী: গৌতম রায়। প্রকাশক: ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মুদ্রক: অনাদিনাথ কুমার, উমাশঙ্কর প্রেস, ১২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম: চার টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫। একুশটি কবিতার সংকলন:

১ ভুলতে পারছি না (যদি আমাকে জিগ্যেস করো কোথায় ছিলাম)
২ মিতালি (মাটিতে পড়ে যাওয়া ধুলোমাখা চাহনিগুলো থেকে)
৩ স্বপ্নের পক্ষিরাজ (নিরর্থক, আর্শিতে নিজেকে নিজে দেখা,)
৪ একত্ব (কাছাকাছি ঘেঁষে, ঐক্যভাবে,)
৫ রুচি (ভুয়ো জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্যে)
৬ কাব্যকৃতি (এদিকে ছায়া ওদিকে বিস্তার,)
৭ আবার শরৎ (ঘণ্টাগুলো থেকে লুটিয়ে পড়ে একটা শোকগ্রস্ত দিন,)
৮ কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি (তোমরা জানতে চাইবে :)
৯ মাদ্রিদে পদার্পণ করল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড (সকালটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডা,)
১০ ব্রুসেল্‌স্‌ (আমার কবে ফেলা সব কাজ,)
১১ স্তোত্র আর প্রত্যাবর্তন (হে পিতৃভূমি, হে স্বদেশ !)
১২ যারা আবিষ্কার করেছিল (উত্তর থেকে আলমাগ্রো এনেছিল কোঁচকানো বিদ্যুৎ,)
১৩ অকর্ষিত অঞ্চল (পরিত্যক্ত শেষ প্রান্ত।)
১৪ মাপোচো নদীকে শীতের বন্দনা (ও হ্যাঁ অসংক্ষিপ্ত তুষার)
১৫ আমি দাক্ষিণে ফিরতে চাই (ভেরাক্রুজে আমি অসুস্থ, স্মরণ করছি)
১৬ মাগেলানের হৃদয় (দূরে দক্ষিণের কথা মনে প'ড়ে)
১৭ মহাসমুদ্র (যদি হয় প্রতিভাত আর শ্যামল তোমার নগ্নতা,)
১৮ নতুন পতাকার নিচে পুনর্মিলন (কে মিছে কথা বলেছে ? পদ্মের পা)
১৯ মাকচু পিকচুর শিখর থেকে (শূন্য জালের মতন হাওয়া থেকে হাওয়ায়)
২০ এক রমণীদেহ (রমণীর দেহকায়, ধবল পাহাড়, শ্বেত উরু,)
২১ মাটির স্বর্গে (শুচিশুভ্র একটি মেয়ের পাশে আজকে শুয়ে ছিলাম)

বিশ্ববাণী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল 'পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ'। এই সংকলনগ্রন্থটির পরিচয় : প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮১ ; প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৬। দাম : ১৪ টাকা। উৎসর্গ : শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসু স্মরণে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২১৫। দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বই : দিন আসবে, পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ, এই ভাই, ছেলে গেছে বনে। এছাড়া ছিল 'ভিয়েতনামের কবিতা' এই শিরোনামে তিনটি কবিতা : "স্বপ্ন", "ফুলের পাঁপড়ি ঝরে পড়ে যায়···" "হাতে মাত্র চোখের এক পলক সময়"।

বিশ্ববাণী প্রকাশনীর আলাদা বই 'পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ'-র অন্তর্গত "মাগেলানের হৃদয়" কবিতায় প্রথম পংক্তি ছিল : 'দুরে দক্ষিণের কথা মনে প'ড়ে'। সংকলনগ্রন্থের পাঠ : 'দূর দক্ষিণের কথা মনে প'ড়ে'। এই কবিতাতেই ২৩ পংক্তির শুরুতে 'কাব্যসংগ্রহে' আছে 'দীর্ঘরাত্রি' আর আলাদা বইতে আছে 'রাত্রি'। তবে এটা মনে হয় স্পষ্টত মুদ্রণপ্রমাদ, পাঠান্তর নয়। অনুরূপ আরো দু-একটি ছাপার ভুল ছাড়া কোনো পাঠভেদ আমাদের চোখে পড়েনি। ঐ আলাদা বই এবং সংকলনগ্রন্থ দু-জায়গাতেই কবিতার শিরোনাম আছে "মাক্‌চু পিক্‌চুর শিখর থেকে"। বর্তমান সংকলনে ওটা দাঁড়িয়েছে "মাচু পিক্‌চুর শিখর থেকে"। তার পরবর্তী কবিতার শিরোনাম আলাদা বই এবং সংকলনগ্রন্থ দু-জায়গাতেই ছিল "এক রমণীদেহ"। বর্তমান সংকলনে কবিতাটির নাম "রমণীদেহ"। তবে সংকলনগ্রন্থে সূচিপত্রে "এক রমণীদেহ" বলে নির্দেশিত হলেও বইয়ের ভেতরে কবিতার শিরোনাম আছে "রমণীদেহ"। আলাদা বইয়ে অবশ্য বইয়ের ভেতরেও "এক রমণীদেহ"ই আছে। মাচু পিক্‌চুর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মূলে রোমান হরফে বানান থাকে Macchu Picchu। কিন্তু পাবলো নেরুদার নিজের উচ্চারণে ওটা অনেকটা 'মাচু পিচু'-র কাছাকাছি এসে যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে 'পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৮০-তে, অর্থাৎ এপ্রিল-মে ১৯৭৩। ১৯৭২-এ 'পাবলো নেরুদার কবিতা' নামে আর একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। অনুবাদক মঙ্গলাচরণ চট্টো-পাধ্যায়। এই বইটির পরিচয় : প্রকাশক : বিভাস ভট্টাচার্য, সারস্বত লাইব্রেরি, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। প্রচ্ছদ-লিপি : চারু খান। প্রথম প্রকাশ :

১৯৭২, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৭৬, তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৩। দাম : চব্বিশ টাকা। মুদ্রাকর : তাপস হাটই, নিউ তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। উৎসর্গ : পাবলো নেরুদা-র সহযাত্রী দেশ-বিদেশের কবিকুল-কে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭০। নেরুদার ছ-খানা কবিতার বই থেকে এই সংকলনে অনূদিত কবিতার সংখ্যা ২৬। "ভুলতে পারছি না", "কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি", "মাদ্রিদে পদার্পণ করল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড", "স্তোত্র আর প্রত্যাবর্তন", "মাটির স্বর্গে" এই কবিতাগুলি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদেও পাওয়া যাচ্ছে। মঙ্গলাচরণের অনুবাদে এদের শিরোনাম যথাক্রমে : "ভোলা যায় না", "কয়েকটি ব্যাপারের ব্যাখ্যা", "আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের মাদ্রিদ-প্রবেশ উপলক্ষে", "প্রত্যাবর্তন ও স্তোত্র" এবং "নারী সুদর্শনা"।

পাবলো নেরুদার অনুবাদ প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুবীর রায়চৌধুরীকে ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে লেখা এক পত্রে জানিয়েছেন : "পাবলো নেরুদা অনুবাদ করেছিলাম 'হাংরাস' লেখার ফাঁকে ফাঁকে। গদ্য লেখার একঘেয়েমি কাটাতে।"

২ রোগা ঈগল

ওলঝাস সুলেমেনভ-এর রোগা ঈগল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৮১। প্রচ্ছদশিল্পী : নিতীশ (sic) মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মুদ্রক : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম : আট টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৪। ৩৪টি কবিতার সংকলন :

১ মা
২ কুরগালজিনো হ্রদে
৩ রাতের বিমানে
৪ পাঞ্জা
৫ বৃষ্টি—এরোপ্লেন থেকে
৬ এক অন্ধ দর্শক
৭ বলো দেখি…
৮ প্রচণ্ড গরমে

৯ তিন সেলাম

১০ আমি জেগে আছি

১১ মণ্ডলাকার নক্ষত্র

১২ রোগা ঈগল

১৩ সুম্‌বুলের তারা

১৪ আহাম্মকের কথা

১৫ আঙুরক্ষেতে

১৬ আমাদের গ্রামে ছিল এক চর্মকার

১৭ হে মরুভূমি

১৮ ইষ্টনাম জপি

১৯ মাটির কেতাবের দুটি খণ্ডাংশ

২০ উড়াল

২১ কোজাগরী : লায়লাতুল কাদার

২২ ফাঁসির আগে মহম্মদের মোনাজাত

২৩ আগস্টেব এই সব রাত

২৪ মরুভূমিতে রাত্রি

২৫ কথাটি

২৬ বিলম্বিত

২৭ বিজ্ঞান, ধর্ম আর সৌন্দর্য বিষয়ে

২৮ পদার্থবিদের প্রার্থনা

২৯ হে পর্বতমালা

৩০ যায় আসে

৩১ পদচিহ্ন

৩২ বিড় বিড় ক'রে আওড়াচ্ছে পদ্য···

৩৩ রে তিমুর খান, লোহার তৈরি খঞ্জ

৩৪ নিউ ইয়র্কে বৃষ্টি

প্রথম সংস্করণের সূচিপত্রে ২৩-সংখ্যক ও ৩৩-সংখ্যক কবিতা যথাক্রমে "আগস্টের এই সব রাত" ও "রে তিমুর খান, লোহার তৈরি খঞ্জ" এইভাবে নির্দেশিত হলেও বইয়ের ভেতরে "অগস্টের এই সব রাত" ও "রে তিমুর খান, লোহায় তৈরি খঞ্জ" এই শিরোনামে পাওয়া যায়। বর্তমান সংগ্রহে 'অগস্টের' ও 'লোহায়' এই পাঠ

নেওয়া হয়েছে। প্রথম সংস্করণের 'তফাৎ' বর্তমান সংগ্রহে 'তফাত'-এ রূপান্তরিত। "হে মরুভূমি" কবিতায় 'ধসে' বানান এই সংগ্রহে করা হয়েছে 'ধ্বসে'। "কথাটি" কবিতায় 'রাতের গড়নে যা নয় তাই হয় অন্ধকার' বর্তমান সংগ্রহে হয়েছে 'রাতের গড়নে যা-নয়-তাই হয় অন্ধকার'। তেমনি "বিলম্বিত" কবিতায় '…ওরা বাবা রে মা-রে করবে'-র 'বাবা রে'-র মধ্যেও হাইফেন বসানো হয়েছে। "বিজ্ঞান, ধর্ম আর সৌন্দর্য বিষয়ে" কবিতার ১১-সংখ্যক পংক্তিতে 'নিষ্ঠুরতা'-র পরে বর্তমান সংগ্রহে কমা বসানো হয়েছে। প্রথম সংস্করণে এই যতিচিহ্ন ছিল না। "পদচিহ্ন" কবিতার 'প্রিয় মুখ হাজার ভিড়ের মধ্যেও আমি ঠিক খুঁজে নেব, / অভিধান ঘেঁটে আমি খুঁজে বার করব ভাল ভাল কথা,' /—এই দুই লাইনের মধ্যে 'ঠিক' শব্দটি জায়গা বদল করায় পংক্তিদুটি দাঁড়িয়েছে : 'প্রিয় মুখ হাজার ভিড়ের মধ্যেও আমি খুঁজে নেব, /অভিধান ঘেঁটে আমি ঠিক খুঁজে বার করব ভাল ভাল কথা,'/—"বিড় বিড় ক'রে আওড়াচ্ছে পদ্য ··" কবিতার ১৬-সংখ্যক পংক্তি 'এখুনি আমি তার স্বরে চিৎকার করে উঠব :' বর্তমান সংগ্রহে দাঁড়িয়েছে, 'এখুনি আমি তারস্বরে চিৎকার করে উঠব :'। এছাড়া দু-একটা স্পষ্টত ছাপার ভুলের সংশোধন ভিন্ন আর কোনো বদল আমাদের চোখে পড়েনি।

স্মলেমেনভ্-এর এই কবিতাগুলি অনুবাদের প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত চিঠিতে আমরা পাই : " 'রোগা ঈগল' বন্ধুকৃত্যের জন্যে।"

৩ নাজিম হিকমতের আরো কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৬। প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মুদ্রক : আনন্দ-মোহন দত্ত। নারায়ণী প্রেস। ২৬/সি, কালীদাস সিংহ লেন। কলিকাতা-৯। দাম : দশ টাকা মাত্র। উৎসর্গ : শোভামল পারেখ—স্নেহভাজনেষু। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮২। ২৭টি কবিতার সংকলন :

১ মাথা উঁচু করে
২ খালি পায়ে
৩ আমাদের সন্তানসন্ততির প্রতি উপদেশ
৪ কেটে যাচ্ছে এইভাবে
৫ লোহার খাঁচায় সিংহ

৬ নির্বন্ধ
৭ আমাদের এই মেতে ওঠা
৮ কবির ক্ষণিক কুঁড়েমি
৯ চলে গেছে
১০ বন্দীমুক্তি
১১ আমার দেহস্থ কীট
১২ চানকিরি জেল থেকে চিঠি
১৩ তারান্তা-বাবুকে লেখা পত্রাবলী
১৪ প্রাহায় সকাল
১৫ একটা চিঠিতে মুনেভার আমাকে এই কথা লিখেছিল
১৬ মুনেভারকে এই ব'লে চিঠি লিখেছিলাম
১৭ বর্ হোটেল
১৮ আশাবাদী প্রাহা
১৯ মিখাইল রেফিলির স্মৃতিতে
২০ মৌমাছি
২১ ভোরের আলো
২২ চলে গেলে
২৩ অকস্মাৎ
২৪ সকাল ছ'টা
২৫ স্বর্ণকুন্তলা
২৬ আমার অন্তিমে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে 'নাজিম হিকমতের কবিতা'র এটি দ্বিতীয় সংকলন। প্রথম সংকলন 'নাজিম হিকমতের কবিতা'-র প্রথম সংস্করণের প্রকাশ এপ্রিল ১৯৫২। দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত 'কবিতাসংগ্রহ' ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এই বই সম্পর্কিত কিছু তথ্য ঐ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে পাওয়া যাবে। প্রায় সাতাশ বছর বাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবার নাজিম হিকমতের কবিতার দ্বিতীয় অনুবাদ সংকলন প্রকাশ করলেন। সুবীর রায়চৌধুরীকে লেখা ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩-এর পূর্বোক্ত চিঠিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নাজিম হিকমতের অনুবাদ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন: "নাজিম হিকমত অনুবাদ করেছিলাম 'পরিচয়'-এর অর্থাভাব মেটানোর জন্যে।" এ বক্তব্য নিশ্চয়ই দ্বিতীয় সংকলন সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে নাজিম হিকমতের অনুবাদ নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ বিষয়ে অনেকের রচনাতেই অনেক মন্তব্য পাওয়া যায়। ১৯৬৭ সালে আমেরিকার আয়ওয়া শহরে এক লেখক সঙ্ঘের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ লিখছেন :

"ইপিবি-তে গিয়ে দেখি সন্ধ্যার সভার জন্য ওয়ার্কশীট তৈরি করছে বিয়ার্শান। ছোটোখাটো দেখতে তুর্কি মেয়ে, বিয়ে করেছে মার্কিন বিল কিয়োকে, দু-বছরের ছেলে আছে সঙ্গে। বেশ হাসিখুশি, কিন্তু ওরই মধ্যে আছে একটা চাপা তীব্রতা। বিল আমাকে নিয়ে আসে বিয়ার্শানের কাছে, ঘরগেরস্তালির জিনিসপত্র কিনতে যাব সবাই মিলে, সবেমাত্র এসেছি বলে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার একটা দায়িত্ব যেন ওদের। এদিকে, এই শতাব্দীর তুর্কি কবিতা বিষয়ে কথা বলতে হবে বলে ব্যবহার্য রচনাগুলির একটা আগাম ওয়ার্কশীট তৈরি করবার কাজে এখন ব্যস্ত সে। প্রাথমিক পরিচয়ের পর অল্প একটু ঝুঁকে দেখি কাগজের ওপর একটি নাম : নাজিম হিকমত। 'নাজিম হিকমত?' বলে কবিতাটা যেই তুলে নিয়েছি হাতে, ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি নিয়ে বলে ওঠে সদ্যপরিচিত বিয়ার্শান : 'এমনভাবে বললে যেন খুবই চেনা তোমার? নামটা আগে শুনেছ?'

মেয়েটির দিকে তাকাই। কথাটা কি পরিহাস না অবজ্ঞা? আক্রমণ না ঔৎসুক্য? অল্প একটু থেমে, বলতে হলো : 'শুনব না কেন? ইনি তো আমাদের প্রিয় কবিদের একজন।'

'আমাদের মানে?'

'মানে বাঙালি কবিতাপাঠকের।'

'কিছু-একটা গোলমাল করছ তুমি। অন্য কারো কথা ভাবছ বোধহয়' 'সেকী। অন্য কারো কথা ভাবব কেন?'

'তুমি বলছ, এই কবি, নাজিম হিকমতের কবিতা তুমি পড়েছ আগে?'

'একটাদুটো নয়, অনেক। আর সে তো আজকের কথাও নয়। পনেরো বছর ধরে পড়ছি, বাংলা অনুবাদেই।'

'পনেরো বছর?' আরো একবার প্রতিবাদে ঝংকার দিয়ে ওঠে বিয়ার্শান। কেননা, ও জানায়, পনেরো বছর আগে কোনো অনুবাদই বার হয়নি হিকমতের। জানায়, ওদের নিজেদেরই দেশে দীর্ঘকাল জুড়ে নিষিদ্ধ এই কবি, ওরাই হিকমতের কবিতা পড়ছে মাত্র ষাট সালের পর থেকে, আর এখন

তো মোটে সাতষট্টি। শুনে বিস্ময়ের চেয়েও প্রথমে অহংকারে ভরে ওঠে মন, খানিকটা ওপর থেকে বলবার ভঙ্গিতে জানাই ওকে: 'চমৎকার। তাহলে তোমাদের কবিতা তোমাদের চেয়ে আমরাই পড়েছি আগে। আমাদের এক-জন কবি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এসব অনুবাদ করেছেন সেই ১৯৫২ সালে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয়েছে বই, দুঃখ কেবল এইটুকু যে বইটি আমার সঙ্গে নেই এখানে।'

কিন্তু কী করে তা হলো? বিহ্বলতা যে বিল বা বিয়ার্শানেরই তা নয়, বিহ্বলতা আমারও। এরকমও হয় না কি? মনে পড়ল অনেকদিনের পুরনো একটা ছবি। পার্ক সার্কাস ময়দানের বিরাট শান্তিসম্মেলন। তারুণ্যের সুবাদে আমরা তখন সব সময়েই আছি তার কাছাকাছি, খ্যাত লোকদের খুব সামীপ্য থেকে দেখতে পাবার নিরুপদ্রব সুযোগ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তখনই প্রায় সর্বভারতীয় যশ, ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি, অন্য কোন্ অঞ্চলের এক প্রতিনিধি এসে ইণ্টারভিউ নিচ্ছেন তাঁর। পাশে দাঁড়ানো আমার হাতে টাইপ-করা কিছু কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়: 'দেখো, কবিতাগুলি কেমন।' বই ছাপা হবার আগে, বাংলায় নয়, ইংরেজিতে, সেই আমার প্রথম নাজিম হিকমত পড়া। ইণ্টারভিউর দায়মুক্ত হয়ে বললেন তিনি: 'এগুলির অনুবাদ করছি। ভালো হবে না?'

চকিতে একবার মনে হয়েছিল বটে, টাইপ-করা কাগজ কেন, ইংবেজিতে ছাপা কোনো বই নয় কেন। তেরো বছর জেলে কাটানোর পর তখন তিনি দেশান্তরী, ফরাসিতে আর ইংরেজিতে কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছে তাঁর, সেসব থেকেই তখন তৈরি হয়ে উঠছিল বাংলা লেখাগুলি, জেনেছি পরে।

এই গল্পের সবটা শুনে ঝলমল হয়ে বলতে থাকে বিয়ার্শান: 'এবার বুঝতে পারছি সব। এ-রকম আমরা শুনেছি যে আমাদের দেশে ওঁর কবিতা নিষিদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু জেলখানা থেকে গোপনে গোপনে তা ছড়িয়ে যেত দেশের বাইরে। আর কবি নিজে যখন দেশের বাইরে, তখনো তা লুকোনো ইস্তা-হারের মতো চলে আসত দেশে। নানা দেশের সংগ্রামীদের প্রেরণা ছিল ওঁর কবিতা। এইভাবেই তবে তা পৌঁছে গেছে ভারতেও।' "

[ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম, ১৯৮৬; পৃ. ২৩-২৪]

পার্ক সার্কাস ময়দানের এই শান্তি সম্মেলনের আর এক টুকরো ছোট বর্ণনা পাই শঙ্খ ঘোষের আরো কিছু পরের এক রচনায়।

"2 April 1952. Standing in the middle of Park Circus Maidan, an awestruck youth sees Manik Banerji striding over the Diagonal path to a vast marquee. Subhash Mukherji is giving an interview, brandishing some typed English translations of the Turkish poet Nazim Hikmet. Mangalacharan Chatterji in the press enclosure is preparing to write his report. The names of the conveners are being announced from the rostrum : Ustad Alauddin Khan, Uday Shankar, Jamini Ray, Mama Wadekar, Sumitranandan Pant, Vallathol, Mulk Raj Anand, Krishen Chander, Manik Banerji, Manoranjan Bhattacharya, Saifuddin Kichlu, Prithviraj Kapoor ..

Even the film star Prithviraj, in his spotless white ? Yes, for creative men of all sorts from all over the country have gathered here for a week's All-India Peace Conference."

["Towards a New Beginning : The Literary World of Modern Calcutta, 1941-1980" in *Calcutta : The Living City*, Vol. II, 1990 ; Ed. Sukanta Chaudhuri (Translated from Bengali)]

'নাজিম হিকমতের কবিতা' প্রথম ছাপা হবার পর তরুণ পাঠকদের কাছে সেটা কীভাবে গৃহীত হচ্ছিল, তার একটি নিদর্শন আছে সত্যজিৎ চৌধুরীর তৎকালীন এই মন্তব্যে :

"বিদেশী কবিদের রচনার সঙ্গে বাংলার পাঠকমনের যোগসূত্র স্থাপনের উদ্যম নতুন করে দেখা দিচ্ছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৃত 'নাজিম হিকমতের কবিতা' অনুবাদগ্রন্থ এই উদ্যমের ফসল। সহজ কণ্ঠে জীবনের গভীর মর্ম কবিতার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে দেবার একটা সুন্দর ভঙ্গি হিকমতের রচনায় পেয়েছি। গীতিকবিতায় মানবচরিত্র প্রতিফলনে হিকমত অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে একটি পরম মুহূর্তের মাঝ দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠা পূর্ণ মানবজীবনকেই চকিতে তিনি কবিতায় উপস্থাপন করেন। তীব্র অনুভবের আবেগে কবিতার ছত্রে ছত্রে একটি মানুষের মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। বাঙলা কবিতার নতুন কাব্যরূপ নির্মাণের এই যুগে এই বিদেশী

কবিভ্রাতার কাছ থেকে অনেকে নতুন আলোক পাবেন আশা করি।”

“কবিতা”, একতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক সংকলন ১৩৬০, পৃ ৮৯।

+ +

‘কবিতাসংগ্রহ’ ১ম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে ‘নাজিম হিকমতের কবিতা’-র বিশ্ববাণী সংস্করণের তিনবার পুনর্মুদ্রণের উল্লেখ করা হয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬-র চতুর্থ মুদ্রণের সঙ্গে তুলনা করে যে-পরিবর্তনগুলি চোখে পড়ে তা নিচে উল্লেখ করা হল :

১. প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত কবিতার সংখ্যা ছিল ২২। পুরো তালিকাটি ‘কবিতাসংগ্রহ’ ১ম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে উদ্ধৃত করা আছে। ১৩৮৬-র চতুর্থ মুদ্রণে কবিতার সংখ্যা ১৯। এই মুদ্রণে “কলকাতার বাঁড়ুজ্যে”-র পরের কবিতাই “আহম্মদ ড্রাইভার”। প্রথম সংস্করণে এর মধ্যে আরো তিনটি কবিতা ছিল : “বিদায়”, “শেখ বদরুদ্দিনের মহাকাব্য থেকে”, “রবিবার”। অন্যান্য কবিতার ক্রম অপরিবর্তিত। ‘কবিতাসংগ্রহ’ ১ম খণ্ডের ক্রমবিন্যাসের সঙ্গে অনেকটাই তফাত দাঁড়াল। এই তিনটি কবিতাই কবিতাসংগ্রহে আছে এই বিন্যাসে : “বিদায়”, “রবিবার”, “শেখ বদরুদ্দিনের মহাকাব্য থেকে”। অন্যান্য তফাত প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে উল্লেখ করা আছে।

২. প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে মূল রচনা হিসেবে ‘নাজিম হিকমত’ ও ‘অনুবাদ প্রসঙ্গে’ শিরোনামে দুটি অংশ মুদ্রিত হয়েছিল। আলোচ্য চতুর্থ মুদ্রণে এই দুটি অংশ একই শিরোনামে আছে, তবে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ‘নাজিম হিকমত’ অংশে প্রথম অণুচ্ছেদের শেষে এই বাক্যটি সংযোজিত ছিল : “বিশ্বশান্তি সংসদ সম্প্রতি তাঁকে ‘শান্তি পুরস্কার’ দিয়ে সম্মানিত করেছে।” তৃতীয় অণুচ্ছেদের প্রথম বাক্য ছিল : “নাজিম হিকমতের জন্ম সম্ভ্রান্ত বংশে হলেও তাঁর জীবন প্রথম থেকেই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মুক্তি সংগ্রামে।” সপ্তম অণুচ্ছেদের শেষ বাক্য ছিল : “সেই সঙ্গে কবিতায় নতুন আঙ্গিক, অভিনব চিত্র, বিশেষণ আর উপমা ব্যবহারেরও পথনির্দেশ পান।” অষ্টম অণুচ্ছেদের শেষ বাক্যের শেষাংশ ছিল : “তাঁর নিজের বয়সের চেয়েও অনেক বেশি।” নবম অণুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্য : “পরে তাঁকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতে হয় জাহাজের রুদ্ধদ্বার পায়খানায়।” এই অংশটির সব শেষে এই একটি নতুন বাক্য যোগ করা ছিল : “হিকমতের

কবিতাই তাঁর জীবন, জীবনই তাঁর কবিতা।"

'অনুবাদ প্রসঙ্গে' শিরোনামে প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দুটি অণুচ্ছেদ মুদ্রিত হয়েছিল। আলোচ্য চতুর্থ মুদ্রণে ঐ শিরোনামে দ্বিতীয় অণুচ্ছেদের সঙ্গে নিচে উদ্ধৃত করা অংশটুকু যোগ করা ছিল :

"হিক্‌মতের কবিতা অনুবাদ করতে করতে একটা কথা কেবলই মনে হয়েছে—যদি মূল ভাষায় কবিতাগুলো পড়তে পারতাম। বাংলায় তার অনুবাদ তাতে হয়ত আরেকটুকু যথাযথ হতে পাবত। চেষ্টা করেও হিক্‌মতের কবিতার প্রাণবন্ত সুর বজায় রাখতে পারি নি। সভয় শ্রদ্ধায় ছায়ার মত পায়ে পায়ে চলবার চেষ্টা করেছি। তাতে বহুক্ষেত্রে নিজেরই অজ্ঞাতসারে অনুবাদের মধ্যে আড়ষ্টতা এসেছে। আগাগোড়া কালানুক্রমে কবিতাগুলো সাজানো সম্ভব হয়নি। নামকরণের ব্যাপারে কিছু ব্যতিক্রম করতে হয়েছে। এসব ত্রুটির কথা জেনে-শুনেও আশা করছি, এই অনুবাদ বাঙালী পাঠকের মনে নাজিম হিকমতের কবিতা সম্পর্কে আগ্রহ জাগাবে।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৩. 'নাজিম হিকমতের কবিতা' শিরোনামে নাজিম হিকমত স্বাক্ষরিত যে-অংশটা 'কবিতাসংগ্রহ' ১ম খণ্ডে ছাপা হয়েছে আলোচ্য চতুর্থ মুদ্রণেও সে-অংশটা ছিল। সেখানেও সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় অণুচ্ছেদের দ্বিতীয় বাক্য চতুর্থ মুদ্রণে ছিল : "এমন ভাষায় তিনি লেখেন—যা বানানো নয়, মিথ্যা নয়, কৃত্রিম নয় ;…" 'মিথ্যা নয়' অংশটুকু এখানে বাড়তি যোগ করা ছিল।

ঐ অণুচ্ছেদের শেষ বাক্য চতুর্থ মুদ্রণে ছিল : কবিরা তো ভ্রষ্ট নন যে, তাঁরা মেঘের রাজ্যে পাখা মেলবার স্বপ্ন দেখবেন ; কবিরা হলেন সমাজের একজন, —জীবনের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত, জীবনের তাঁরা সংগঠক।"

\+ \+

'নাজিম হিকমতের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে সম্প্রতি কমলেশ সেন-এর অনুবাদে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটির পরিচয় : পরিবেশক—নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৪০০, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। প্রকাশক—সমীরকুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং, ২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলকাতা—৭০০০২৯। প্রচ্ছদপট—গৌতম রায়। মুদ্রাকর—পি. কে. পাল, শ্রী সারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯। দাম—৩০ টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৭। পেছন মলাটের একটি কবিতা নিয়ে মোট ৭৪টি কবিতার সংকলন। দুটি বই মিলিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনূদিত কবিতার সংখ্যা ৪৯। এর বাইরে অবশ্য ওঁর অনুবাদে নাজিম হিকমতের আরো একটি কবিতা আছে—"নাজিম হিকমতের নিজের কবিতা প্রসঙ্গে"। এ কবিতাটি 'জল সইতে'-র অন্তর্গত।

\+ \+

'নাজিম হিকমতের আরো কবিতা'-র অন্তর্গত প্রথম কবিতা "মাথা উঁচু করে" ইংরেজি অনুবাদে "9. 10 P.M. Poems" এই নামে একটি দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ। কবিতাটি Randy Blasing and Mutlu Konuk অনূদিত *The Epic of Sheik Bedreddin and other poems* (Persea Books, New York, 1977) নামের সংকলনে যে-রূপে পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে বাংলা অনুবাদের চেহারার বেশ খানিকটা তফাত আছে। বাংলা অনুবাদে প্রথম তারিখ সংবলিত অংশ ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ থেকে শুরু হচ্ছে। ইংরেজি অনুবাদে এর আগে আরো দুটো অংশ আছে। প্রথমটি তারিখবিহীন, শুরু হচ্ছে এইভাবে: How beautiful to remember you : / amid news of death and victory,/ in prison,/and when I'm past forty.../। দ্বিতীয় অংশের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, শুরু হচ্ছে এইভাবে : At this late hour/this fall night/ I am full of your words : /। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখের একটি অংশ বাংলা অনুবাদে নেই। ছোট্ট এই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি :

The most beautiful sea
hasn't been crossed yet.
The most beautiful child
hasn't grown up yet.
Our most beautiful days
we haven't lived yet.
And the most beautiful words I wanted to tell you
I haven't said yet...

এর পরে ২৫শে সেপ্টেম্বর চিহ্নিত বাংলায় যে-অংশটা আছে সেটা ইংরেজি অনুবাদে ২৫ সেপ্টেম্বর,১৯৪৫ অংশের অনুবাদ নয়, সেটা ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ তারিখ সংবলিত অংশের অনুবাদ। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর, ১ অক্টোবর, ২ অক্টোবর চিহ্নিত তিনটি অংশ বাংলা অনুবাদে বর্জিত। আবার ৬ অক্টোবরের পর

৭ অক্টোবর, ৮ অক্টোবর অংশ বর্জিত। বাংলা অনুবাদের শেষ অংশ ৯ই অক্টোবর। এটা ইংরেজি অনুবাদের ৯ অক্টোবর, ১৯৪৫ অংশের অনুবাদ নয়, এটা ইংরেজিতে The Fourth of December of 1945—চিহ্নিত অংশের অনুবাদ। তার আগে ইংরেজিতে ১০ অক্টোবর, ১৮ অক্টোবর, ২৭ অক্টোবর, ২৮ অক্টোবর, ৫ নভেম্বর, ৮ নভেম্বর, ১২ নভেম্বর, ১৩ নভেম্বর ও ২০ নভেম্বর ১৯৪৫-চিহ্নিত অংশগুলি আছে। আর পরে আছে ৫, ৬, ৭, ১২, ১৩ও ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৫—চিহ্নিত অংশগুলি।

এই সংকলনের আর একটি দীর্ঘ কবিতা "চানকিরি জেল থেকে চিঠি"। ইংরেজি অনুবাদেও বাংলা অনুবাদের মতো পাঁচটি অংশই রয়েছে, বর্জনের নমুনা কিছু নেই এখানে। কেবল তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশের নিচে ইংরেজি অনুবাদে তারিখ দেওয়া আছে যথাক্রমে 7. 10. 1940, 8. 12. 1940 ও 10. 26. 1940।

কবিতায় উল্লেখিত দু-একজন ব্যক্তির পরিচয় :

গজলী (মৃ. ১৫৩৪), বুর্সার অটোমান কবি।

পিরায়ে, নাজিম হিকমতের দ্বিতীয় স্ত্রী।

মুনেভার আন্দাক্, নাজিম হিকমতের তৃতীয় স্ত্রী ; তুর্কি সরকার তাঁর স্বামীর কাছে যাবার জন্য তাঁকে বিদেশ যাত্রায় বাধা দেন।

মেমেৎ, নাজিম হিকমতের পুত্র, জন্ম ১৯৫০।

ভেরা তুলিয়াকোভা, জীবনের শেষ কয়েক বছর নাজিম হিকমত এঁর সঙ্গে বাস করতেন।

আবিদিন দিনো, তুর্কি শিল্পী, নাজিম হিকমতের অনেক বইয়ের অলংকরণ এঁর করা।

৪ একটু পা চালিয়ে, ভাই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯। প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৭৯, তৃতীয় মুদ্রণ—জানুয়ারি ১৯৮৪, চতুর্থ মুদ্রণ—এপ্রিল ১৯৮৭। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি স্কীম নং ৬ এম, কলিকাতা-৫৪ থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ : বিপুল গুহ। মূল্য : ১০ টাকা।

উৎসর্গ : গানে রেকর্ড-করা কিন্নরকণ্ঠ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বন্ধুবরেষু। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৮। ৪৪টি কবিতার সংকলন :

১ আনন্দ
২ সাধ
৩ আজ আছি কাল নেই
৪ গোলকধাম
৫ হিংসে
৬ মরুভূমির হাওয়ায়
৭ হয় না
৮ এখন
৯ বাইরে থেকে ভেতরে
১০ টুল
১১ শুভরাত্রি
১২ যেখানে ব্যাধ
১৩ টলতে টলতে
১৪ যাব না সভায়
১৫ হিকোরি চিকোরি
১৬ ঝুলতে ঝুলতে
১৭ না কী বলেন
১৮ জাগ্রত
১৯ সাজা চাই
২০ বাঘের আঁচড়
২১ কমলেকামিনী
২২ কোথায়
২৩ কথার ঝুড়ি
২৪ রাস্তা
২৫ যা তাই
২৬ রক্তবীজ
২৭ সরলা বসুর জন্যে
২৮ শের জঙ্গ-এর ডেরায়

২৯ কিউবার কৃষ্ণাঙ্গকীর্তন

৩০ বোবা ছেলেটা

৩১ মাকড়সা

৩২ জনগণ

৩৩ তুষার ঝঞ্ঝা

৩৪ চাকরান কুলি

৩৫ ইয়েসেনিনের গ্রামদেশে

৩৬ এক কবির শব

৩৭ নেভা নদীর ধারে শহর

৩৮ সেগদেন সায়র

৩৯ হলধরের গান

৪০ ঠাকুরমার ঝুলি

৪১ একটু পা চালিয়ে, ভাই

৪২ দিক্‌ভুল

৪৩ বদ্‌লায়

৪৪ পাতাল রেল

১৯৭২-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'ছেলে গেছে বনে'। সাত বছর পরে আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক কবিতা সংকলন প্রকাশিত হল 'একটু পা চালিয়ে, ভাই'। এর মাঝখানে প্রকাশিত তিনটি কবিতার বই-ই অনুবাদ কবিতার সংকলন। 'পাবলো নেরুদা-র কবিতাগুচ্ছ', 'রোগা ঈগল' ও 'নাজিম হিকমতের আরো কবিতা' বর্তমান খণ্ডের অন্তর্গত।

মূলত মৌলিক কবিতার সংকলন বটে, তবে 'একটু পা চালিয়ে, ভাই'-এর ৪৪টি কবিতার মধ্যে ১১টি আছে বিভিন্ন কবির কবিতার অনুবাদ। উপরোক্ত তালিকার ২৯ থেকে ৩৯-সংখ্যক কবিতাগুলি অনুবাদ। এই অনূদিত কবিদের মধ্যে আছেন ফেদেরিকো গার্থিয়া লর্কা, সেজার ভায়েহো, তু ফু, সি. এফ. এণ্ড্রুজ, আলেকজান্দার সলঝেনেৎসিন ও ভাল্লাথোল। "কিউবার কৃষ্ণাঙ্গকীর্তন" ও "বোবা ছেলেটা" লর্কার এই দুটি কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হরবোলা' (বসন্ত ১৩৮৩)-য়। সেজার ভায়েহো-র "মাকড়সা" ও "জনগণ"ও প্রথম প্রকাশিত 'হরবোলা'-র ঐ সংখ্যাতেই। "ইয়েসেনিনের গ্রামদেশে", "এক কবির শব", "নেভা নদীর ধারে শহর" ও "সেগ-

দেন সায়র" আলেকজান্দার সল্‌ঝেনেৎসিনের এই চারটি কবিতার প্রথম প্রকাশ : দিলীপকুমার গুপ্ত সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' (বর্ষ ৩৩, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮)। প্রথম প্রকাশিত চেহারার সঙ্গে পংক্তিবিন্যাসে সামান্য একটু আধটু তফাত আছে।

৫ পাবলো নেরুদার আরো কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯। প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৮৭, প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়। প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মুদ্রক : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম : ছ'টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪। ১৮টি কবিতার সংকলন :

১ আর কিছু নয়
২ মৎস্যকন্যা আর একদল মাতালের উপাখ্যান
৩ আমরা বিস্তর
৪ বড় বেশি নাম
৫ আমি চাই স্তব্ধতা
৬ ভয়
৭ পাথরের মুখ
৮ স্মৃতি
৯ হে পৃথিবী দাঁড়াও
১০ প্রাচ্যদেশে ধর্ম
১১ কবিতার ব্যাপার
১২ আস্তেরিও
১৩ টগবগিয়ে দক্ষিণে
১৪ নড়ছি না
১৫ পতাকা
১৬ টমেটোর ভজন
১৭ কুড়ের বাদশা
১৮ পলাতক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে পাবলো নেরুদার কবিতার দ্বিতীয় সংকলন এই বই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পাবলো নেরুদার অনুবাদে তিনি হাত

দিয়েছিলেন গদ্য রচনার একঘেয়েমি কাটাতে। একথা সম্ভবত দ্বিতীয় সংকলন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। এই দ্বিতীয় সংকলনে কবির পরিচয় হিসেবে "নেরুদার জীবন ও কবিতা" এই শিরোনামে একটি গদ্য অংশ ছিল। এই সংক্ষিপ্ত রচনায় নেরুদার কাব্যগ্রন্থগুলির একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। 'কান্তো হেনেরাল', 'স্পেন আমার হৃদয়ে', 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা' প্রভৃতি বইয়ের অংশবিশেষ বর্তমানে বাংলা অনুবাদে আমরা পাই। সমগ্র বই হিসেবে পাই কেবল 'হোয়াকিম মুরিয়েতার মহিমা ও মৃত্যু'। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে 'হোয়াকিন মুরিয়েতার মহিমা ও মৃত্যু' (অনুষ্টুপ, কলকাতা) নামে এই অপেরা-ধর্মী রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে পৌষ ১৩৯৭ / জানুয়ারি ১৯৯১-তে।

এই সংকলনের অন্তর্গত "পতাকা" ও "টমেটোর ভজন" কবিতাদুটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বসন্ত ১৩৮৩-র 'হরবোলা' সংকলনে। পাঠভেদ কিছু নেই, কেবল "পতাকা"-র শেষ লাইনে 'কিন্তু চড়া শীতে, মাছটা নিয়ে সেই পতাকাটা দাপাতে দাপাতে উঠে গিয়ে ঠাণ্ডায়,…' এর মধ্যে 'দাপাতে' কথাটা একবার ছিল। স্পষ্টত ছাপার ভুল।

"পলাতক" নামের দীর্ঘ কবিতাটি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন বারোটি অংশে। Jack Schmitt অনূদিত *Canto General* (University of California Press)-এর ১৯৯১-সংস্করণে "The Fugitive" নামের কবিতাটি আছে মোট তেরোটি অংশে। শেষ অংশ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে বর্জিত। বর্জিত হয়েছে ১২নং অংশের শেষ স্তবকটিও। ছোট এই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি :

To all, to all,
to whomever I don't know, to whomever never
heard this name, to those who dwell
all along our long rivers,
at the foot of the volcanoes, in the sulphuric
shadow of copper, to fishermen and farmhands,
to blue Indians on the shores
of lakes sparkling like glass,
to the shoemaker who at this very hour questions,
nailing leather with ancient hands,
to you, to the one who unknowingly has awaited me,
I belong and acknowledge and sing.

৬ জল সইতে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। প্রথম সংস্করণ—মে ১৯৮১। প্রচ্ছদ: সুনীল শীল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। মূল্য—৬ টাকা। উৎসর্গ: শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়কে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬১। ২৫টি কবিতার সংকলন:

১ বোবা কোকিল
২ হটাবাহার
৩ তো
৪ বোনটি
৫ জীবনে প্রথম
৬ বসে আছি
৭ হাওয়া
৮ শেষ বাজি
৯ তুঘলক লেনে
১০ আগুন লাগলে
১১ খালি হাত
১২ ছেলেধরা
১৩ দাঁড়াও পথিকবর
১৪ এক ঢিলে
১৫ এজেন্ট আবশ্যক
১৬ বিফলে মূল্য ফেরত
১৭ সুলভে গৃহশিক্ষক
১৮ রক্ষাকবচ
১৯ চিৎ
২০ এইটুকু
২১ একজন মানুষের খুব বেশী কিছু চাই না

২২ একটি সংলাপ

২৩ নাজিম হিকমত-এর নিজের কবিতা প্রসঙ্গে

২৪ জল সইতে

২৫ যাচ্ছি

বইটির একটি দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৮৪-তে। এটি মুদ্রণ মাত্র, কোনো নতুন সংস্করণ নয়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, 'জল সইতে'-র অন্তর্গত নাজিম হিকমত-এর একটি অনুবাদ কবিতা রয়েছে। মূলত মৌলিক এই কবিতা-সংকলনে আরো তিনটি অনুবাদ কবিতা স্থান পেয়েছে। রবার্ত্‌ রোজদেস্ত্‌ভেন্‌স্কি-র এই কবিতা তিনটি হল "এইটুকু", "একজন মানুষের খুব বেশি কিছু চাই না" ও "একটি সংলাপ"। প্রসঙ্গত বইয়ের সূচিপত্রে বানান আছে 'বেশী', বইয়ের ভেতরে কবিতার শিরোনামে বানান আছে 'বেশি'।

৭ চইচই-চইচই

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নাভানা, পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা-৭২। পরিবেশক: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩। প্রকাশক: শ্রীকুনালকুমার রায়, নাভানা। প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩৮৯, মার্চ ১৯৮৩। মুদ্রক: শ্রীবিকাশ হাজরা, বিষ্ণু প্রিন্টিং হাউস, ৩৮/১এ হরীতকীবাগান লেন কলকাতা-৬। প্রচ্ছদশিল্পী: শ্রীশৈবাল মিত্র। দাম: দশ টাকা, £ 1·50, $ 2·30। উৎসর্গ: পুপে তোতা পাপু, আমার আর গীতার এই তিন কন্যাকে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫০। ২২টি কবিতার সংকলন:

১ দেয়ালে লেখার জন্যে (অপিসে কাজ না ক'রে—)

২ সুখটান (বাঁচার গর্বে)

৩ মাঝরাস্তায় (তোমার কাছে / যাব ব'লে)

৪ অন্ধকার গিলে খাচ্ছে (চলচ্ছক্তিহীন পাখা)

৫ গুরুভাই (পৃথিবী, মানুষ, এই অন্ধকার···)

৬ এই যে (এই যে এইখানে আছি)

৭ অন্ধকারে (আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে)

৮ খেলা (খেলনাগুলো পড়ে রইল)

৯ ভানুমতীর খেল (সাদার গায়ে ছিটানো কিছু কালি)

১০ চিৎ (বুড়োর কানের কাছে এনে মুখ)

১১ মুখরোচক (ফুলঝাড়ু তার হাতের থাবায়)

১২ গৃহস্থ হও (চালচুলোহীন, ওরে ও হা-ঘরে,)

১৩ জল নেমে গেলে পলি (দেবতার থানে ধ'রে দিয়ে পাঁচসিকে)

১৪ চইচই-চইচই (ফুটপাথে গাছের নিচে)

১৫ অগত্যা (তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা বুড়ো)

১৬ পেঁয়াজি (শক্তি বেশ বলে—)

১৭ ছবির মতো (পা দিয়ে আল্‌তো ক'রে)

১৮ তোমার যদি কম হয় (একা কিংবা লোকের ভিড়ে)

১৯ কেল্লা (কোন্‌টা ভাঁটি আর কোন্‌টা উজান)

২০ 'নয়-ছয়' নাটকের গান (হরদম / দিয়ে দম)

২১ লাতভিয়ায় লোকমুখে (মৌমাছিতে পৌঁছিয়ে দেয়)

২২ যুদ্ধের পর : অন্ধ শিল্পীর ছবি দেখানো (···দেখুন, আমার এই)

এই সংকলনেরও শেষ কবিতাটি অনুবাদ কবিতা। কবি মারিস চাকলাইস।

'চইচই-চইচই'-এর অন্তর্গত "চিৎ" কবিতাটি ১৯৮১-তে প্রকাশিত 'জল সইতে'-র মধ্যেও ছিল। বর্তমান 'কবিতাসংগ্রহ' ৩য় খণ্ডে এই কবিতাটি 'চইচই-চইচই' থেকে বাদ দিয়ে 'জল সইতে'-র মধ্যেই কেবল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

\+ \+

১৯৭৩-৮৩ এই কালপর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা তুলনায় একটু কম। তবুও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও মন্তব্য এখানে সংকলন করা হল।

"পেঁয়াজি" কবিতার যে-'শক্তি বেশ বলে—/পদ্য' সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবির তিয়াত্তর বছরে পদার্পণ উপলক্ষে নমস্কার জানাতে গিয়ে বলেন :

> "গত কয়েক বছরে সুভাষদা গুটি কয়েক সাংঘাতিক কবিতা লিখেছেন ; তার মধ্যে দুটো লেখার কথা আমাকে বলতেই হবে। প্রথমটি 'যাচ্ছি' আর দ্বিতীয়টি 'একটু পা চালিয়ে ভাই'। যাচ্ছি কবিতার মধ্যে এমন একটা চাপা বিদায়ের সুর আছে, যা খুব কম কবির হাত দিয়ে বেরোতে পারে। এ কালের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'যাচ্ছি'
>
> ও মেঘ
>
> ও হাওয়া

ও রোদ
ও ছায়া
যাচ্ছি

আট পৃষ্ঠার এই কবিতা যেমন সহজ, তেমনি কঠিন। নয়তো লেখাই যেতো না 'ও দেহ, ও প্রাণ যাচ্ছি।' পড়তে পড়তে গোটা কবিতাটি একটা মন্ত্রের মতো লাগে। এই ভালোবাসা, এই বিদায়—এখন সুভাষদার কবিতায় লেগেছে।

'একটু পা চালিয়ে, ভাই' কবিতাটির মধ্যে আমরা পাচ্ছি—'কথাটা হল, কে কিভাবে দেখে, কখন কোনখানে দাঁড়িয়ে।' এই হল কবিতা কী হয়ে উঠতে পারে, তার একটা লক্ষণ।"

[তিয়াত্তরে পা দিয়ে নিশ্চিন্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ এপ্রিল ১৯৯২]

আবার প্রায় বিপরীত মেরুর এক বোধ আমরা পাই নিচের সংলাপে :

"অলোকরঞ্জন :···সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতা আমার কাছে 'বানানো' বলে মনে হয়েছে···দুঃখের সঙ্গে বলছি·· এমন কি 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'-এর মধ্যের একটা ইস্তাহার এসে আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায়···এই ব্যাপারটা ছিলো··· ট্রান্স ছিলো···মনে হয় ওঁর ঝুলি বোধহয় উজাড় হ'য়ে গেছে···এখন ওঁকে ঝুলি ভরতে হবে।

কালীকৃষ্ণ : সব ছাপা হবে কিন্তু।

অলোকরঞ্জন : নিশ্চয়ই···

কালীকৃষ্ণ : ওঁর 'যাচ্ছি' কবিতাটা পড়েছেন ?
'ওগো পানের খিলি, যাচ্ছি' ইত্যাদি।

[প্রসঙ্গত, লাইনটা হচ্ছে 'ও পানের খিলি / ভিড়, নিরিবিলি / যাচ্ছি, ওগো পানের খিলি' নয়। সম্পা : 'কবিতাসংগ্রহ-৩']

মৃণাল : বোধ হয় এই কবিতাটি সুভাষদার শেষতম কাব্যগ্রন্থের। কোথায় যেন নিজেকে একধরনের নিবেদনের ব্যাপার আছে···একটা resign করার ব্যাপার আছে···একটা বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি বা ঘোষণা এবং যেন ঈশ্বর বিশ্বাসের এক ধরনের আভাস, ইঙ্গিত অনুভব করা যায়···ঠিক সুভাষদার মতো একজন মার্কসিস্ট-এর পক্ষে এটা যেন অন্যধরনের একটি উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা···এটা মনে হয় কবিতাটি পড়লে···একটা compromise করছেন সুভাষদা···

কালীকৃষ্ণ : কেন মার্কসিস্টরা কি resign করতে পারে না ?...বা···

অলোকরঞ্জন : কেন এটা হচ্ছে বুঝতে পারছি··· । আমি এক সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খুব কাছাকাছি থেকেছি। দলের মধ্যে থেকেও উনি খুব একা মানুষ, নিঃসঙ্গ। আমার মনে হয়, সুভাষদার দলের সঙ্গে তাঁর যে বোঝাপড়া ···সে জায়গাগুলোতে তাঁর যে অতৃপ্তি রয়েছে তাই ফুটে উঠেছে তাঁর শেষ বইতে···অথচ ওঁর যে ইমেজটা তৈরি হয়েছে 'ফতোয়া দেবার কবি' সেটাকে পুরোপুরি ভাঙতে পারছেন না উনি···এই দুটোর ভাঙাচোরার ভিতর থেকে একটা উত্তরণ নিশ্চয় ওঁর বেরিয়ে আসবে, আসছে···আর তিনি ভয়ংকর কম লেখেন আজকাল এবং কম লেখার এই একটা অসুবিধে যে নিজেকে ভেঙেচুরে দেখা যায় না।"

['শিকড়সংলাপ' : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—ঘূর্ণিস্রোতে, সৃজনীসংরাগে, প্রতিভাস, ১৯৯১, পৃ. ১৮৩-৮৪]

'কম লেখা' প্রসঙ্গে একেবারে অন্যরকম একটা মন্তব্য অবশ্য পাই জগদীশ ভট্টাচার্যের আলোচনায়। তিনি লিখেছিলেন :

"কবির একষট্টি থেকে সত্তর বছর বয়সের মধ্যে আরো চারখানি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। 'জল সইতে' ১৯৮১, 'চইচই-চইচই' ১৯৮৩, 'বাঘ ডেকেছিল' ১৯৮৫ এবং 'যা রে কাগজের নৌকো' ১৯৮৯। কবিজীবনের প্রথম দিকে সুভাষের স্বল্পভাষিতা তাঁর অনুরাগী পাঠকমহলে অতৃপ্তির সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ষাট থেকে সত্তর,—এক দশকের মধ্যে চারখানি কাব্যগ্রন্থ উপহার পেয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন।"

["সুভাষ মুখোপাধ্যায়", 'আমার কালের কয়েকজন কবি', ভারবি, ১৯৯০, পৃ. ৩২৯]

পূর্বোক্ত 'শিকড়সংলাপ'-এর মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দের প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন বলছেন :

"গদ্য কবিতা মানে একটা আত্ম-মন্থনের বিন্যাস নয়—একটানা স্বগতোক্তির উল্লাস নয়, গদ্য কবিতার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ব্যক্তি বিশ্বের সঙ্গে বস্তুবিশ্বের একটা মোকাবিলা তার মধ্যে হয় এবং গদ্য কবিতা এই দিক থেকে ভালো আরও হতে পারে আমার মনে হয় এই কারণে···যেটা আপনাদের মধ্যে ···কারো মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি যে গদ্য কবিতার মধ্যে প্রাত্যহিক কথ্য-বুলি অনায়াসে তুলে আনা যায়···আর আত্মঅতিক্রান্তি হয় তারি মধ্যে একটা

ছন্দ আছে···যেটা আমরা এখনো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী কোনো কোনো কবিতায় পাই, যদিও তিনি কখনো কাব্যছন্দ থেকে বেরিয়ে আসেন নি।" [ঐ, পৃ. ১৬৫]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দ প্রসঙ্গে আমরা আরো কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য পাই নিচের কাল্পনিক সংলাপে :

[ক চ ট ত প-এর এই আসর। প আর ট দুই পাঠক, ক আর ত দুই কবি, চ ছান্দসিক।]

ক। কিন্তু কথা বলবার চালের মধ্যেই যে ছন্দ লুকোনো আছে, চলমান সেই ধ্বনিস্রোতের মধ্যেই যে একটা প্যাটার্ন বার করা যায়, এইটেতেই তো আধুনিকতার একটা বড় শিক্ষা। আপনারা লক্ষ করেননি যে মাইকেল থেকে বস্তুত সেই চেষ্টাই হয়ে আসছে একাল পর্যন্ত। মাইকেল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। সেই চেষ্টাটা থমকে যায়নি যে এখনো, কথা বলবার সেই স্পন্দনের সঙ্গে কবিতার ছন্দকে মেলাবার যে খেলা চলছে কবিদের হাতে এখনো, এটাই তো গর্ব করে বলবার। আজ যদি কেউ লেখেন 'বয়ে গেছে কারো কোনো কথায় কান দিতে' বা 'জোড় করে রয়েছি দুটো হাত' 'কোন্ চুলোয় গেল সেই শুভরাত্রি'—

প। কার লাইন এসব ?

ক। এই যে হাতের সামনে এবারকার পুজো সংখ্যা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই নতুন লেখা। তো এসব পড়ে আজ এতকাল পরেও যদি ধাঁধা লাগে কারো, তার কারণটা কী ? কারণ হলো, কবিতা পড়তে গেলেই আমরা একটা কৃত্রিম পাটাতন তৈরি করে নিই, তার ওপরে দাঁড়িয়ে শব্দগুলিকে কাব্যিক ঝোঁকে ধরবার একটা চেষ্টা করি। 'জোড় করে', 'কোন্ চুলোয়' বা 'কান দিতে' বা এই রকমের আরো অনেক শব্দগুচ্ছ আমাদের চলতি উচ্চারণে যে জুড়ে যায় অনায়াসে, সেটা কেন খেয়াল করব না আমরা ?

[শঙ্খ ঘোষ—'ছন্দোপকথন' ১৯৮২ ; কবিতালেখা কবিতা পড়া, ১৯৮৯, পৃ. ৩২]

এই আলোচনার প্রাসঙ্গিক কবিতা হল 'চইচই-চইচই'-এর "এই যে"। উল্লেখ করা অংশ তিনটি এই রকম :

"তাড়াতে পারি না মাছি
জোড় ক'রে রয়েছি দুটো হাত।
দিয়ে যাচ্ছি সমানে জানান—"

"কানে আসছে শুধুমাত্র ঘেউ-ঘেউ কেঁউ-কেঁউ।
কোন্ চুলোয় গেল সেই শুভরাত্রি
কোথায় সেসব সুপ্রভাত?"

"ষাঁড়ের মতন তাড়া করে ফিরছে
পেছনে সময়।
সারাক্ষণ ছুটছে লোক।
একেবারে গ্রাহ্য নেই
বয়ে গেছে কারো কোনো কথায় কান দিতে।"

\+ +

১৯৮৩-তে প্রকাশিত প্রবন্ধে চল্লিশের কবিতা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বলছেন:

"চল্লিশের দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দুজন: সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সমর সেনের কথাও আমার মনে আছে, কিন্তু তাঁর কবিতা এখন প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো পড়ে আছে, যার সঙ্গে বাঙলা কবিতার সচল অংশের যোগাযোগ খুব স্পষ্ট নয়।

মুখের ছিপছিপে, সরু কথাকে প্রায় বেতের মতো ব্যবহার করতে পারেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এবং তাঁর উজ্জ্বল, বর্ণিত শব্দের শাণিত ব্যবহার বাঙলা কবিতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্য একটি তুলনা দেয়া চলে: তাঁর কবিতার শব্দ ছিপ্-নৌকোর মতো কবিতাটিকে নিয়ে দৌড় দিতে পারে, কোথাও গুরুভার হয়ে পথ জুড়ে থাকে না। ইমেজিষ্টদের জন্যে লেখা পাউণ্ডের সেই বিখ্যাত ফতোয়ায় এই গুণটির উল্লেখ ও সমর্থন আছে, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাকর্মে এই গুণটির বিবর্তন লক্ষণীয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার এই বিশেষ গুণটি নির্দেশ করলুম এ জন্যে যে হালের বাঙলা কবিতায়, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও, এই বস্তুটির অভাব চোখে পড়ে। শব্দের প্রতি মোহ যে কোনো কবিরই নাড়ির দুর্বলতা, কিন্তু সেই

দুর্বলতা যদি কবিতার সমগ্র শব্দসমষ্টির প্রতি সমানভাবে বর্ষিত না হয়ে একাধিক একক শব্দের ওপর ঘটে থাকে, তা হলে কবিতাটির মূল অভিঘাত বিঘ্নিত হতে বাধ্য। চলতি, মৌখিক সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহারের সুবিধে এই যে কবি এই আপাত-নিস্তাপ শব্দসেজ থেকে যে কোনো অর্থ জ্বালিয়ে নিতে পারেন, এবং প্রতিটি শব্দের স্বতন্ত্র অনুষঙ্গ কবিতাটির সম্পূর্ণ অনুষঙ্গের সম্পূরক হয়ে ওঠে। নইলে এক একটি বিচ্ছিন্ন শব্দ যতই রূপময়, অনুষঙ্গাতুর হোক না কেন, শব্দবিশেষের পক্ষে যা গৌরব মনে হতে পারে পুরো কবিতাটির পক্ষে তাকেই সৌন্দর্যনাশী মনে হবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আরো একটি গুণ হল তাঁর মানবিকতা বা মানবিক সমবেদনা। তিনি সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চান না—তিনি চান মানুষের সঙ্গে, জনতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকতে। 'আমার কাজ' ['কাল মধুমাস'] কবিতায় তাঁর সমগ্র জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে মনে হয় :

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।

আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।

কিন্তু জনগণকল্যাণের কথা লিখলেও, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আমাদের গভীরতম অনুভূতিকে স্পর্শ করে না। জন্ম-জীবন-মৃত্যুর যে জটিল রহস্য আমাদের অস্তিত্বে আস্তীর্ণ হ'য়ে আছে, তার বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই তাঁর কবিতায়। তিনি অত্যন্ত নিপুণ কবি, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি অনেকটাই ওপর ওপর বলে মনে হয়।"

[প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত—'চল্লিশের কবিতা', আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক কবিতার ইতিহাস, ১৯৮৩, পৃ. ১২৬-২৮]

তাঁর সমসাময়িক সমর সেন লিখছেন :

"গণআন্দোলনে যোগ দিয়েও অনেকে লেখক হিসেবে মহান হতে পারেন নি; পার্টির ভাবাদর্শ অনেক সময় বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। এর জন্য দায়ী অবশ্য গণআন্দোলন নয়, 'লাইন' বেঠিক হলে আন্দোলনে যোগ দিয়েও ব্যর্থতা আসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান লেখক পার্টির প্রভাবে কোন মহারচনা করতে পেরেছিলেন? তাঁর বিচ্ছিন্ন ডায়েরিতে একটা অবিশ্বাসের ভাব তো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিরিশের দশকে ও পরে কবিদেব মধ্যে সহজ ও বলিষ্ঠ ভাষায় লেখেন সুভাষ, সুকান্ত, পার্টির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু মাও থেকে মেয়াওতে সুভাষের উত্তরণ যুগান্তকারী কিছু একটা হয়নি এবং সুকান্ত বেঁচে থাকলে মস্কোমুখী সি পি আই-এর জালে আটকে পড়ার যথেষ্ট ভয় ছিল।"

[সমর সেন : 'বাবু বৃত্তান্ত', ১৯৭৭/৭৮, পৃ.১৩৯]

কবিতা, কবিতার 'শুদ্ধতা', পার্টি, রাজনীতি, মানবিকতা ইত্যাদি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ে আলোচক-সমালোচকদের নানারকম মনোভঙ্গির পরিচয় মেলে। চল্লিশের দশক থেকেই বাংলা কবিতাকে বেশ কাছের থেকে যিনি দেখেছেন সেই অশোক মিত্র 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবাব পরবর্তী সময় প্রসঙ্গে লিখছেন :

"প্রথম থেকেই সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগী অনুকারকের সংখ্যা প্রচুর। অনুরাগাধিক্যের উচ্ছ্বাসে শেষোক্তরা এত পরিমাণ নকলনবিশি নিকৃষ্ট লিখতে ব্যাপৃত হলেন যে তন্নিষ্ঠমনরা ভড়কে গেলেন : রাজনৈতিক ধুয়ো, যা সস্তা, কবিতার বৃহদায়তন দখল ক'রে রইলো, কবিত্ব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলো। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বরাবরই আদর্শবৎসল, অচিরেই তিনি অনুকারকদের অনুকরণে কবিতা মক্সো আরম্ভ করলেন।"

[অশোক মিত্র — "ভয়ে ভয়ে কয়েকটি কথা", ১৯৬৫ 'কবিতা থেকে মিছিলে,' প্যাপিরাস, ১৯৮৯, পৃ. ৩৬]

"ঠিক যে-মুহূর্তে সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্লোগানের গহনতায় ডুবে গেলেন, এবং সমর সেন নীরব হবার সিদ্ধান্তে পৌছলেন, বাংলাদেশের পাঠকেরা, প্রায় অতর্কিতভাবেই যেন, জীবনানন্দ দাশকে আবিষ্কার করলেন।" [ঐ, পৃ. ৩৭]

জীবনানন্দকেও অনুকরণ করবার প্রবণতাকে অশোক মিত্র বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক কুপ্রভাব বলে মনে করেন। এবং সে-প্রবণতা প্রতিরোধে বুদ্ধদেব বসুও

ব্যর্থ, কারণ :

“নিজের উপর বুদ্ধদেব অনেকটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সম্পাদক হিসেবে তাঁর প্রধানতম কর্তব্য ছিল অকম্পিত, অবিচলিত, সম্পূর্ণ আবেগনিরপেক্ষ সমালোচনা। বাংলা কবিতার পক্ষে মস্ত দুর্ভাগ্য, ঐ মুহূর্তে ‘কবিতা’-সম্পাদক সে-দায়িত্ব পালন করলেন না। রাজনীতিপরাঙ্মুখতা (sic) হেতু সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যকলার বিরূপবিচারে বুদ্ধদেব সে-সময় মহা উষ্মার সঙ্গে ব্যস্ত-ব্যাপৃত।” [ঐ, পৃ. ৩৮]

এরপর আবার আস্তিকতায় প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে তিনি বলেন :

“অবলম্বনহীনতা থেকে কবিতা হয় না, বাংলা কবিতাকে বাঁচতে হ'লে কোনো আস্তিকতায় প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। আস্তিকতার জন্ম মৃত্তিকার মূল থেকে, পরিপার্শ্বের নিঃশ্বাস থেকে। বাংলাদেশের সমাজবিবর্তনের ধারাগুলি এড়িয়ে, সন্দেহসংশয়অবরুদ্ধবিপ্লব-আরক্ত সমাজব্যবস্থা ডিঙিয়ে, কবিতা অসম্ভব। কাব্যে অবৈকল্য যদি এখনো অন্বিষ্ট হয়, আমাদের ব্যাহত পাঠ ফের শুরু ক'রে অতএব ফিরতে হবে সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপলব্ধির উৎসে, জীবন এবং লোকপ্রেমের প্রত্যয়ে।” [ঐ, পৃ. ৩৯]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বাংলা কবিতার আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখতে চেয়েছেন অনেকেই :

“তা হলেই প্রশ্ন আসে, কি দিয়েছে যুদ্ধশেষের মাটি, স্বাধীনতার পরবর্তী কালের দেশ তার তরুণতর সাহিত্যিকদের ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন ২২শে শ্রাবণ থেকে স্বাধীনতা লাভের দিনটি পর্যন্ত যে সময়, সে সময়টুকুকে বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যা সময় বললেই চলে। এ সময়ের লেখক কবিদের কাছ থেকে গ্রহণ করার মতো কিছুই পায়নি অতি আধুনিক কবি সাহিত্যিকরা। তাই তাদের হাত বাড়াতে হয়েছে এক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব কাছে আর অনেকটা লাফ দিয়ে কিছুটা পরিমাণে ঐ অধ্যায়ের শেষদিকের সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে।”

[সত্য গুহ : একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল, অধুনা, ১৯৭০, পৃ. ১০০]

এই লেখক অবশ্য মনে করেন :

“তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইন্টিমেট পপুলারিটির কবি, আর এর দোষগুণ দুই-ই তাঁর কবিতাকে আঘাত করেছে।” [ঐ, পৃ. ২০৪]

শুধু তাঁর কবিতাকেই নয় :

"সুকান্তকে প্রায় কেউই সার্থকভাবে অনুসরণ করেন নি পরবর্তী কবিরা। তাঁরা পাঠ নিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এবং তথাকথিত প্রগতিপন্থী হয়ে —ডিরেক্ট ও ডেলিবারেট এবং কমিটেড লেখক হয়ে কবিতা রচনা সুরু করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চোখা কথা ও বক্র আক্রমণের প্রলোভন এবং অতি প্রত্যক্ষ আলম্বন বিভাব অস্বাভাবিক আকর্ষণী হয়ে তরুণ কবিদের অনেকের স্বকীয়ত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।" [ঐ, পৃ. ২০৬]

কবিতার 'দায়বদ্ধতা' নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে এ পর্যন্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ে তো বটেই। অরুণ সেন লিখছেন :

"দৈনন্দিন রাজনীতির নানাবিধ স্খলনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় একদা সংগতভাবেই বলেছিলেন তাঁর কবিতায় : এখন সেই সময়—যখন দূরেরটা স্পষ্ট দেখায়, কাছেরটাই ঝাপসা। ঐ কথাগুলোই কি ঘুরিয়ে বলা যায় না, রাজনৈতিক ও নান্দনিক চেতনায় কাছেরটাই আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছে, আর ততই দূরেরটা হয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট ?

* * *

"দায়বদ্ধ কবিতা বলে যা চলতি ছিল বা আছে তার গোলমালটা এখানেই : যে একবোখা আবেগকে সোজাসুজি প্রকাশের চর্চা চলছিল তার অনিবার্য পরিণতি বাস্তবের ছোট্ট এক-একটি ধাক্কায় সেই আবেগেরই অবসান। আবেগটাই যে দাঁড়িয়ে আছে দ্বৈতের কৌতুকে নয়, অভিজ্ঞতার দীপ্র জটিলতায় নয়, অপরিণত কোনো তাড়নায়। রাজনীতি সেখানে দৈনন্দিন রাজনীতিরই আলগা পোশাক, নন্দনের অন্তস্তলে দ্বান্দ্বিকের রক্ত-চলাচল নয়। যতই ঠাট্টা করে বলুন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গলায় কারো সব সময় বাজ ডাকবে এটা যেমন ভাবতে ভালো লাগে না, সুস্থতাও নয়, তেমনি তার প্রতিক্রিয়ায় গলা চিঁচিঁ করবে, এই বা কেমন ? কবিতা চায় কঠোরে-কোমলে মেশা উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বর। সেখানে কোনো নির্ঘোষই একচ্ছত্র নয়, কোনো নীরবতাই অনন্ত নয়।"

[অরুণ সেন—"রাজনীতি ও কবিতার ভুলভ্রান্তি", 'কবিতার দায় কবিতার মুক্তি', প্রতিক্ষণ, ১৯৮৫, পৃ. ৬৭-৬৮]

সম্ভবত এই সূত্রেই অরুণ সেনের মনে হয় :

"বোঝা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তলে-তলে একটা বদল ঘটে

যাচ্ছে। সহজ বিপ্লবী আশাবাদ থেকে তিনি গড়ে তুলতে চাইছেন মনের ভেতরকার জোর। ষাটের দশকে সত্তরের দশকে আশির দশকে সেটাই যেন তাঁর পক্ষে হয়ে ওঠে ক্রমশই দুর্বহ।"

[অরুণ সেন—"চল্লিশের পঞ্চাশের কবিতা", ঐ, পৃ. ১২৭]

ইংরেজি অনুবাদে শঙ্খ ঘোষের যে-প্রবন্ধের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে বোধহয় একটু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত পেয়ে যাই আমরা। সত্তরের দশক আমাদের এখানে এক প্রত্যয়ী ঘোষণায় ছিল 'মুক্তির দশক'। আবার ঐ সময়টা ছিল অন্য এক মুদ্রায় বাংলাদেশেরও মুক্তির সংগ্রামের সময়। সেই সময়ের কথায় :

"The old writers' haunt at 46 Dharamtala Street had disappeared ; but close by, another dilapidated house was set up as a meeting-place for poets, actors and musicians from East Pakistan. Here they rehearsed the songs which they would then sing round the city to raise funds for the resistance movement. They were looked after by the writers of Calcutta, led (to the detriment of his own health) by Dipendranath Banerji. In that house, Sanjeeda Khatun and Wahed-ul-Haq taught their troupe songs ; the film director Zaheer Raihan recounted his experience. Local writers would gather in the evening. One day, trudging up the dark stairs, Subhash Mukherji paused and recited to a junior some lines from *Pherai*, his long poem then in progress. 'It is turning out well ?' he asked. But the images evoked by *Pherai* were those of another agony, the Naxalite movement."

[পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২]

ঐ অন্ধকার সিঁড়িতে তখন তাঁর বোধে এই দুই সংগ্রাম কি মিলে যাচ্ছিল ?

"যৌবনের ফেরাই দিয়ে
হারিয়ে-যাওয়া নতুন বন্ধুরা আমার
সমানে জিতে নাও সৃষ্টির পিঠ

যাবার আগে যেন দেখে যাই
মেঘভাঙা রামধনু

ঢেলে সাজা পৃথিবীর বুকে
যেন শুনতে পাই
ভোরবেলার আজান ॥”

+ +

অনুবাদ কবিতা বিষয়ে সুবীর রায়চৌধুরীকে লেখা চিঠির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিচে দেওয়া হল :

সুবীর

তখন পড়ি ক্লাস এইটে। গদ্য ছেড়ে সবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পদ্য লেখা ধরেছি। ইস্কুলে ডেপুটেশনে এসেছিলেন এক বি-টি শিক্ষার্থী। আমাকে বললেন 'উই আর সেভ্‌ন্'-এর বাংলা অনুবাদ করে আনতে। চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। অথচ সেই মাস্টারমশাইয়ের বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে আসছে। আমরা সবাই তাঁকে খুব পছন্দ করতাম। অথচ তাঁর কথা রাখতে পারছি না ব'লে নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিদায়ের দিনটিতে কোনোরকমে একটা অনুবাদ তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গুরুদক্ষিণার দায় সেরেছিলাম।

পরে অনুবাদকে আমি সঙ্গের সাথী করেছি প্রধানত দুটো কারণে। এক, মৌলিক লেখার শূন্যস্থান পূরণের জন্যে ; দুই, বাংলা ভাষার ওপর দখল আনতে।

এ ছাড়াও একেক সময়ে একেক কারণে। যেমন, নাজিম হিকমত অনুবাদ করেছিলাম 'পরিচয়'-এর অর্থাভাব মেটানোর জন্যে। 'দিন আসবে' করেছিলাম পেটের দায়ে। 'রোগা ঈগল' বন্ধুকৃত্যের জন্যে।

পাবলো নেরুদা অনুবাদ করেছিলাম 'হাংরাস' লেখার ফাঁকে ফাঁকে। গদ্য লেখার একঘেয়েমি কাটাতে।

হাফিজ অনুবাদ করেছি বন্ধু রেওতীলাল শাহ্-র সাহায্যে। খুব খেটেখুটে।

জেগে থাকতেই বহুদিনের ইচ্ছে ছিল সংস্কৃত আর প্রাকৃত থেকে অনুবাদ করার। চর্যাপদ অনুবাদের সূত্রপাত হয় একটি পত্রিকার সম্পাদকের তাগিদে।

কঠিন ব'লে পরে পিছিয়ে যাই। বহু বছর পরে এক তরুণ ভারততত্ত্ববিদ রুশ বন্ধুর প্ররোচনায় সে কাজ শেষ করি।

পরিভাষানির্ভর মনের ভাব নিজের ভাষায় আঁটানো অনেক সময়ই খুব শক্ত কাজ। কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যে লড়াই করার একটা আনন্দ আছে।

পারলে অন্যান্য ভারতীয় প্রাচীন আর আধুনিক কাব্য থেকে আরও কিছু অনুবাদ করব। যতদিন শ্বাস, ততদিন আশ।

তোমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর হল না। আসলে সওয়াল-জবাবে আমি বরাবরই বিশেষ কাঁচা।

সুভাষদা

২।৯।৯৩

—